সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

GIFT

449275

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ' ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ' ২০১০)

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

449275

449275

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক

মোঃ ইব্রাহীম খলিল

পি-এইচ.ডি গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৫/২০০৭-২০০৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোঃ ইব্রাহীম খলিল (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৪/২০০৫) আমার সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ও নির্দেশনায় *'সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। এটি গবেষকের মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম। ইতোপূর্বে অভিসন্দর্ভটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা ডিগ্রি লাভের জন্য অন্য কোথাও উপস্থাপিত হয়নি। আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়ার জন্য সুপারিশ করছি।

২৫/৫/১০

(ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন)

প্রফেসর

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

449275

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। যাঁর সীমাহীন অনুগ্রহে *'সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'* শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। অজুত-কোটি দরুদ মানবতার মুক্তিদূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)এর প্রতি, যিনি নিয়েছেন সত্য ও সুন্দরের শাশ্বত নির্দেশনা। কৃতজ্ঞতা আমার মমতাময়ী আম্মা ও স্নেহময় আব্বার প্রতি।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন স্যারের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর সহযোগিতা ও নির্দেশনা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো না। বিভাগীয় সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ নানা পরামর্শ প্রদান করে গবেষণাকে ত্রুটিমুক্ত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণা কর্মে আমি যাঁদের লেখা ব্যবহার করেছি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার আম্মা, আব্বা, সহধর্মিণী, সহোদর, স্বজন, বন্ধু, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে যাঁরা আমাকে এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞ।

মোঃ ইব্রাহীম খলিল

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা	৬
প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশ, সামাজিক সমস্যা ও ইসলাম	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : নৈতিক অবক্ষয়	২৯
তৃতীয় অধ্যায় : আর্থিক অনাচার	৫৪
চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষা সমস্যা	৭৯
পঞ্চম অধ্যায় : দারিদ্র্য ও বেকারত্ব	১০৫
ষষ্ঠ অধ্যায় : নারী নির্যাতন	১৩১
সপ্তম অধ্যায় : জনসংখ্যা সমস্যা	১৫৬
অষ্টম অধ্যায় : সন্ত্রাস সমস্যা	১৮১
উপসংহার	২০৭
গ্রন্থপঞ্জী	২০৮
প্রতি বর্ণায়ন	২১৭
সংকেত সূচী	২১৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ।[১] তৃতীয় বিশ্বের[২] দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম দরিদ্র এই দেশটি নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত যার মধ্যে সামাজিক সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক কাঠামো, সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টন, বিচ্যুত আচরণ, জনসংখ্যা স্ফীতি, মৌল-মানবিক চাহিদার অপূরণ, অপ-সংস্কৃতি, মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও শহরায়ন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরক্ষরতা এবং বিশেষত নৈতিক অবক্ষয়জনিত নানা কারণে এ সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একটি মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এ সকল কারণ এবং কারণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের উপস্থিতি পুরোপুরি অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত। কারণ ইসলামে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রতিটি দিক ও বিভাগের সকল সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। সমস্যার যেন উদ্ভবই না ঘটে তা নিশ্চিত করতে নানা রকম কার্যকর নৈতিক ও বিধানগত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। কেউ যদি এ সকল বিধান মেনে না চলে কিংবা মেনে চলায় শৈথিল্য দেখায় অথবা বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ সকল বিধান মেনে চললে, বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করলেই কেবল একজন মানুষ মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে, অন্যথায় নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে না ও ওয়াদা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত মুমিন নয়।[৩] অন্যান্য মানবিক ত্রুটি সম্পর্কেও তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন। যার সারসংক্ষেপ হলো, মুসলিম হতে হলে প্রতিটি মানুষকে মানবিক ত্রুটি মুক্ত হতে হবে, ন্যূনপক্ষে ত্রুটিমুক্ত হওয়ার সাধনায় লিপ্ত হতে হবে।

মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে তাই অশিক্ষা, অনৈতিকতা, অবিচার, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আর্থিক অনাচার প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা হওয়া কথা নয়। কারণ ইসলামি বিধান মেনে চললে এই সমস্যাগুলোর উদ্ভব হতে পারে না। যেমন বাংলাদেশের মানুষ যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মেনে চলতেন, তাহলে কেউ নিরক্ষর থাকতে পারতেন না। কেননা ইসলামে জ্ঞান অর্জন ফরয। রাসূলুল্লাহ (সা)এর উপর মহান আল্লাহর প্রথম নির্দেশই ছিলো, "পড়!"[৪] মহানবী (সা)ও ঘোষণা করেছিলেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।"[৫] এরপরও যদি কোন মুসলিম নিরক্ষর বা অশিক্ষিত থাকে তাহলে সাধারণভাবেই বলা যায়, হয় সে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ লংঘন করে বাহ্যত মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মুসলিম নয় অথবা ইসলাম গ্রহণের মর্ম ও তাৎপর্যই সে বুঝতে পারেনি।

একইভাবে বিভিন্ন মানবীয় অনাচার এবং অনৈতিক আচরণের কথাও বলা যায়। অনৈতিকতার যতোগুলো অনুসঙ্গ আছে, অমানবিক যতগুলো আচরণ রয়েছে ইসলামে তার একটিও হালাল নয়। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ব্যভিচার, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, ওয়াদা ভঙ্গ, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, চরিত্রহীনতা, মানুষকে কষ্ট দেয়া, মানুষের অকল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি সব কাজই

---

[১] বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৮৯.৬% ভাগ মুসলিম। Bangladesh: An Overview, 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh, Government of The People's Republic of Bangladesh, 28th Edition, March 2009, p.XVII

[২] মাও ঝে ডং-এর আমলে চীন এই তৃতীয় বিশ্ব (Third World) তত্ত্ব হাজির করে। এই তত্ত্বানুযায়ী দুই পরাশক্তি ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহকে নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব। আর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহকে নিয়েই গঠিত তৃতীয় বিশ্ব। তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা এবং দারিদ্র্য। চীন নিজেকেও এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সব দেশের অবস্থা এক রকম নয়। যেমন, চীন-ভারত প্রভৃতি দেশের উন্নয়নের পর্যায় তুর্কান, বাংলাদেশ বা ইথিওপিয়ার উন্নয়নের পর্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। অন্যদিকে তৈলসমৃদ্ধ কুয়েত-ব্রুনেই প্রমুখ দেশের প্রাচুর্য তো বলতে গেলে সীমাহীন। কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘ বিশ্বের দরিদ্রতম ও অনুন্নত দেশসমূহকে চতুর্থ বিশ্ব বলে চিহ্নিত করেছে। (হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, আগস্ট-২০০০, পৃ.১৯৬-৯৭) এ হিসেবে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের পরিবর্তে চতুর্থ বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যেন যৌক্তিক।

[৩] প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, আনোয়ারুল হাদিস, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা ২০০৯ পৃ.১৩

[৪] اقرأ باسم ربك الذي خلق আল-কুর'আন, সূরা আলাক: ১

[৫] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, কুতুবখানা রশিদীয়া, দিল্লী ১৩৮৭ হিজরি, কিতাবুল ইলম

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে হারাম। মুসলিম হলে এই হারাম কাজগুলোর সাথে মানুষকে আবশ্যিকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়। অবিচারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। মহান আল্লাহ মুমিনদের জন্য সুবিচারের উপর অধিষ্ঠিত থাকাকে আবশ্যিক করেছেন যদি তা মুমিনের নিজের বিরুদ্ধে হয় তারপরও।[১] চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি আর্থিক অন্যায় কোনো মুসলিম দেশে সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে, এটা কল্পনাতীত। কুর'আন মজীদের প্রত্যক্ষ ঘোষণার মাধ্যমে এর প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন। আখিরাতে তো বটেই এমনকি পৃথিবীতেই এগুলোকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এমতবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে মুসলিমদের কেউ কেউ এই অপরাধসমূহে লিপ্ত হলেও হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সমাজে এগুলো সামষ্টিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হবে, এটা অকল্পনীয়।

কিন্তু বাংলাদেশে সেই অকল্পনীয় ব্যাপারই ঘটেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের এই দেশে নির্বিচারে চলছে অবিচার, মাদকদ্রব্য, মিথ্যাচার, সন্ত্রাস, চুরি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ, অনৈতিকতা প্রভৃতি। যে সকল বিষয় মুসলিমের জন্য হারাম, মুসলিমরা বুঝে বা না বুঝে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সে হারামই জীবনে অনুশীলন করছেন, লালন করছেন। মুসলিম দেশে বিপুল জনগোষ্ঠী নিরক্ষর থাকছেন। যারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন, তাদের খুব কম সংখ্যকই কুর'আন পড়তে পারছেন। যারা কুর'আন পড়তে পারছেন, তাদের অত্যন্ত কম সংখ্যক কুর'আন বুঝতে পারছেন। কুর'আন-হাদীস না পড়ে, না বুঝে মুসলিম হওয়ার কারণে বাংলাদেশের মুসলিমগণ অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মত ইসলামকে তাদের বংশগত উত্তরাধিকার ভাবছেন। এ দেশের অধিকাংশ মানুষই উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম। জেনে-বুঝে-মেনে মুসলিম হয়েছেন, রয়েছেন এবং থাকার চেষ্টা করছেন, এমন মানুষের সংখ্যা এখানে কম। তারপরও বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। বাহ্যিক এই অবস্থা বিবেচনায় রেখে, এই দেশের মানুষের বর্তমান বোধ, বিশ্বাস ও বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এ দেশটিকে ইসলামি বিধানের আলোকে কীভাবে সমস্যামুক্ত করা যায়, এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই পথই অনুসন্ধান করা হয়েছে। কেননা আকস্মিকভাবে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো বদলে ফেলা যাবে না। হঠাৎ করেই মানুষের মানসিকতা বদলে দেয়া যাবে না। চাইলেই বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও চরিত্রে মিশে যাওয়া মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রাতারাতি নির্মূল করা সম্ভব নয়। এটি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত বক্তব্য যে, বাংলাদেশে কোনো শাসক বা রাজনৈতিক দলের হাতে এমন কোনো ম্যাজিক নেই বা নেই যাদুর দৈত্য যাকে বললেই এ দেশ জঞ্জালমুক্ত হবে। শত-সহস্র বছরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, দেশি-বিদেশি নানা ধরনের শোষণ আর দুঃশাসনে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদেরকে রক্ষা করতে করতে অথবা পরিবর্তিত বিভিন্ন সময়-দুঃসময়ের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে নিজেদের মানসিকতার যে ক্ষতি করেছেন, অন্তর্গত জগতে যে ক্ষত তৈরি করেছেন, মুহূর্তেই সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যাবে না, সেই ক্ষত সারানো সম্ভব হবে না। আমাদের যা করতে হবে তা হলো, বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ যে আবেগ ও নীতি লালন করেন সে আলোকে আপাতত হাতের কাছে যা আছে তা দিয়ে সবচেয়ে ভালো থাকার উপায় অন্বেষণ করা। এরপর পর্যায়ক্রমে সকল বিষয় মানায় অভ্যস্থ হওয়া। কারণ অংশত বিধান মানার পর মানুষ যখন এর সুফল পেতে শুরু করবে তখন স্বভাবতই তারা পুরোপুরি বিধান মানায় আগ্রহী হয়ে উঠবে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো বহাল রেখে ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ কীভাবে কার্যকর করা যায় এবং তা থেকে সুফল লাভ করা যায়, তাকেই এ অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভের জন্য বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় আবেগ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ব্যবহার করে ইসলামি বিধানসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল কী হবে এবং কীভাবে সমস্যামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব গবেষণায় বিশেষভাবে সেই পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে।

---

[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় অথবা তোমাদের মাতাপিতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক আল্লাহ তাদের উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচারে তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে জেনে রেখ, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সকল খবর জানেন।" (আল-কুর'আন, ৪: ১৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ, সামাজিক সমস্যা ও ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ, সামাজিক সমস্যা ও ইসলাম

বাংলাদেশ একটি অতি প্রাচীন দেশ। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বের যে অঞ্চলে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়, অতি প্রাচীনকাল থেকে তা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভৌগোলিক অঞ্চল বলে পরিচিত ছিলো।[১] ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। আজ থেকে সাড়ে সাত হাজার বছর আগে হযরত নূহ (আ)এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনের[২] পর আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাসী তাঁর প্রপৌত্র 'বঙ' এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এরপর যে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তা বঙ্গ জনগোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়। কালের বিবর্তনে উক্ত বঙ্গ থেকে বঙ্গদেশের নামকরণ হয়েছে।[৩] শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আরবে ইসলাম প্রচার শুরু করার পর বঙ্গে তাওহীদী ধারায় বিশ্বাস প্রবর্তনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)এর শাসনকালে (৬৩৪-৪৪খ্রিস্টাব্দ) সাহাবী মানুন ও মুহায়মিন (রা)এর নেতৃত্বে একদল সাহাবী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গে আগমন করেন।[৪] এরপর আউলিয়া কিরাম-সূফী সাধকগণ অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।[৫] ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সমর্থন, স্বীকৃতি, আগ্রহ ও আনুকূল্যে ইসলাম এদেশে সাদরে গৃহীত হয়।[৬] সাহাবী ও সূফীগণের চরিত্র মাধুর্য ও জীবনমুখী শিক্ষা সহজেই অত্যাচারিত, উৎপীড়িত সমাজকে আকৃষ্ট করে এবং পরিত্রাণের আশ্বাস দেয়।[৭] ফলে ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক জীবনের প্রত্যাশায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি বীর মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।[৮] এরপর সুদীর্ঘকাল বাংলায় মুসলিম শাসন বহাল থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রায় ২শ বছরের বৃটিশ শাসনের সূচনা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা নামে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে, পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বহাল ছিল।[৯] বর্তমান বাংলাদেশেও তা বিদ্যমান রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে অগুণতি সামাজিক সমস্যা। এ

---

[১] ড. এম এ আজিজ ও ড. আহমদ আলিসুর রহমান, প্রাচীন বাংলাদেশ, (ড. কে এম মোহসীন ও অন্যান্য, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ), ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ.১

[২] কুরআন মজীদে (৭:৬৪, ১০:৭৩, ১১:৩৬-৪৮) হযরত নূহ (আ)এর মহাপ্লাবনের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর হুকুম না মানা এবং আল্লাহর নবীর প্রবল বিরোধিতার কারণে হযরত নূহ (আ)এর সমকালীন বিশ্বের লক্ষ অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 'গযব' হিসেবে এ মহাপ্লাবন হয়েছিলো। এতে গুটিকয়েক মু'মিন ছাড়া সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। এ মহাপ্লাবন কখন ঘটেছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০, কেউ বলেন: আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। আবার কারো মতে, খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এ প্লাবন ঘটেছিল। তবে একথা সত্য যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ কিংবা খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে পৃথিবীর অনেক স্থানেই এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। - মনসুর মূসা (সম্পাদনা), বাঙলাদেশ, এম.আই চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ.৪৬

[৩] গোলাম হোসায়ন সলিম, রিয়াযুস সালাতীন, বাংলা অনুবাদ: বাংলার ইতিহাস, আকবর উদ্দীন অনূদিত, ঢাকা, ১৯৭৪ পৃ. ১৬ ও ৩৮

[৪] ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, ((ড. কে এম মোহসীন ও অন্যান্য, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ), পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৮-৮০

[৫] প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন, সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ.৪৩-৪৮

[৬] ড. এম এ আজিজ ও ড. আহমদ আলিসুর রহমান, প্রাচীন বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

[৭] আখতারুল আলম, ইতিহাসের বাংলা ঃ বাংলার ইতিহাস, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ.৭

[৮] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, মার্চ ২০০৩, পৃ.১৪৭

[৯] দেখুন: আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা-১৯৮০ / ড. হাসান জামান, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ঢাকা-১৯৬৭ /M. A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Dhaka-1968 / M. Anamul Haque, A History of Sufism in Bengal, Dhaka,

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যাগুলোর অধিকাংশই ক্রণিক ব্যাধির মত দীর্ঘ দিন থেকে এ দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে, কিছু কিছু সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা তাই সংখ্যায় যেমন বিশাল, বৈচিত্র্যেও তেমনি বিপুল। বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যক সমস্যা বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রত্যাশাকে বিপন্ন করে তুলেছে। এ দেশের মুক্তিপিয়াসী, শান্তিপ্রিয়, সহজ-সরল এবং ধর্মপ্রাণ অধিবাসীদের সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা এবং তাঁদের আচরিত ধর্ম ইসলামের পরিচয় ও প্রকৃতি এ অধ্যায়ের মূল উপজীব্য।

সমাজ ও সামাজিক সমস্যা

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।[১] পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী।[২] মানুষের আচার ও কার্যপ্রণালী, কর্তৃত্ব ও পারস্পারিক সাহায্য, বিভিন্ন সংঘ ও বিভাগ, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা এসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত সদা পরিবর্তনশীল একটি জটিল ব্যবস্থা; সামাজিক সম্পর্কের একটি প্রবাহমান ধারা।[৩] অথবা সমাজ হলো সম-মনোভাবাপন্ন এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন মানসিকতা সম্পর্কে জানে এবং সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে।[৪]
নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও সহজ-স্বাভাবিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে মানুষ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সামাজিক জীবন যাপন মানুষের জীবনকে যেমন সুখময় করেছে, নানা ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখেছে, জীবনযাত্রায় এনেছে নিরাপত্তা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও সাবলীল ধারা তেমনি তা নতুন নতুন নানা সমস্যাও তৈরি করেছে। পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে কোনো না কোনোভাবে মানুষ যেমন সামাজিক জীবন যাপন করেছে তেমনি সকল দেশের সকল কালের সমাজেই সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান ছিলো। যদিও দেশে দেশে, কালে কালে সামাজিক সমস্যার ধরন, প্রকৃতি, প্রভাব ও পরিণতিতে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভিন্নতা প্রত্যক্ষ করা যায়।

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা

কারণতত্ত্ব অনুযায়ী সমস্যা হলো সম্মুখে নিক্ষেপ করার (Thrown forward) মতো মনোযোগ আকর্ষণকারী কোনো কিছু, তাই সামাজিক সমস্যা হতে পারে সমাজবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কোনো ঘটনা বা বিষয়।[৫] প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক হলেও যে কোন সামাজিক সমস্যাই সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে।

1980 / ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর, জানুয়ারি ২০০৩/ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত/ প্রফেসর এ.কে.এম আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ১৯৯০

[১] "Society in general consists in the complicated network of social relationship by which every human being is inter-connected with his fellowmen." – P. Gisbert, Fundamental of Sociology, 3rd edition, p.8

[২] ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ পৌষ ১৪০৭, ৮ম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১১২২

[৩] "Society is a system of usages and procedures of authority and mutual aid of many groupings and divisions of controls of human behaviors and of liberties. This ever-changing complex system we call society. It is the wave of social relationships and it is always changing." – R M McIver and Page, Society, Macmillan 1967, p.5

[৪] "Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and therefore of able to work together for common ends." – F M Giddings, Principles of Sociology, 3rd edition, p.5

[৫] C. M. Case, 'What is Social Problem' in 'Analyzing Social Problems' J. E. Nordskog et. al. (eds), The Dryden Press, New York, 1965, p.6

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সমস্যা শব্দে *সামাজিক* ও *সমস্যা* এই দুটি প্রত্যয় অন্তর্ভুক্ত। *সামাজিক* প্রত্যয়টি সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে নির্দেশ করে যার মাঝে রয়েছে সামাজিক সম্পর্ক, কাঠামো, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। অন্যদিকে *সমস্যা* প্রত্যয়টির মাধ্যমে সাধারণত অবাঞ্ছিত, দ্বন্দ্বপূর্ণ, অসম ও জটিল অবস্থা, শর্ত, পরিস্থিতি বা আচরণকে বোঝানো হয়। তাই সামাজিক সমস্যা হলো সমাজব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত এক অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা, পরিস্থিতি বা আচরণ।[১] এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা সমাজের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে, মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ কারণেই বলা হয়, "These (Social problem) are called social since these are directly related to human relationships and the accepted system of society. We may call them problems since these create hurdles in expected plans and point out upheavals in the regular life of community.[২]

কোনো সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক যখন সামাজিক আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে অবাঞ্ছিত বৈপরীত্ব বা পার্থক্য লক্ষ্য করে এবং যদি তারা বিশ্বাস করে যে, ঐ পার্থক্যগুলো যৌথ প্রয়াসের দ্বারা দূর করা সম্ভব; তখন বুঝতে হবে যে সমাজে সামাজিক সমস্যা বিরাজ করছে।[৩] কারণ সামাজিক সমস্যা হলো কোনো অসুবিধাজনক অবস্থা বা সমাজের অনেক লোকের অবাঞ্ছিত আচরণ, যা সংশোধন অথবা দূর করতে চাই।[৪] কিংবা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষদের সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থী কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।[৫] অথবা এমন অবস্থা যা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে আর যাদের উপর তা প্রভাব বিস্তার করে তারা তাদের কঠিন বা অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য একে দায়ী করে এবং এ থেকে মুক্তি পেতে চায়।[৬] কিংবা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের সন্তোষজনক প্রত্যাশা পূরণে বাধা সৃষ্টিকারী[৭] অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা হিসেবে সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে ক্ষতিগ্রস্তকারী[৮] এবং মানবীয়

---

[১] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬, পৃ.৪

[২] Nisbet, in, Dr. Rajendra K. Sharma, Social Problems and Welfare, New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors, 1998, p.1

[৩] "A social problem exists when a significant people, perceive an undesirable difference between social ideals and social realities and before that this difference can be eliminated by collective action." - Makee M. Robertson, Social Problem, New York, 1975, p.4

[৪] "(Social) problem is any difficulty or misbehavior of fairly large number of persons, which we wish to remove or correct." - Samuel Koenig, Sociology: An Introduction to the Science of Society, Barns & Noble, Inc, New York, 1957, p.303

[৫] "Conditions among people leading to social responses that violates some people values and norms and cause emotional or economic suffering." – Robert L. Barker (editor), The Social Work Dictionary, Washington D.C, NASW Press, 1995, p.355

[৬] A Social problem may be defined as a situation which has influenced a good majority of people, i.e., they believe that this situation itself is responsible for their difficulties or displeasures which may be reformed - Arnold Rose, in Dr. Rajendra K. Sharma, ibid, p.1

[৭] "It is problem of social relationship which challenges the society itself of creates obstacles in the satisfaction of important ambitions of many people." - Rabb & Selznik, in Dr. Rajendra K. Sharma, ibid, p.2

[৮] A social problem is a condition affecting a significant number of people in ways which considered undesirable and about which it is felt some thing can be done through collective social action. - P.B. Horton & G.R. Leslie, The Sociology of Social Problem, Appleton-Century-Crofts, Inc., New York, 1955, p.4

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত এমন একটি অবস্থা হলো সামাজিক সমস্যা যা প্রতিকার বা প্রতিরোধ পন্থায় অবশ্যই সমাধান করা দরকার বা সমাধান হতে পারে এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হয়।[১] আরো সহজ করে বললে, "Social problems are described most simply as perplexing questions about human societies proposed for solution. Social problems are part of the climate of opinion in society which enters on expressed needs for public policies and anticipated requirements for social control.[২] এভাবেও বলা যায়, A social problem is a problem in the sense that it disrupts the socially expected or morally desired scheme of things. It violates society's definition of the good and right and dislocates social patterns and relationships that a society values.[৩]

বিশ্লেষণ যেভাবেই করা হোক, বাস্তবতা হলো সামাজিক সমস্যা সকলের জন্যই ক্ষতি ও অস্বস্তিকর অবস্থা। কেউ কেউ হয়তো এর প্রত্যক্ষ ক্ষতির শিকার হন আর কেউ কেউ বা হন পরোক্ষে। তাই সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজস্থ মানুষের জীবনের এমন এক অস্বাভাবিক, যাতনাদায়ক, অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত ও অবাস্তব পরিস্থিতি যা সমাজের অধিকাংশ বা অনেক মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সাথে সাথে যা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দেয় এবং যার প্রতিকারের জন্য উদ্ভূত অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমাজের মানুষ ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পর্যায়ে যৌথ ও সমবেত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি

বড়ো, ছোটো, জটিল, সরল সব সমাজেই সামাজিক সমস্যা দেখা যায়। আবেগিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক বিশৃঙ্খলা এবং বিস্তার, সংঘটন ও বিন্যাসের দিক থেকে তা তারতম্যপূর্ণ হয়ে থাকে। আবশ্যকভাবে তা সামাজিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকে।দারিদ্র্য ও নির্ভরশীলতা, জনসংখ্যার চাপ ও দলগত দ্বন্দ্ব, বেকারত্ব, অপরাধ ও দুষ্ক্রিয়তা, শিক্ষা ও প্রচারণা, যুদ্ধ ও শান্তি ইত্যাদির চাপ সামাজিক সমস্যায় প্রতিফলিত হয়। জীবনযাপনের ধরন, পরিবার নির্বাহকরণ ও এর প্রতি মনোভাব, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তন থেকে সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হয়।[৪] সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় তাই বেশ কয়েকটি দিকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। যথা,

১। **উৎপত্তি (Origin):** বিভিন্ন সামাজিক ও পারিপার্শিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে সমস্যার উদ্ভব বা সৃষ্টি।সামাজিক কাঠামোর ত্রুটিপূর্ণ গঠন, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার ব্যতয়, বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্যতা হতে সামাজিক সমস্যাসমূহ জন্ম লাভ করে।[৫]

২। **ধারা ও বর্তমান প্রেক্ষিত (Trends and Present Condition):** সমাজ ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যাগুলো ছিলো একমাত্রিক। শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজে আধুনিকায়ন তথা শিল্পায়ন ও শহরায়নের হার ও মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের

---

[১] A social problem is a condition growing out of human interaction that is considered undesirable by a significant number of people who believe it can and must be resolved through preventive or remedial action. - David Dressler, Sociology: The Study of human interaction, Alfred A. Knopt, New York, 1969, p.465

[২] International Encyclopedia of the Social science, vol-14, The Macmillan Company, USA, 1968, p.452

[৩] J.J. Grant & W.G. Pirtle, Social Problems : as human concerned, Boyel & Fraser Publishing Co, San Francisco, 1976, p.13

[৪] J.E. Nordskog, Analyzing Social Problem, The Dryden Press, New York, 1956, p.5

[৫] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৩, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবন যেমন জটিল হয়ে পড়েছে তেমনি সামাজিক সমস্যাগুলোও জটিলতর আকার ধারণ করেছে। অতীতের একমাত্রিক সমস্যাসমূহ বহুবিধ সামাজিক উপাদান যুক্ত হয়ে বহুমাত্রিক সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে।[১]

৩। **কারণ (Causes):** অতীত সামাজিক সমস্যাসমূহ একটিমাত্র কারণে উদ্ভূত হলেও বর্তমানে একটি সমস্যার নেপথ্যে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণটিকে মূল কারণ (root cause) এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল অন্য কারণগুলোকে সাধারণ কারণ (general cause) হিসেবে চিহ্নিত করেন। সামাজিক সমস্যার কার্যকর বিশ্লেষণে মূল কারণ ও সাধারণ কারণসমূহ পৃথক পৃথক গুরুত্বের দাবি রাখে।[২]

৪। **আন্তঃসম্পর্কিত বিষয় (Interrelated Issues):** সামাজিক সমস্যা নিজে যেমন এক অবাঞ্ছিত অবস্থা তেমনি আবার সমাজের বেশকিছু বিষয় বা ঘটনার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক এসব অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়াবলির মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, শ্রেণীয় দ্বন্দ্ব, ভূমিকা ও মর্যাদার অসঙ্গতি, পারিবারিক ভাঙন ও বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি। সামাজিক সমস্যার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এ সকল ইস্যুসমূহের সাথেও আবার জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান এবং এ বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যার প্রকোপ, ব্যাপকতা ও জটিলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।[৩]

৫। **সমাধান প্রক্রিয়া (Solution Approach):** সমস্যা যেখানে আছে সেখানে সমাধানেরও পথ আছে। সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি, কারণ তথা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণের পাশাপাশি সমস্যা যেন তৈরি না হতে পারে সে লক্ষ্যে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।[৪]

৬। **ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতি (Future Trend):** সামাজিক সমস্যা প্রকৃতিগত দিক থেকে গতিশীল এবং সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক সমস্যার স্বরূপেও পরিবর্তিত হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাথে সাথে সমাজ যেমন সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তেমনি পরিবর্তিত সমাজের প্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যাগুলোও ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও মাত্রায় আবির্ভূত হবে।

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সমস্যার ধারণা এবং সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। এ সম্পর্কে জনগণের মাঝে মতৈক্য থাকে।[৫] মানব সভ্যতার ইতিহাসের বহুমুখিতায় সংস্কৃতিতে একটার পর একটি নতুন ও পুরাতনের মধ্যকার অমীমাংসিত মানসিক চাপের ফলশ্রুতি সামাজিক সমস্যা। এ ব্যাপারে চারটি সাধারণ সামাজিক প্রক্রিয়া জড়িত, যেগুলো হলো সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বন্দ্ব, সামাজিক গতিশীলতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ এবং বিচ্ছিন্নতা।[৬] এ সকল প্রক্রিয়াদিতে যখন বিশৃঙ্খলা-অসঙ্গতি দেখা দেয় তখন সাংস্কৃতিক শূণ্যতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় বেড়ে গিয়ে বিচ্যুত ব্যক্তি আচরণে সামাজিক সমস্যা জন্ম হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যা মানুষের দ্বারা সমাজ জীবনের মধ্যেই সৃষ্ট। এ জন্যই বলা হয়, "A social problem is a problem which actually or potentially affects large number of people in a common way.....[৭]

---

[১] আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, ঢাকা, জুলাই ২০০২, পৃ.৩২৭

[২] ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯০, পৃ.৩

[৩] প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকর্ম, ঢাকা, মে ২০০৭, পৃ.২৬৭

[৪] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৮

[৫] P.B. Horton & G.R. Leslie, ibid, pp. 7-10

[৬] R. K. Merton and Nesbet, Contemporary Social Problems, 2nd Edition, Harcourt Brace & World Inc. New York 1966, pp.19-24

[৭] Hart, Nordeskog J & etal (edited), Analyzing Social Problems, The Daydream Press, New York, 1956, p.6

Dhaka University Institutional Repository

এ বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এ পর্যায়ে সামাজিক সমস্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১। সামাজিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ রূপ: সামাজিক সমস্যায় সমাজের বাস্তব অবস্থা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যেমন আয়তন ও আয়ের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়া বা সামাজিকভাবে নারী নির্যাতনের ধারা চালু হওয়া। এ সমস্যাগুলো সমাজের বাস্তব অবস্থা নির্দেশ করে। এ থেকে ধারণা করা যায়, সমাজটি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে।[১]

২। সকল বা অধিকাংশের কাছে অগ্রহণযোগ্য: সামাজিক সমস্যা সমাজের সকল লোকের কাছে অথবা অধিকাংশের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কোনো একটি কাজ বা বিষয় যদি সমাজের গুটিকয়েক লোকের স্বার্থ ও আদর্শ বিরোধী হয় এবং অধিকাংশ লোকের সুবিধা ও সুখ নিশ্চিত করে তাহলে তাকে সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না।

৩। সকল বা অধিকাংশের কষ্টের কারণ: সামাজিক সমস্যা সমাজের সকল লোকের বা অধিকাংশের কষ্ট ও ভোগান্তির কারণ। যদি তা গুটিকয়েক লোকের কষ্ট ও ভোগান্তির কারণ হয় বিপরীতে অধিকাংশ লোকের জন্য স্বস্তিঃ ও সুখ নিয়ে আসে তাহলে তাকে সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না।

৪। সামষ্টিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য: সামাজিক সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক সামষ্টিক উদ্যোগ আবশ্যক। যেমন সন্ত্রাস সমস্যা। সমাজের কারো পক্ষে একা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক সমন্বিত চেষ্টা।

৫। সামাজিক মূল্যবোধ পরিপন্থী: সমাজ পরিচালিত হয় কিছু মূল্যবোধের আলোকে। ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর কাজে যখন এ সকল মূল্যবোধ নষ্ট হয় তখনই সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়।[২] ফলে তা সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

৬। পরিমাযোগ্যতা: সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য অস্বাভাবিক অবস্থা পরিমাপযোগ্য হয়ে থাকে। যে অবস্থার বিরূপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া পরিমাপযোগ্য নয়, তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।[৩]

৭। পরিবর্তনশীলতা: সময় ও স্থান ভেদে সামাজিক সমস্যায় প্রকৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, পূর্বে যে অবস্থাকে দারিদ্র্য বলা হতো, এখন সে অবস্থাকে দারিদ্র্য বলা হয় না। আবার পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে দারিদ্র্য বলতে যে অবস্থাকে বুঝানো হয়, বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে সে অবস্থাকে বুঝানো হয় না। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সমস্যারও গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। আবার সময়ের পরিবর্তনে মানুষের ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন ঘটে।[৪]

৮। যৌথ প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয়তায় অনুভূতি: সামাজিক সমস্যা সমাধানে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে থাকে। যেমন, সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হবার পর এটি সমস্যা বলে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু যে দিন থেকে মানুষ সতীদাহ প্রথার অমানবিক দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এর বিরুদ্ধে কিছু একটা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেদিন হতে এটি সমস্যা রূপে পরিগণিত হয়।[৫]

৯। সমাজভেদে সামাজিক সমস্যায় পার্থক্য: মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকায় সামাজিক সমস্যার মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আমেরিকায় যে অবস্থাকে সমস্যা বলা হয়, আমাদের দেশে সে অবস্থাকে বলা হয় না।[৬]

১০। ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা: সামাজিক সমস্যার ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রভাবে সমাজে বহুমুখী সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন, দারিদ্রতায় পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার স্বাস্থ্যহীনতায় কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়ে উপার্জন ব্যাহত হয়, যাতে মানুষ দারিদ্র্যের শিকার হয়।[৭]

---

[১] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.১১

[২] প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬৯

[৩] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬

[৪] ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৫

[৫] প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকর্ম, পূর্বোক্ত পৃ.২৭১

[৬] ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৬

[৭] প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকর্ম, পূর্বোক্ত পৃ.২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সমস্যার শ্রেণীবিভাগ

সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের স্বার্থে সামাজিক সমস্যাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা,

প্রথমত, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১। পরিবেশগত সামাজিক সমস্যা এবং

২। মানসিক সামাজিক সমস্যা।

সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজ ও পারিপার্শিক অবস্থা হতে সৃষ্ট। এরমধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বস্তি সমস্যা, সন্ত্রাস, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, শিশুশ্রম প্রভৃতি। অন্যদিকে মানসিক সমস্যাগুলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এই মানসিক সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছেহতাশা, আত্মহত্যা প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যহীনতা প্রভৃতি।[১]

দ্বিতীয়ত, সামাজিক সমস্যার পেছনের কারণগুলোর উপর ভিত্তি করে সামাজিক সমস্যাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

১। একমুখী কারণ সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যা এবং

২। বহুমুখী কারণ সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যা।[২]

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত ও দলীয় অপর্যাপ্ততার কারণের ভিত্তিতে[৩] সামাজিক সমস্যাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন,

১। অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা। যেমন: দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পরনির্ভরশীলতা, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি।

২। জৈবিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা। যেমন: বিকলাঙ্গতা, শারীরিক রোগ, দৈহিক ভারসাম্যহীনতা, অক্ষমতা ইত্যাদি।

৩। মনস্তাত্ত্বিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা। যেমন: স্নায়ুরোগ, মনোবিকৃতি, হীনমন্যতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

৪। সাংস্কৃতিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা। যেমন: বার্ধক্য, বৈধব্য, বিবাহ বিচ্ছেদ, বর্ণ-বিদ্বেষ, ধর্মীয় সংঘাত ইত্যাদি।

চতুর্থত, সমস্যার উৎসগত দিক বিবেচনা করে সামাজিক সমস্যাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।[৪] যেমন,

১। বাহ্যিক পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার ফলে সৃষ্ট সমস্যা;

২। জনসংখ্যা প্রকৃতির ত্রুটিপূর্ণ অবস্থাজনিত সমস্যা;

৩। ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক বিন্যাসের ফলে উদ্ভূত সমস্যা এবং

৪। বৈসাদৃশ্যপূর্ণ আদর্শ ও মূল্যবোধের তারতম্যজনিত সমস্যা।

পঞ্চমত, সামাজিক সমস্যার অনুভব ও ব্যাপকতা বিবেচনায় একে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

১। প্রাকৃতিক সূত্রের সমস্যা;

২। জৈবিক সূত্রের সমস্যা;

৩। সামাজিক সূত্রের সমস্যা বা সামাজিক পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যা এবং

৪। সামাজিক নীতির অপর্যাপ্ততাজনিত সমস্যা।[৫]

ষষ্ঠত, সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি ও ধরন বিবেচনা করে সামাজিক সমস্যাকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা,

১। অর্থনৈতিক সমস্যা;

২। স্বাস্থ্যগত সমস্যা;

৩। রাজনৈতিক সমস্যা এবং

---

[১] নৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

[২] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৮-১৩

[৩] Harold A. Phelps, Contemporary Social Problems, Prentice Hall Inc, New York, 1947 p.304

[৪] C. M. Case, ibid, p.3

[৫] Samuel Koenig, ibid, p.305

Dhaka University Institutional Repository

৪। মনো-সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা।[১]

সপ্তমত, বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে সামাজিক সমস্যাকে বৃহত্তর দুটি শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যথা,

১। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও

২। বিচ্যুত আচরণ।[২]

বস্তুত সামাজিক সমস্যার মুখ্য দুটি দিক রয়েছে। যেমন, ১। সমাজে বিদ্যমান আদর্শ-মূল্যবোধের অগ্রাহ্যকারী কর্ম ও অবস্থা এবং ২। সমাজে কোনো জন-অংশের জন্য বৈষয়িক ও ভোগাস্তির কারণ হয় এমন সামাজিকভাবে প্রবর্তিত অবস্থা। এ ক্ষেত্রে প্রথমটিতে বিভিন্ন বিচ্যুত আচরণ এবং দ্বিতীয়টিতে সামাজিক বৈষম্য-বঞ্চনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যাকে নির্দিষ্ট করা যায়।[৩] তাই বিন্যাস যেভাবেই করা হোক, কোনো সামাজিক সমস্যাই মানুষের জীবনে কাম্য নয় এবং কোনো সমস্যাই মানুষের জীবনে সামান্যতম সুখ ও সুবিধা নিয়ে আসে না। চূড়ান্ত বিচারে তা অন্তহীন ক্ষতির নিয়ামক বলেই গণ্য হয়ে থাকে।

সামাজিক সমস্যার কারণ

প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষ ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্যহীনতা, দলীয় জীবন এবং সাংস্কৃতিক চাহিদার সাথে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানের অভাব এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন পরস্পর সম্পর্কিত অংশের অসম গতি সম্পন্ন পরিবর্তনের কারণে[৪] বিশ্বজগতের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে বিশ্বের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়।[৫] কিছু কিছু সামাজিক সমস্যা ক্রমাগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও এরূপ পরিস্থিতির সাথে মানব প্রকৃতির সংগতি বিধানের ব্যর্থতায় ফলশ্রুতি হিসেবেও উদ্ভূত হয়।[৬] কিছু সংখ্যক মনো ও জীববিজ্ঞানীর দাবি, সামাজিক সমস্যার মুখ্য উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে মানসিক ও শারীরিক ত্রুটির মধ্যে।[৭] এসব বক্তব্য বস্তুত সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন কারণকে দায়ী করে যা সামগ্রিক সূত্রে উৎস হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। সে আলোকে সামাজিক সমস্যার কারণ উদঘাটনের চেয়ে কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট উৎস নির্দিষ্ট করা বরং অধিক বাস্তবসম্মত।[৮] তবে কোনো একটি মাত্র কারণ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়। সামাজিক সমস্যা তৈরির কারণ হিসেবে বহুবিধ বিষয় চলে আসে যা সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হওয়ার দাবি রাখে।

---

[১] Hornell Hart, What is Social Problem (1923) in Analyzing Social Problems, J. E. Nordskong and others ods, (eds), The Dryden Press, New York, 1950, p.7

[২] David Dressler, ibid, pp.470-73

[৩] D. Stanley Eitzen, Social Problem, Allyn and Becon Inc, Boston, 1986, pp.8-11

[৪] 1. The maladjustment of men and culture to the natural environment, particularly certain, extra ordinary manifestation such as epidemics, floods and earthquakes; 2. The lack of adjustment of man's inherited nature to the demands of group life and culture; 3. The stress caused in correlated parts of culture when they change at unequal rates of speed - Ogburn and Nimcoff, A Handbook of Sociology, Routhedge and Kegan Paul Ltd, London 1960, pp.546-47

[৫] "Al social problems grow out of the social. The problem of the adjustment of man to his universe and the social universe of man." - Gillin, etal, Social Problems, The Times of India Press, Bombay, 1969, p.451

[৬] W. F. Ogburn, Social Change, Rev ed, Viking Press, New York, 1950, p.65

[৭] Samuel Koenig, ibid, p.313

[৮] C. M. Case, ibid, p.3

Dhaka University Institutional Repository

১। সামাজিক পরিবর্তন: পরিবর্তনশীল সমাজে সকল দিকের পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত ও সুষম না হলে তাতে সঙ্গতিবিধানে মানুষ অপরাগ হয়ে ওঠে। এতে সামাজিক সমস্যা দেখা যায়। ব্যাপকতর ব্যাখ্যায় সামাজিক পরিবর্তন ধারায় বিচ্ছিন্নকারক সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে সামাজিক সমস্যা জন্ম নেয়।[১]

২। সাংস্কৃতিক শূণ্যতা: সমাজে বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনের চেয়ে অবস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তন মন্থর হওয়ায় সাংস্কৃতিক শূণ্যতা দেখা দেয়। এতে সামঞ্জস্য স্থাপন কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।[২] ফলে এক সামঞ্জস্যহীন অবস্থায় ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে দলের এবং দলের সাথে দলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও দ্বিধাগ্রস্ততা জন্ম নেয় যা সামাজিক সমস্যার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।[৩]

৩। মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ও অবক্ষয়: সমাজ জীবনে বিভিন্ন মানুষের ধারণাগত বৈপরীত্ব, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ-আগ্রাসন এবং নতুন পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় মৌল মূল্যবোধের বৈসাদৃশ্যতা মূল্যবোধের সংঘাত সৃষ্টি করে। এতে দ্বন্দ্বময়তার ব্যাপকতায় সামাজিক সমস্যা উদ্ভব হতে পারে।[৪]

৪। জনসংখ্যা সমস্যা: সমাজে জনগণের বয়স কাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমশক্তির অবস্থা ও কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে নানারকম ত্রুটি-সীমাবদ্ধতা থাকলে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। অন্যদিকে সম্পদের প্রাপ্যতার চেয়ে জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হলে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, বাসস্থান সমস্যা, বেকারত্ব ও নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।[৫] বাংলাদেশে দু দিক থেকেই জনসংখ্যাগত সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে।

৫। যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ: যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাত ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করে, সাথে সাথে তৈরি করে নানা সামাজিক সমস্যা। যুদ্ধ যদি কল্যাণকরও হয় তারপরও তা সমস্যামুক্ত সমাজ উপহার দিতে পারে না, অন্ততঃ যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পর্যন্ত তা নানারকম সমস্যা তৈরি করে থাকে। অন্যদিকে বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, প্লাবন, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অবস্থায়ও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপন সংকটাপন্ন হতে পারে।

---

[১] সমাজবিজ্ঞানী মেরিল বলেন, "Social problems are products of dynamic society, in which behavior changes more rapidly than the values that define it. Societies exhibiting a consistent disparity between behavior and the values by which it is defined are in a state of (relative) social disorganization." - Francis E. Merrill, The Study of Social Problems, in Nordskg et. al. ibid. p.9

[২] W. F. Ogburn, Social Change, Rev ed, Viking Press, New York, 1950, p.23

[৩] সাংস্কৃতিক শূণ্যতা কীভাবে সামাজিক সমস্যা তৈরি করে সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী Humphrey বলেন, "Cultural lag makes social problem understandable, then, if the lash is regarded as existing between technological development (material culture) and the growth of empirically grounded ideas, scientifically verifiable by others (non-material culture), and ideas, objects and practices (material and non-material culture) which persist and are maintained only by faith, in their worth-wholeness. Dogmas or faiths which have virtue simply because they are old often do not fit changed material conditions of living and their very persistence provides the framework for social problems." - Norman Raymond Humphrey, "Social Problems" in "Principles of Sociology" A. M. Lee (ed); Barns and Noble Inc, New York, 1962, p.8

[৪] "Two different kind of value conflict are involved in social problems; (1) People disagree on whether a given condition threatens fundamental values, that is, whether a social problem actually exists in a given condition, (2) Where there is agreement that a certain condition is a threat to those values, people disagree over proposed solutions of the problem in question." - Dressler, ibid, pp.475-76

[৫] "Sociologist agrees that a rapidly expanding world population constitute a major social problem. The problem has many causes and will be extremely difficult to solve." - Dressler, ibid, pp.503

Dhaka University Institutional Repository

৬। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** রাজনৈতিক সংঘাত, ক্ষমতার অনিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং রাজনীতিতে পেশীশক্তির কর্তৃত্ব গ্রহণ সমাজে অস্থিতিশীলতা ডেকে আনে। এ ধরনের রাজনৈতিক শোষণ–নিপীড়ন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অকার্যকারিতা বেড়ে যায়। ফলে আইন শৃঙ্খলায় অবনতি, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস এবং সামাজিক অনাচার ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।[১]

৭। **অসম বণ্টন এবং সুযোগগত বৈষম্য:** সমাজ কাঠামোতে সম্পদের অসম বণ্টন ও সুযোগ–সুবিধা প্রাপ্তিতে বঞ্চনা–বৈষম্য থাকলে তাতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক স্তরগত ঘৃণা–বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব–সংঘাত, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা এবং বিভিন্ন ধরনের অসদাচরণ দেখা দেয়। আর এর ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য, দুঃস্থতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বাসস্থান সঙ্কট, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা জন্ম নেয় এবং তা ব্যাপক আকার লাভ করে।[২]

৮। **অশুভ শ্রেণীর উদ্ভব:** সমাজে প্রতারণা, শঠতা এবং অবৈধ পন্থায় সুযোগ–সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য ঘটলে তারা তাদের অবৈধ অর্থ ও পেশী শক্তি দিয়ে মানবতা–নৈতিকতা বর্জিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। ফলে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্ষমতা অবরুদ্ধ ও অকার্যকর হয়ে ওঠে এবং ভোগান্তিকর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।[৩]

৯। **সামাজিক সমস্যার পারস্পারিক প্রভাব:** সমাজ জীবনে বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা পারস্পারিক সম্পর্কিসূত্রে পুরাতন সমস্যাকে জটিলরূপ প্রদান করে এবং নতুন নতুন সমস্যায় অভ্যুদয় ঘটায়। এ কারণে সামাজিক সমস্যাকে সামগ্রিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়।[৪]

সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াসমূহ

সামাজিক সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমস্যার যথাযথ বিশ্লেষণ। সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি সুক্ষাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির নিমিত্তে বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. একমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বা Monolithic approach এবং

২. বহুমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বা Multi-disciplinary approach

১। **একমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া:** সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে Monolithic Approach হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোনো একটি বিষয় বা কোনো একটি সমস্যার একটি মাত্র কারণকে বিবেচনায় এনে অন্যগুলোকে স্থগিত রেখে বা বাদ দিয়ে শুধু ঐ একটি কারণকেই বিশ্লেষণ করা হয় এবং সমাধান দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি কারণকে priorty দেয়া হয় এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ Monlithic approach কে Single approach বলে অভিহিত করেছেন।[৫] উদাহরণত বলা যায়, মাদকাসক্তি আমাদের দেশের একটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা বিশ্লেষণে নিম্নে উল্লেখিত কারণগুলো দৃশ্যমান হয়। এসব কারণের মধ্যে যেটি আপাতদৃষ্টিতে প্রধান বলে মনে হয় তা হলো অসৎসঙ্গ। একমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অসৎসঙ্গকে মাদকাসক্তির মুখ্য কারণ হিসেবে গণ্য করে ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয়।

২। **বহুমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া:** অতীতে মনে করা হতো যে সমস্যা সৃষ্টির পিছনে শুধু কোনো একটিমাত্র কারণ দায়ী। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, সমস্যা শুধু একটি কারণ দ্বারা সৃষ্টি হয়, এ ধারণা সঠিক নয়। বরং সমস্যা সৃষ্টির জন্য বহুবিধ

---

[১] এ. এফ. এম. আলী ইমাম, সমাজতত্ত্ব, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ঢাকা ১৯৯২, পৃ.১৭

[২] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, শাহানা পাবলিশার্স, ঢাকা–১৯৯৭

[৩] এ. এফ. এম. আলী ইমাম, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯

[৪] "Knowledge concerning some one problem often provides perspective for understanding other problems, because problems are not separate entities but are in many cases reciprocally interrelated." - J. E. Nordskong et. al. (eds), ibid, p.3

[৫] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

কারণ দায়ী এবং উক্ত কারণগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আর এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Multi-disciplinary approach.[১] এই প্রক্রিয়ার মূলনীতি হলো Know something about many things. বহুমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অনুঘটক হিসেবে ক্রিয়াশীল সকল কারণকে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন,

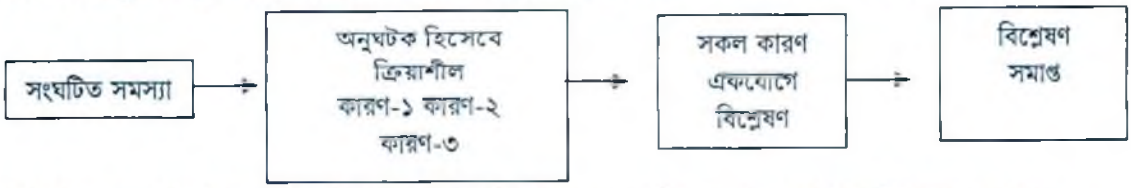

এই প্রক্রিয়ায় একাধিক Hypothesis থাকে এবং স্বাধীন চলককে একাধিক সাপেক্ষ চলক দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়।

বস্তুত সমস্যা ও উন্নয়নের মাত্রাভেদে এ প্রক্রিয়া দুটোর ব্যবহারে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। উন্নত দেশে সমস্যার বিস্তার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হওয়ায় একক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। আর বাংলাদেশের মত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমস্যার নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র নেই এবং সমস্যাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই এসব দেশে বহুমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অধিকতর উপযোগী।[২] এই গবেষণায় সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণে বহুমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি

পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে সামাজিক সমস্যা থাকলেও সমস্যাসমূহ যেমন এক রকম ছিলো না তেমনি একই বিষয়কে পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনাও করা হয়নি। এর কারণ সমস্যা নির্ধারণে গৃহীত নীতিমালা ও সামাজিক মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সমস্যা একটি আপেক্ষিক বিষয়। এক সমাজের জন্য যা সমস্যা অন্য সমাজের জন্য তা সমস্যা নয় বরং সুবিধা। যেমন, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার একটি সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়া সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ জাতীয় সমস্যার উল্লেখ করে কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, "আমেরিকায় শিশু জন্মহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। বাবা-মা'রা শিশু মানুষ করার কঠিন দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। শিশু মানুষ হয় যে পরিবারে সেই পরিবারই ভেঙে পড়েছে – কে নেবে শিশুর যন্ত্রণা? জীবনকে উপভোগ করতে হবে। আনন্দ খুঁজে বেড়াতে হবে। শিশু মানেই বন্ধন। বিয়ে এখানকার তরুণ সমাজে খুব আকর্ষণীয় কিছু নয়। কারণ সেখানেও বন্ধন। একটিমাত্র তরুণীর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে, কি ভয়ঙ্কর! তারচে' অনেক ভালো লিভিং টুগেদার। একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে পছন্দের তরুণ-তরুণীর একত্রে ঘরবাস। যদি কোনো কারণে বনিবনা না হয়, জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে সরে পড় দু'দিকে। সাধু ভাষায় বলা চলে, 'গেল ফুরাইল। মোকদ্দমা হইল ডিসমিস।' এখানে সবাই দ্রুত মামলা ডিসমিস করতে চায়। মামলা বাঁচিয়ে রাখতে চায় না।[৩] বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে জন্মহার কমে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা কাউকে করতে দেখা যাচ্ছে না। বরং জন্মহার হ্রাস করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সরকারকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রচলিত রীতিতে সামাজিক সমস্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রায়শ হাস্যকর অবস্থা তৈরি করা হয়। মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে মাদক দ্রব্যের যে কোনো ধরনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অমুসলিম দেশগুলোতে

[১] সৈয়দা ফিরোজা বেগম ও অন্যান্য, সামাজিক সমস্যা ঃ স্বরূপ ও বিশ্লেষণ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

[২] এ. এফ. এম. আলী ইমাম, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

[৩] হুমায়ূন আহমেদ, আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ২০০৬, পৃ.১১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

এ নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও মাদকদ্রব্যের ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর সকল শিল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশ মাদকাসক্তিকে দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে।[১] বাস্তবে সে ঘোষণা নিতান্তই একটি কৌতুক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অমুসলিম দেশগুলোতে কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট মাদকদ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় নিষিদ্ধতা অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবসায়ীদের মাদক ব্যবসায়ের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। মাদকাসক্তিকে যদি সত্যিকারার্থে সমস্যা মনে করা হতো, তাহলে এভাবে নামেমাত্র বাধা দিয়ে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হতো না । কোথাও কোথাও এই বাধাটুকুও নেই। বাংলাদেশের একটি অভিজাত ক্লাবের মাদকদ্রব্য বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। "ঢাকা ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫শ। এদের মধ্যে সাড়ে ৪শ সদস্য বৈধ পারমিটধারী।[২] কিন্তু দেখা গেছে, পারমিট না থাকা সত্ত্বেও প্রতি রাতে শত শত সদস্য এবং তাদের বন্ধু অতিথিরা ক্লাবের বিভিন্ন ফ্লোরে বসে মদপান করছেন। ..... বছরে ঢাকা ক্লাবে গড়ে বিয়ার বিক্রি হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ ক্যান। ..... ঢাকা ক্লাবের সদস্য সচিব গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) মোজাহেদুল ইসলাম ৫ অক্টোবর ২০০৯-১০ অর্থবছরের চাহিদাপত্র উল্লেখ করে জানান: এ পর্যন্ত ক্লাবে ৪০৫ জন মুসলমান ও ১৪জন অন্য ধর্মাবলম্বী পারমিটধারী তাদের মদ্যপানের পারমিট নবায়ন করে মদপান করছেন।[৩]

বস্তুত সমস্যা নির্ধারণে সর্বজনীন কোনো নীতিমালা না থাকার কারণে সমস্যার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে একটি সত্যিকারের সমস্যা, যা মানবজাতির জন্য প্রকৃতপক্ষেই ক্ষতিকর, তা গুরুত্ব পাচ্ছে না। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন অনেক বিষয় নিয়ে মানুষ অহেতুক কালক্ষেপণ করছে। কারণ প্রচলিত সমাজে সমস্যার ক্ষেত্রে সামাজিক বা সামষ্টিক শব্দটি ব্যবহার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা জাতির এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তির সীমানাও অতিক্রম করতে পারে না। এ কারণে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই দেখা যায়, দেশের চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে ব্যক্তি আরো বড়।

ইসলাম পরিচিতি

বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামই বিশিষ্ট নামকরণের অধিকারী। 'ইসলাম' এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে এই ধর্মের প্রাণশক্তি স্পন্দিত, এর মহিমা বিচ্ছুরিত। মুসলিম জাতির জীবনধারা, কর্মপদ্ধতি, আদর্শ – এক কথায় এ জাতির প্রেরণা ও কর্মচাঞ্চল্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সাধনা ও সাফল্য এই একটি মাত্র শব্দে বিধৃত হয়েছে। তাই ইসলাম শব্দটি গভীর তাৎপর্যবহ ও ব্যাপক ব্যঞ্জনাময়।[৪] দুনিয়ায় যতো রকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামে অথবা যে জাতির মধ্যে তার জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন খ্রিস্ট ধর্মের নাম যীশু খ্রিস্টের নামে, বৌদ্ধ ধর্মের নাম মহাত্মা বুদ্ধের নামে এবং জরদশতি ধর্মের নাম এর প্রবর্তক জরদশতের নামে হয়েছে। আবার ইহুদী ধর্মের নাম হয়েছে ইয়াহুদা জাতির নামে। নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে তার নামের সংযোগ নেই। বরং ইসলাম শব্দের মধ্যে যে বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে নামে। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোনো এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোনো এক জাতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোনো ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে ইসলামি গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যে সব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এ সব গুণ পাওয়া গেছে, তাঁরা ছিলেন মুসলিম। এ ধরনের লোক আজও রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। ইসলাম শব্দটি আরবি সলম ধাতু হতে উৎপন্ন। অর্থ হলো "শান্ত হওয়া, বিশ্রামে থাকা, কর্তব্য নিষ্পন্ন করা, পাওনা বা অধিকার

---

[১] আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং জাতিসংঘের সে সময়কার মহাসচিব জনাব কফি আনান এক যুক্ত ঘোষণায় মাদক প্রতিরোধের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে সর্বাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জুন ২০০৪)

[২] পারমিটধারী বলতে মাদক দ্রব্য সেবনের জন্য সরকারিভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

[৩] দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.২

[৪] ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা ২০০৭, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে দেয়া, পূর্ণ শান্তিতে থাকা।[১] এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো শান্তি, আপোস, বিরোধ পরিহার ইত্যাদি।

স্বরচিহ্নের তারতম্যসহ কুর'আন মজীদে এই ধাতু হতে নিষ্পন্ন কয়েকটি পদের বিভিন্নার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যুদ্ধ বিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব[২] ইসলামি বিধান, হুকুম আহকাম[৩] যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব[৪] শান্তি[৫] শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন[৬] বাহ্যিক আনুগত্য[৭] বা আত্মসমর্পণ করা[৮] ইসলাম শব্দটি সিলমুন ধাতু থেকেও উদ্ভূত শব্দ হতে পারে। সিলমুন অর্থ হলো শান্তি ও শুভেচ্ছা।[৯] এ ছাড়া ইসলামের আরেকটি অর্থ হলো শান্তি স্থাপন।[১০]

বস্তুত ইসলাম হলো নত হওয়া ও আনুগত্য করা। অর্থাৎ শরী'আতের আহকামসমূহ কবুল করা এবং তা অন্তরে স্বীকার করা। আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে মেনে নেয়া এবং তাঁর সামনে মস্তক অবনত করা। আর এ আদেশ ও নিষেধ গ্রহণ করা ব্যতীত কেউ মুমিন বা মুসলিম সাব্যস্ত হতে পারে না।[১১] "দীনের ভাষায় যখন বলা হয় তখন ইসলাম শব্দের অর্থ শুধু সে আদেশ পালন, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন করে চলা। অতএব মুসলিম তাকেই বলে যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর কোনো আদেশ লঙ্ঘন করে না।[১২] বা ইসলাম হলো মেনে নেয়া, অন্তর দিয়ে হোক, মুখে হোক অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে অন্তর দিয়ে মানা। অন্তরের এ মেনে নেয়াকে তাসদীক বা সত্যায়ন বলে। একেই বলা হয় ঈমান।[১৩] এভাবেও বলা যায়, "Islam the Muslim religion based on belief in one God and revealed through Muhammad as the prophet of Allah.[১৪]

তাই ইসলাম বলতে মানব মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস এবং সামগ্রিক সত্তা ও প্রবৃত্তির আত্মসমর্পণকে বুঝায়। পরম স্বস্তি ও তৃপ্তি সহকারে রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবনদর্শন ও শিক্ষাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও সচেতনভাবে আল্লাহর বিধানের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। কোনো প্রকার প্রশ্ন, সন্দেহ ও অনুসন্ধান ব্যতিরেকে আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের প্রতি নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া এবং স্বীয় সত্তা ও প্রবৃত্তিকে আল্লাহর মর্জির কাছে বিলিয়ে দেয়া, উৎসর্গ করাই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের এ সংজ্ঞা থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম বস্তুত আত্মিক ও মানসিক দিক হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মর্জি ও কানূনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য করা, উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণ করা।[১৫]

সুতরাং ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমান কালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা। সৎকাজ, সৎচিন্তা ও সত্য কথা বলার ধর্ম।

---

[১] Sayed Amir Ali, The Spirit of Islam, Delhi – 1947, P. 168

[২] وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ আল-কুর'আন, ৮: ৬১

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً আল-কুর'আন, ২: ২০৮

[৪] وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا আল-কুর'আন, ৪: ৯০-৯১

[৫] وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আল-কুর'আন, ১০: ২৫

[৬] إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ আল-কুর'আন, ৫১: ২৫

[৭] قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ আল-কুর'আন, ৪৯: ১৪

[৮] إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ আল-কুর'আন, ২: ১৩১

[৯] আল-কাওসার, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা মার্চ ১৯৮৬, পৃ.২৯৩

[১০] ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.১

[১১] তানজীমুল ফারায়েদ আরবী-বাংলা শরহে আকাইদ নিছাফী, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী, নোয়াখালী, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ১০৭

[১২] মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, ভাষান্তর: আব্দাল আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর – ১৯৮৮, পৃ.১৩

[১৩] আল-গাযালী, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, প্রথম খণ্ড, ভাষান্তর: মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা – সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ.২৩৯

[১৪] Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, 2002, P.689

[১৫] অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি, অনুবাদ: মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পৃ.৩৮

Dhaka University Institutional Repository

এটা স্বর্গীয় প্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

হাদীসে জিবরীলে রাসূলুল্লাহ (সা)এর নিকট আরয করা হয়, "হে মুহাম্মদ (সা)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, "তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোন্যে ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানে সাওম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পথ অতিক্রম করার সামর্থ থাকলে হজ পালন করবে।[২]

ইসলাম মানবের চিরন্তন ধর্ম। এ কারণেই "কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন্যে দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখন্যো কবুল করা হবে না এবং সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।[৩] এর মূলকথা হলো, আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয় অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে এবং বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং সৎকাজে আত্মনিয়োগ। বিশ্বাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহতে বিশ্বাসের সাথে সাথে ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ এবং তাকদীরে বিশ্বাসও উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়। পৃথিবীর প্রথম নবী আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত কুর'আনে উল্লিখিত-অনুল্লিখিত সকল নবী-রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে উপরোক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলাম প্রচার করেছিলেন।[৪]

ইসলাম নির্দেশিত শান্তি সংস্থাপন সর্বাত্মক, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের অর্থ তাঁর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তি তাঁর অনন্ত শক্তির সাথে মিশিয়ে দেয়া। সুখে-দুখে, জীবনে-মরণে, আনন্দে-নৈরাশ্যে, প্রকাশ্যে-গোপনে জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও তাঁর প্রতি সমাহিত চিত্ততা, একমাত্র তাঁরই সাহায্য-সহযোগিতা কামনা, দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকেই একমাত্র পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা হিসেবে কেবল তাঁকেই মেনে চলা হলো আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন। সহজ কথায়, আল্লাহকে ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা হিসেবে তাঁর নিঃশর্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য করাই হলো তাঁর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা।[৫]

ইসলাম একদিকে যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে শান্তি সংস্থাপক অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর সৃষ্টজীব এবং জগতের সাথেও নিরন্তর শান্তির সংস্থাপক। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে যে এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, সকল মানুষই যে আল্লাহর খলীফা, তাঁর প্রিয় সৃষ্টি, সকলের মধ্যেই যে আল্লাহর বার্তাবাহক নবী-রাসূলগণ আবির্ভূত হয়েছেন, প্রত্যেক জাতিই যে আল্লাহর নির্দেশ পেয়েছে, ওহী লাভ করেছে; ইসলামের এ বিশ্বাস ও প্রত্যয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও শুভেচ্ছার ভিত্তি। পুরো মানবজাতিকে এক পরিবারভুক্ত মনে করাই ইসলামি জীবন পদ্ধতির এক অত্যুজ্জ্বল দিক। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ নির্বেশেষে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি হলো মানুষে মানুষে শান্তি স্থাপন। দূরের ও কাছের, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত, প্রতিবেশী-অপ্রতিবেশী, বন্ধু-প্রতিপক্ষ প্রমুখ সকল মানুষের প্রতি আরোপিত মানবিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমেই কেবল বিশ্বশান্তি স্থাপন করা যেতে পারে, অন্য কোন্যে পথে যে নয়, ইসলামের মর্মবাণী থেকে তাও প্রতীয়মান হয়।

ইসলাম যে শান্তি ও সংহতির কথা বলে তা শুধু মানবজাতির জন্য নয় বরং ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক নানা সৃষ্টিরাজির সাথেও শান্তি স্থাপনে সহায়ক। মানবেতর প্রাণী, গাছপালা, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টিসমূহ মানুষের শারীরিক এবং মানসিক গঠন ও পরিপোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে এগুলোর যত্ন নেয়া, এগুলোর সংরক্ষণ করা এবং মানুষের উপকারে কাজে লাগার মতো যোগ্য করে তোলার দায়িত্বও মানুষের। মানুষ এ সকল প্রাণী, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক

---

[১] Islam is not a mere creed. It is a life to be lived in the present, a religion of right doing, right thinking and right speaking, founded on divine love, universal charity and the equality of man in the sight of the Lord. - Sayed Amir Ali, The Spirit of Islam, ibid, p.178,

[২] আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪০৮ হিজরি, কিতাবুল ঈমান

[৩] আল-কুর'আন, ৩: ৮৫

[৪] ড. আহমদ বশীর, ইসলামের ইবাদত দর্শন, ঢাকা ২০০৪, পৃ.১৭

[৫] প্রফেসর শালমান শাকিল, ইসলাম (অনুবাদ: মুজাহিদুল ইসলাম) আইআরআই ঢাকা ২০০৭, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ, গাছপালা প্রভৃতি নানা জাতীয় সম্পদের ওপর নির্ভর করে। যে জন্য আল্লাহর এ সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে মানুষের প্রতি যথাযোগ্য আচরণের পাশাপাশি এ সকল মানবেতর সৃষ্টিরও যথাযোগ্য ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যা প্রয়োজন। শান্তি ইসলামের মর্মবাণী, শান্তি ইসলামের তাৎপর্য। এ শান্তিই হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, মানুষের প্রতি পরম প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবেতর সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ।[১] এ কারণে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা যায় সর্বপ্লাবী শান্তির ধর্ম হিসেবে, যে শান্তি বিশ্বজাহানের প্রতিটি মানুষ, মানবেতর প্রাণী, উদ্ভিদ, জীব ও জড় পদার্থ, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টিসহ প্রতিটি বস্তু ও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

আদর্শ ও নীতিগত ভিন্নতার কারণে সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে নানা পার্থক্য তৈরি হলেও এটা যথার্থ যে, সকল সামাজিক সমস্যাই সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সে অন্তরায়ের পরিধি ক্ষেত্র বিশেষে কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু অন্তরায় যে হয় তাতে কোনো সংশয় নেই। উদাহরণত বলা যায় প্রাচীন গ্রিসে পতিতাবৃত্তি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ছিলো না।[২] প্রাক-ইসলাম আরবেও একে সমস্যা মনে করা হয়নি। মাদকাসক্তি, জুয়াখেলা, যুদ্ধ, আক্রমণ ইত্যাদিও এসময়ে সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত ছিলো না। একইভাবে আজকের তথাকথিত সুসভ্য আমেরিকাসহ সমকালীন সকল দেশেই দাসপ্রথা সামাজিক সমস্যা ছিলো না। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে উল্লিখিত বিষয়গুলোই প্রবল সামাজিক সমস্যার রূপ লাভ করেছে। শেষপর্যন্ত মাদকাসক্তি, অপরাধ প্রবণতা, যৌতুক, নারী নির্যাতন, শিশুনির্যাতন, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, আত্মহত্যা প্রবণতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিশুশ্রম, যুব অসন্তোষ, শ্রম অসন্তোষ, পতিতাবৃত্তি, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা, বস্তি, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয়গুলো দেশে দেশে, কালে কালে জটিলতর সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিছু কিছু সমস্যা মানব জাতির স্বাভাবিক বিকাশ ও সাধারণ অস্তিত্বের জন্য হুমকি তৈরি করে। সচেতন মানুষ নিজেদের স্বার্থেই এ সকল সমস্যা সনাক্তকরণ এবং সমাধানে নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করে, সমস্যা চিহ্নিতকরণে মতপার্থক্যের কারণে সমাধানের পথ নির্দেশে লক্ষ্য করা যায় ভিন্নতা। বস্তুত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, গোষ্ঠী প্রভৃতির স্বার্থ সুরক্ষার চিন্তা করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের সুবিধা সংহত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি নিজেই সমস্যা চিহ্নিত করেছে এবং তা সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য, মানবিক ত্রুটি ও স্বার্থান্ধতার কারণে মানুষের পক্ষে এ ক্ষেত্রগুলোতে কখনোই নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে নিজেদের অসুবিধা হলে তারা যাকে সামাজিক সমস্যা বলে গণ্য করেছে অন্যের অসুবিধার ক্ষেত্রে সেটিকে আর তেমনভাবে মূল্যায়ন করেনি।

এ ক্ষেত্রেই ইসলাম তার শাশ্বত কল্যাণকামী রূপ প্রকাশ করেছে। ইসলামে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় বরং মানবজাতির স্বার্থ বিবেচনায় যেটিকে সমস্যা হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন মহান আল্লাহ সেটিকে সমস্যা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সকলের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ নির্মোহ, নিরপেক্ষ এবং উদার থেকে সমস্যা চিহ্নিতকরণের মূলনীতি প্রণয়ন ছিলো বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত। তিনি নির্ধারণ করে দেয়ার পর পৃথিবীর আর কোনো মুসলিম তাকে অস্বীকার করতে

---

[১] ড. আহমদ বশীর, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯

[২] এর অর্থ এই নয় যে, তখন এই পাপাচারগুলো সমাজে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতো না বা এতে মানুষের অসুবিধা হতো না। কিন্তু মানুষের বোধ, বুদ্ধি, বিবেচনা ও সুকৃতি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পাপাচারে এতটাই ঢেকে গিয়েছিল যে, এগুলোর সমস্যা উপলব্ধি করার মত অবস্থা তাদের ছিল না। কুর'আন মজীদে তাদের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "যখন তাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে তোমরা ফাসাদ বা সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি কর না, তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা হলাম শান্তি স্থাপনকারী। হুঁশিয়ার! মূলত তারাই হলো ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।" (সূরা বাকারা: ১১-১২) তাদের এ বোধশূন্যতা এবং প্রকৃত বিষয় না বোঝার অক্ষমতার কারণ হলো, ক্রমাগত পাপাচার ও অব্যাহত কুফরির কারণে তাদের বোধই নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের এ অবস্থা বর্ণনা করে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ (অবিরাম কুফরির জন্য) তাদের অন্তর ও কানসমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখসমূহের উপর রয়েছে পর্দা এবং তাদের জন্য আছে চরম শাস্তি। (সূরা বাকারা: ৭)

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি বা তিনি যেমন গুরুত্ব দিতে বলেছেন তারচেয়ে বেশি গুরুত্বও দিতে পারেনি। যেমন ইসলামে নর-নারীর বিবাহবহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক সকল অবস্থাতেই নিষিদ্ধ এবং একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য। পৃথিবীর সকল মানুষও যদি এর বিপক্ষে চলে যায় তাতে এ নিষিদ্ধতা ও সমস্যা হওয়ার বিষয়টি বদলে যাবে না। বরং এই নিষিদ্ধতা ও সমস্যা হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর কালামের মতই চিরন্তন বলে গণ্য হবে। কারণ মানুষ তাদের সীমিত জ্ঞান ও সংকীর্ণ বুদ্ধি আর সাময়িক ভোগের উত্তেজনার কারণে বুঝতে পারুক অথবা না পারুক কিন্তু বাস্তবতা হলো বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক মানবীয় নৈতিকতা, পারিবারিক জীবন, মানব জাতির সংহত ও সঙ্গত বংশবৃদ্ধি এবং মানবিক আবেগ ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার সম্পূর্ণ বিরোধী বিষয়। তাই প্রচলিত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুসারে যাকে সমস্যা মনে করা হয়, ইসলামে তা সমস্যা নাও হতে পারে। আবার ইসলামে এমন অনেক বিষয়কেই সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে প্রচলিত মতবাদ ও জীবন দর্শনে যাকে সমস্যা মনে করা হয়নি। সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে ইসলামের সাথে অন্যদের এই ভিন্নতার কারণ আদর্শগত অসঙ্গতি ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য।

সমাজের অধিকাংশ লোক যে সকল সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যে সকল সমস্যার কারণে মানুষের সামাজিক জীবন যাপন বিপর্যস্ত হয় ইসলামেও তেমন সমস্যাকেই সামাজিক সমস্যা মনে করা হয়। তবে প্রচলিত চিন্তাধারার সাথে ইসলামের নীতিগত দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের লোকেরা যদি ক্ষতিকর না ভাবে বা সকলেই যদি বিষয়টিকে গ্রহণ করে তাহলে তাকে সামাজিক সমস্যা বলে গণ্য করা হয় না। ধরা যাক যৌতুক বা পণ প্রথা। কোনো সমাজের লোকেরা আইনগতভাবে যদি এর স্বীকৃতি দিয়ে দেয় এবং সামাজিকভাবে এর প্রচলন বহাল রাখে, তখন আর এটি সে সমাজে সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে না।[১] অথবা মাদক দ্রব্য গ্রহণের কথাও বলা যায়। পশ্চিমা বিশ্বের সকল দেশে আঠারো বছর বয়স থেকে যে কোনো নারী বা পুরুষ মদ পান করতে পারে। দেশগুলোর সকল আঠারো বছরোর্ধ্ব নাগরিকরা মদ পান ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এটা দেশগুলোর সামাজিক সমস্যার মধ্যে গণ্য নয়। কেননা তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। একইভাবে দেশগুলোর অনৈতিকতা, ব্যভিচারিতা, বিবাহপূর্ব দাম্পত্য জীবনযাপন, মাতাপিতার প্রতি দায়িত্বপালন না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হয় না। সমকামিতার মত জঘন্য আচরণও দেশগুলোতে সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর কারণ হলো, দেশগুলোর নীতি-নির্ধারকগণ এবং অধিকাংশ মানুষ এতে কোনো ক্ষতি দেখতে পাননি। তাই এগুলো সেখানে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য নয়।[২]

বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশগুলোতে সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে দৃষ্টিভঙ্গিগত বিপর্যয় দেশগুলোর ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক মূল্যবোধকে দারুনভাবে বিধ্বস্তঃ করেছে। যেমন বাংলাদেশে অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন উপলক্ষ্যে কনসার্ট হয়, নামি হোটেল-রেস্তরা-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো আকর্ষণীয় নানা প্যাকেজ অফার করে এবং এই দিন প্রেমিক-প্রেমিকারা সঙ্গীকে নিয়ে একান্তে এ সকল আয়োজনে অংশ নেয়ে এটি সামাজিকভাবে আমরা মেনে নিয়েছি। অথচ মুসলিম হিসেবে এ ধারার কোনো প্রেমের স্বীকৃতি দেয়া যায় না। কারণ ইসলামে নর-নারীর বিবাহপূর্ব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে এভাবে নিবীড়ভাবে সময় কাটানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ বাংলাদেশে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রতিবছর এর ব্যাপ্তি বেড়ে নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

---

[১] যেমন সনাতন ধর্মীয় আইনে পিতার সম্পদে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। সে কারণে ধর্মীয়ভাবে পণপ্রথার ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রথা অনুসারে বিবাহকালীন সময়ে পিতার পক্ষ হতে কন্যাকে (মূলত কন্যার স্বামী পক্ষকে) সাধ্যমত অর্থ, অলঙ্কার ও আসবাব দিয়ে দেয়া হয়। এটিকে পিতার সম্পদে কন্যার উত্তরাধিকার থাকার পরিপূরক বিবেচনা করা হয়। (দ্রষ্টব্যঃ ড. শ্যামল ব্যানার্জী, হিন্দু পারিবারিক আইন, ঢাকা ১৯৮৯)

[২] বাস্তবে কিন্তু এগুলো ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা। দেশগুলোর ভোগবাদী নেতৃত্ব আর নীতিহীন মানুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্য এই নীতি গ্রহণ করে প্রতিদিনই এর ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করছে। নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধি, হতাশা, বিবাহ বিচ্ছেদ, হত্যাকান্ড ইত্যাদি মাধ্যমে সমস্যার নানা বিচ্ছিন্ন পরিণতি নির্মমভাবেই পাচ্ছে তারা। কিন্তু ভোগে ও লোভের পণ্যে হ্রাস ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা সমস্যাগুলোর ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকছে, যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্যা নির্ধারণের অধিকার মানুষকে দেয়ার কারণেই মূলত এ অবস্থা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত অসংখ্য সংবাদ পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় অন্তহীন অশান্তির যে চিত্র তুলে ধরে তা সর্বান্তকরণে উল্লিখিত বক্তব্যই সমর্থন করে। (দ্র. হুমায়ুন আহমেদ, হোটেল প্রেভার ইন ও মে ফ্লাওয়ার, কাকলি প্রকাশন, ঢাকা ২০০৬)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে কোনটি সামাজিক সমস্যা আর কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়, তা নির্ধারণের অধিকার মানুষের নয়। কেননা পৃথিবীর এমন একটি সমস্যাও নেই, যেটি পুরোপুরি সমস্যা এবং যার মাধ্যমে কোনো না কোনো মানুষ কিছু না কিছু উপকার লাভ না করেন। এমতবস্থায় মানুষ যদি সমস্যার ব্যাপারটি নির্ধারণ করতে যায়, তা আপেক্ষিক বিষয় হয়ে পড়বে। যেমন ছিনতাই একটি সামাজিক সমস্যা। কিন্তু ছিনতাইকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ছিনতাই কোনো সমস্যা নয়। বরং এটা হলো তার আয়-রোজগারের একটি পথ। এখন ছিনতাইকারীর সংখ্যা যদি বেশি হয় অথবা সামাজিক নীতি নির্ধারকদের মধ্যে যদি ছিনতাইকারী থাকেন, তাহলে তিনি কিন্তু ছিনতাইকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করবেন না। এভাবে মানুষ যখন সমস্যা নির্ধারণ করে তখন তার পক্ষে আর পুরোপুরি নিরপেক্ষ, উদার ও সর্বজনীন কল্যাণ চিন্তা করা সম্ভব হয় না।

ইসলামে কোন আচরণটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনটি হবে না তা আল্লাহই ঠিক করে দিয়েছেন। ফলে পৃথিবীর সকল মানুষও যদি কোনো আচরণ সমর্থন করে এবং সেটিকে সমস্যা মনে না করে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যদি সেটিকে সমস্যা ঘোষণা করে থাকেন, তাহলে সেটা সমস্যা। যেমন এর আগে আমরা পশ্চিমা বিশ্বের লোকদের সামাজিকভাবে মাদক দ্রব্য গ্রহণ ও সেবনের কথা বলেছি। তারা একে সমস্যা মনে করুক অথবা না করুক ইসলামে এটি অবশ্যই একটি ভয়ানক পাপ এবং ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা। কেননা এটাকে সমস্যা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন, "মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর অবশ্যই শয়তানের অপবিত্র ও ঘৃণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই তোমরা তা বর্জন করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দিতে চায়। তাও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত হবে না?"[১]

একইভাবে পৃথিবীর সকল মানুষ যদি কোনো আচরণকে সামাজিক সমস্যা মনে করেন, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে সমস্যা হিসেবে ঘোষণা না করে থাকেন, তাহলে ইসলামে তা সামাজিক সমস্যা বলে গণ্য হবে না। যেমন কুমারি মাতৃত্ব পশ্চিমা বিশ্বের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। ইসলামে এটা সমস্যা হিসেবে গণ্য নয়। কারণ ইসলামি নীতি দর্শন ও আদর্শে কুমারি মাতৃত্বের সুযোগই নেই। ইসলাম ব্যভিচারকে ভয়ানক পাপ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ – তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[২]

তাই মহান আল্লাহ যে সমস্যাগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং যে সকল সমস্যার সমাধান মহানবী (সা) সামাজিকভাবে সম্পন্ন করেছেন সেগুলোকে সামাজিক সমস্যা বলা যায়। অন্যদিকে তিনি যেগুলোকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেননি, সেগুলো আদপে কোনো সমস্যাই নয়। এ ক্ষেত্রে মুমিনদের সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকা আবশ্যক যে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অসুবিধার কারণ কোনো বিষয়কে যেমন পালনীয় করেননি তেমনি মানুষের জন্য কল্যাণকর কোনো বিষয় থেকে তাদেরকে বঞ্চিতও করেননি। তিনি যে নিষিদ্ধতা দিয়েছেন, মানুষ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা না হোক, তাতে যে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অকল্যাণ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার তিনি যেগুলোয় বৈধতা দিয়েছেন তাতে মানুষের কল্যাণ থাকার বিষয়টি অবিসংবাদিত। এ বিশ্বাস ও আস্থা ছাড়া মুমিনের ঈমান পূর্ণতা পায় না। সামাজিক সমস্যা নিরূপণের ক্ষেত্রেও এর পরিপূর্ণ প্রকাশ অনিবার্য। এ প্রত্যয় ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ কখনোই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।

---

[১] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ আল-কুর'আন, ৫:৯০-৯১

[২] الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ- আল-কুর'আন, ২৪:২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল[১] দেশ হিসেবে নানাবিধ সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। সমাজব্যবস্থার গঠন-প্রকৃতি ও কার্যধারা, সামাজিক পরিবর্তন প্রবাহ ও এর বিভিন্ন মাত্রা এবং সমাজবাসী মানুষের মূল্যবোধ-দৃষ্টিভঙ্গি তারতম্যপূর্ণ হওয়ায় সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার স্বরূপ-প্রকৃতি বৈচিত্রধর্মী হয়। এরূপ বৈচিত্রের মধ্যেও বাংলাদেশে মুখ্যভাবে যে সব অস্বস্তিকর অবস্থা সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ দারিদ্র্য, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, বস্তি ও শহুরে সমস্যা, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, দুঃস্থতা ও নির্ভরশীলতা, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, শিশুশ্রম, লিঙ্গ বৈষম্য ও বঞ্চনা, দুর্নীতি। সমাজ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় সাধারণত উপরে বর্ণিত সমস্যার মধ্যে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, আত্মহত্যা ইত্যাদিকে বিচ্যুত আচরণ হিসাবে আলোচনা করা হয়। বিচ্যুত আচরণ হিসেবে মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন, লিঙ্গ বৈষম্য ও বঞ্চনা এবং পতিতাবৃত্তি ব্যাখ্যাত হওয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও এর সাথে মনো-সামাজিক, জৈবিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের মিথস্ক্রিয়া সামাজিক অস্বস্তির বহুমাত্রিকতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। সেজন্য এগুলো বিচ্যুত আচরণের গণ্ডির বাইরে আলোচিত হতে পারে। অন্যদিকে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বস্তি ও শহুরে সমস্যা এবং শিশু শ্রম মুখ্যত সমাজ কাঠামোগত পরিস্থিতি হিসাবে অনুধ্যানের আবশ্যকতা দাবি করে। সে প্রেক্ষিতে এসব সমস্যাগুলোও বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে পারে। সামাজিক সমস্যা আলোচনার ধারাক্রম যেভাবেই বিন্যস্ত করা হোক না কেনো, সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাসমূহ বাংলাদেশে মুখ্য সমস্যা হিসেবে বিশ্লেষিত হতে পারে। আর এরূপ বিশ্লেষণ সঙ্গতভাবেই বহুমুখী অভিগমনভিত্তিক হওয়া আবশ্যক।[২]

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ বহুমুখী ও পরস্পর জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। দীর্ঘদিনের অপরিকল্পিত বিদেশী শাসন ও শোষণের প্রভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলই সত্যিকারার্থে দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে রাজনীতি করে না। ক্ষমতার মসনদে আরোহনের জন্য তারা রাজনীতি করে। যে কারণে ক্ষমতায় যেতে পারলে নিজেদেরকে সফল ভাবে, না যেতে পারলে ব্যর্থ ভাবে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যেগুলোকে সমস্যা মনে করে, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সেগুলোই নিজেরা আচরণ করতে থাকে। ফলে এ দেশে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের সমস্যাসমূহ বহুমাত্রিক। এদেশের বেশিরভাগ সমস্যা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে সৃষ্ট। সেজন্য বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো প্রকৃতিগতভাবে অর্থকেন্দ্রিক। মাথাপিছু নিম্ন আয় এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছে। ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্থায়ী কারণরূপে বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা প্রকৃতিগতভাবে অর্থকেন্দ্রিক হলেও শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রকটতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়ন ও শিল্পায়নজনিত সামাজিক পরিবর্তন ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার ফলে হতাশা, ব্যর্থতা, ভূমিকার দ্বন্দ্ব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যার প্রকটতা বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

[১] সাধারণত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে সমস্ত দেশ একসময় কোনো না কোনো উপনিবেশবাদী শক্তির উপনিবেশ ছিলো এবং এখনও পর্যন্ত প্রযুক্তি, শিল্পায়ন ও মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে অনুন্নত, সে-সমস্ত দেশকেই উন্নত বিশ্বের রাজনীতিবিদ-অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নশীল দেশ (Developing Countries) বলে অভিহিত করেন। এই দেশসমূহকে কেউ কেউ বলেন স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (Less Developing Countries - LDC) আবার কেউ কেউ বলেন অনুন্নত দেশসমূহ (Undeveloping Countries)। হাজনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫-৯৬

[২] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, পূর্বোক্ত, পৃ.১১০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বিরাজমান সামাজিক সমস্যাগুলোর লক্ষণীয় স্বরূপ হলো, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা, ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া এবং বহুমুখিতা। বাংলাদেশের কোনো সমস্যাই একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করছে না। প্রতিটি সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অন্যটির কারণরূপে সমাজে বিরাজ করছে। বাংলাদেশে সামাজিক শ্রেণী এবং স্তর বিন্যাসের প্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। যেমন উচ্চ শ্রেণীতে সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রকটতা অধিক। কিন্তু নিম্ন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যাগুলো প্রধানত মৌল চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য ও জনসংখ্যাস্ফীতিকে বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে দারিদ্র্য হলো এ দেশের প্রধান সমস্যা। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের প্রভাব থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে আসতে পারছে না।[১]

সমস্যা নির্ধারণের নীতি যাই হোক, প্রত্যক্ষণের সূত্র যেটাই গ্রহণ করা হোক, সচেতন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে বর্তমান বাংলাদেশে যে সমস্যাগুলো দৃষ্টিগোচর হয় তা প্রকাশ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য। এরমধ্যে গোপনীয়তা নেই, সম্ভবত ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমস্যাগুলো গোপন রাখার কোনো চেষ্টা বা উদ্যোগও নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত, ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত পর্যবেক্ষণ এবং নানা গবেষণার ফল হিসেবে বাংলাদেশের সমাজে যে সমস্যাগুলো প্রায় অবিসংবাদিতভাবে সনাক্ত করা হয় সেগুলো হলোঃ অজ্ঞতা, অপরাধ, অবিচার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে পাচার, অলসতা, আত্মসাৎ, আত্মহত্যা, আরামপ্রিয়তা, এইচ.আই.ভি ও এইড্স, কর্মবিমুখতা, কিশোর অপরাধ, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ঘুষ, চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাই, জনসংখ্যার আধিক্য, জুয়া, ডাকাতি, দলবাজি, দারিদ্র্য, দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি, দুঃস্থতা ও নির্ভরশীলতা, ধূমপান, নারী নির্যাতন, নিরক্ষরতা, নৈতিক অবক্ষয়, পতিতাবৃত্তি, পুষ্টিহীনতা, প্রবীণ সমস্যা, বস্তি, বাসস্থান সমস্যা, বিশৃঙ্খলা, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, ভূমিকা ও মর্যাদার অসঙ্গতি, মাদকাসক্তি, যুব অসন্তোষ, যৌতুক প্রথা, শহুরে সমস্যা, শিশু শ্রম, শ্রমিক অসন্তোষ, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থান্ধতা, স্বাস্থ্যহীনতা, সুদ এবং হত্যা।[২] বাংলাদেশের এ সকল সমস্যা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় এই সমস্যাগুলো হয় অর্থকেন্দ্রিক অথবা সাংস্কৃতিক ও মানসিক। এর সাথে যুক্ত হয় ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের প্রভাব। সমস্যাগুলোর পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া ও নির্ভরশীলতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের যে কোনো দিককে কেন্দ্র করে অন্যান্য দিকের ওপর বিরূপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্য সমস্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন একক কোনো সামাজিক সমস্যা নেই। একটি সমস্যা নিজে যেমন সমস্যারূপে বিরাজ করে তেমনি অন্য সমস্যা সৃষ্টিতেও কারণ হিসেবে কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশে সমস্যা সৃষ্টি ও বিস্তারে এ ধারা বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

উদাহরণত বলা যায়, জনসংখ্যাস্ফীতি বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। এটি স্বয়ংসৃষ্ট কোনো সমস্যা নয়। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি বহু কারণ যেমন এর জন্য দায়ী তেমনি জনসংখ্যাস্ফীতিও স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। এভাবে বিভিন্ন সমস্যার ক্রমাগত প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশের সমাজে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অতীত আর বর্তমানের সমস্যা আমাদেরকে ভবিষ্যতে আরো প্রবল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। "ইবনে বতুতার বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ-দুটি পৃথক ছবি যেন। একটিতে রং আর রূপের বিচিত্র ঐশ্বর্য অন্যটিতে তা অনুপস্থিত। শেষের ছবিটি আজকের বাংলাদেশের। ইতিহাসের সুদীর্ঘ কণ্টকিত পথ অতিক্রম করে এসেছে এ বাংলাদেশ-সে ইতিহাস অনেক ভাঙা-গড়ার, অনেক উত্থান-পতনের। দীর্ঘকাল আমরা পরের হাতে শাসিত হয়েছি। বিদেশীরা আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। এদেশের মানুষের জন্য রেখে গেছে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার তিমির।[৩]

---

[১] ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯-৫০

[২] দ্রষ্টব্যঃ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, / সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, পূর্বোক্ত/ ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, পূর্বোক্ত/ আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, পূর্বোক্ত/ প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকর্ম, পূর্বোক্ত/ ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত

[৩] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড, বাংলাদেশ ঃ মাটি ও মানুষ, সাহিত্য কথা, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ.১০৫-০৬

Dhaka University Institutional Repository

সব দিক বিবেচনাতে বাংলাদেশ একটি সমস্যা আক্রান্ত জনপদ। এ সমস্যা থেকে দেশের সকল মানুষ মুক্তি পেতে চান। যে মানুষটি সমস্যা সৃষ্টির কারণ, তিনি নিজেও সমস্যার অবসান চান। হয়তো নগদ লাভের প্রত্যাশা তার সে চাওয়াকে প্রবল করে না, কিন্তু মনের মধ্যে তিনিও যে সমস্যাহীন শান্তিপূর্ণ জীবন প্রত্যাশা করেন তাতে কোনো সংশয় নেই। বাংলাদেশকে সমস্যামুক্ত করার সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা প্রচেষ্টা সবসময়ই আমাদের চোখে পড়ে। বড় বড় সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম হয়, দেশে-বিদেশের অগুণতি প্রজ্ঞাবান মানুষ সে সকল সমাবেশে সমস্যা নিরসনের মোক্ষম নানা উপায় বাতলে দেন। কিন্তু সমস্যা থেকে যায় সমস্যার জায়গাতেই। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের মানুষের নিকট সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যে অব্যর্থ অস্ত্র রয়েছে কোনো পক্ষই সে মাধ্যমটি ব্যবহারে আগ্রহী নন। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যতোটুকু সমস্যা মুক্ত জীবন যাপন করছেন, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তারা কিন্তু সেই অব্যর্থ অস্ত্রটি ব্যবহার করেই সমস্যামুক্ত থাকতে পারছেন। সেই অস্ত্রটির নাম ইসলাম। আগেই বলা হয়েছে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা নির্ধারণে গৃহীত নীতির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের নীতি হয়তো মিলবে না কিন্তু মানুষের সমস্যা নিরসনে ইসলাম প্রদত্ত সমাধান তা বলে মিথ্যে হয়ে যাবে না। বরং কেবল এর সমাধান মেনে নিলেই বাংলাদেশের মানুষ সমস্যামুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সমস্যার যে দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে আলাদাভাবে তার প্রতিটি সমস্যার সমাধানই ইসলাম দিয়েছে। তবে সমস্যাগুলো একটি আরেকটির পরিপূরক এবং একটি অন্যটি থেকে উৎসারিত বলে এখানে আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান এবং বাংলাদেশে তা কার্যকর করার উপায় অন্বেষণ করা হয়নি বরং মোটামুটি মৌলিক এবং যে সমস্যাগুলোর সমাধান হলে অন্য সমস্যাগুলোর সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে এমন কিছু সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে সমস্যাগুলোর পরিচয় ও প্রকৃতি, সৃষ্টির কারণ, বাংলাদেশের সমাজে সমস্যাগুলোর সৃষ্ট কুপ্রভাব এবং ইসলামের আলোকে তা সমাধানের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে বিশেষভাবে মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি প্রধানতম সমস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ যদি এ নির্বাচন থেকে এই ধারণা নিতে চান যে, বাংলাদেশে যে সমস্যাসমূহ রয়েছে, তার মধ্যে ধারাক্রম অনুসারে ধারাবাহিক সমস্যাগুলো নির্ধারণ করেছি, তা সঠিক নয়। কারণ দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া একেক জন মানুষ একেকভাবে বিশ্লেষণ করে, গবেষকদের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না। সে কারণে এ দাবি করা যাবে না, বাংলাদেশে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের প্রথম সমস্যাগুলো এখানে আলোচিত হচ্ছে। বরং এ দাবিই সঙ্গত হবে যে, দেশে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের মধ্যে প্রভাব, প্রতিক্রিয়া, ক্ষতি করার ক্ষমতা এবং বিস্তার বিবেচনায় এ সমস্যাগুলোই প্রধান। এ ছাড়াও এ দেশে আরো সমস্যা রয়েছে। তবে নির্বাচিত সমস্যাগুলোর সমাধান যদি ইসলামের আলোকে করা সম্ভব হয়, তাহলে অবশিষ্ট সমস্যাগুলো আর থাকবে না। বরং এগুলোর সাথে স্বাভাবিক ধারায় এমনিতেই নির্মূল হয়ে যাবে। আলোচনার জন্য নির্ধারিত সমস্যাগুলো হলো:

১। নৈতিক অবক্ষয়

২। আর্থিক অনাচার;

৩। শিক্ষা সমস্যা;

৪। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব;

৫। নারী নির্যাতন;

৬। জনসংখ্যা সমস্যা

এবং

৭। সন্ত্রাস।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিক অবক্ষয়

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক অবক্ষয়

নৈতিক অবক্ষয় বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সামাজিক সমস্যা। এটি শুধু নিজেই সমস্যা নয়, বরং আরো অনেক সামাজিক সমস্যার জনক। দুর্নীতি, যৌতুক, নারী নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সম্পদ আত্মসাৎ, পণ্যে ভেজাল দেয়া, পণ্য নকল করা, ঘুষ, জুয়া, সুদ, হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলোর উদ্ভব নৈতিক অবক্ষয়ের কারণেই হয়ে থাকে। নৈতিক অবক্ষয় হলো নীতিবহির্ভূত বা নীতি সংক্রান্ত বিনাশ বা ক্ষতি। যে কাজ করা উচিত সে কাজ না করা বা বিপরীত কাজ করা, যে কথা বলা উচিত সে কথা না বলা বা উল্টো কথা বলা, যে স্বার্থ ও সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তা সংরক্ষণ না করা বা আত্মসাৎ করা ইত্যাদি নানা কাজে নৈতিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[১] বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে। এ দেশে নৈতিক অবক্ষয় জনিত সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে মিথ্যাচার, প্রতারণা, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, অবিচার প্রভৃতি বেশি পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ অধ্যায়ে বিষয়গুলোর প্রকৃতি ও কুফল ব্যাখ্যা করে এগুলো সমাধানে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে বাংলাদেশ থেকে সমস্যা নির্মূলের উপায় অন্বেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রকৃতি ও প্রভাব

সঠিকভাবে ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিক দর্শন মেনে না চলার কারণে বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে রসু খাঁ নামের এক আত্মস্বীকৃত ক্রনিক খুনি (সিরিয়াল কিলার) গ্রেফতারের পর নৈতিক অবক্ষয়ের ভয়াবহতায় বিষয়টি নতুনভাবে সামনে চলে এসেছে। কারণ "রসু খাঁ একা নয়, বিরলও নয়। আমাদের মধ্যে, আমরা যারা পুরুষ তাদের মনের গহিনে যে একেকটি খুদে রসু খাঁ ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই, তা নিশ্চিত হই কী করে?[২]

নৈতিক দৃঢ়তা ও নীতি শিক্ষার অভাবে দেশের ভবিষ্যৎ মেধাবি শিক্ষার্থীরা ধ্বংসের চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মহত্যার উদ্যোগ নেন।[৩]

ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান দিক। দেশে ১ কোটি বা এর চেয়ে বেশি অঙ্কের ঋণখেলাপি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১৯৬। এই খেলাপিদের কাছে ব্যাংকগুলোর মোট পাওনা ১৫৪৫১ কোটি টাকা।[৪]

চোরাচালান জাতীয় স্বার্থবিরোধী অনৈতিক কাজ। বাংলাদেশে ব্যাপকহারে চোরাচালান চলে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস দেশের সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে রেকর্ড প্রায় ৫শ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য আটক করেছে। ২০০৮ সালে এ ক্ষেত্রে আটকের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৪শ কোটি টাকা।[৫]

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলায়[৬] বাংলাদেশে মরণব্যাধি এইডস রোগের বিস্তার ঘটছে। ২০০৯ সালে দেশে এইডসে আক্রান্ত হয়ে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশে প্রথম এইডস রোগী চিহ্নিত করা হয় ১৯৮৯ সালে। ২০০৯ সালে এইচআইভি সংক্রমিত ২৫০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরমধ্যে এইডস রোগী ১৪৩জন।[৭]

---

[১] হাফিয আহমদ, ইসলামের নীতি দর্শন, ইকরা, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ.২

[২] ফারুক ওয়াসিফ, রসু খাঁ এক নৈতিক ভূমিকম্পের নাম, প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১০

[৩] প্রথম আলো ২ আগস্ট ২০০৯, পৃ.২ (সেমিনারে মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী ভুগছেন মানসিক সমস্যায়)

[৪] প্রথম আলো ৬ জুলাই ২০০৯, পৃ.১ (ঋণখেলাপি দুই হাজার, ব্যাংকের পাওনা ১৫ হাজার কোটি টাকা)

[৫] জনকণ্ঠ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ.১৮

[৬] যৌন সম্পর্ক ছাড়া আরো অনেকভাবেই এইড্স ছড়ায়। তবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য অনেকগুলো সেবা সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে ৮৯% এইড্স রোগীই যৌনাচারের মাধ্যমে এই মরণব্যাধির শিকার হয়েছেন। (স্বাস্থ্যবার্তা, ইবনে সীনা ট্রাস্ট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ.২৩)

[৭] প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ঘুষ নিয়ে এমন কাজ করে যাতে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পদ ভীষণভাবে হুমকিগ্রস্ত হয়। ফেব্রো–৪ লঞ্চ দুর্ঘটনায় ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পূর্বাহ্নে লঞ্চটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অথচ লঞ্চটির তলদেশ ছিলো হালকা ও নরচে ধরা। মারাত্মক এই ত্রুটির কারণে ২০০৫ সালে এটিসহ ২১২টি লঞ্চকে নোটিশ দেয়া হয়েছিলো। পরে এর সঙ্গে যোগ হয়ে এ ধরনের লঞ্চের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪ শত। এসব লঞ্চের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।[১]

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন 'ঢাকা শহরে পর্নোগ্রাফি ব্যবহারে শিশু' এবং 'যৌনবৃত্তিতে শিশুদের সংশ্লিষ্টতা' বিষয়ে দুটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে। এতে জানানো হয়, ঢাকা শহরে ৭৭ শতাংশ কিশোর পর্নোগ্রাফির দর্শক। স্কুলশিক্ষার্থীরা মুঠোফোন, সাইবার ক্যাফে ও বাসায় ইন্টারনেটে এবং কর্মজীবি ও পথশিশুরা ভিসিডিতে পর্নোগ্রাফি দেখে।[২] পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়: "দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাছে মোবাইল ফোনে পর্নোগ্রাফি সংরক্ষণ করা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৩] অবস্থা এতটাই নাজুক যে, দেশে প্রচলিত ৮৪টি পর্নোসাইট বন্ধের সুপারিশ করা হলেও বিটিআরসি তাতে আন্তরিকতা না দেখিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে কালক্ষেপন করেছে মাত্র।[৪]

নাগরিক ফোরামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মহাজোট সরকারের ২০০ দিনে ২৭ বার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ৫৯২ জন খুন হয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঘটনা ঘটেছে ৯০টি, ১৮৯টি দখল ও ১১১টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।[৫]

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে কালো টাকা উপার্জনকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হচ্ছে, একে বৈধতা দেয়ার জন্য নানা নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে যে, কাল টাকা বিনিয়োগ করলে উৎস খতিয়ে দেখা হবে না।[৬] আয়কর বা অন্য কোনো আইনে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।[৭]

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে দুর্নীতিগ্রস্তরাই দেশে পদোন্নতি, বিদেশ সফরের মত নানা পুরস্কারে ভূষিত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ দিকে ট্রুথ কমিশন গঠন করা হলে সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৪৫২ জন কর্মকর্তা–কর্মচারী স্বেচ্ছায় গিয়ে নিজেদের দুর্নীতির কথা স্বীকার করলেও কারোই সাজা হয়নি বা কারো বিরুদ্ধেই বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং অধিকাংশই উচ্চতর ও সুবিধাজনক পদে বদলি হয়েছেন, দেশে–বিদেশে সরকারি সুবিধায় ট্যুর ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন।[৮] ডিসিসির ট্রাকের সংখ্যা ১০০ হলেও তেল ওঠানোর বিল করার সময় দেখানো হচ্ছে ২০০ ট্রাক।[৯]

চিকিৎসকগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ, মফস্বলে সরকারি হাসপাতাল ও কলেজে নিয়োগ পাওয়ার পরও সেখানে যোগদান না করা, হাসপাতালে চিকিৎসা না করিয়ে নিজের চেম্বার বা ক্লিনিকে চিকিৎসা করতে উৎসাহ দেয়া ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্য করা, কমিশনের আশায় অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষায় অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করা, কমিশনের বিনিময়ে মানহীন হলেও নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেয়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মস্থলে দেরিতে উপস্থিত হওয়া চিকিৎসকদের নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রই স্পষ্ট করে তোলে।[১০]

---

[১] প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.২০

[২] প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৭

[৩] নয়া দিগন্ত, ১ জুন ২০০৯, পৃ.৬

[৪] প্রথম আলো ২৫ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৩

[৫] প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১৭

[৬] প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১৬

[৭] শওকত হোসেন, কালো টাকা সাদা করলে কোনো আইনেই প্রশ্ন তোলা যাবে না, প্রথম আলো ১৪ জুন ২০০৯, পৃ.১

[৮] প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৯] প্রথম আলো ৩০ জুলাই ২০০৯, পৃ.৭

[১০] প্রথম আলো ২১ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠানেই জনবল নিয়োগ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয় না। ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী, ক্ষমতাসীনদের স্বজন এবং ঘুষ দেয়া ছাড়া এই দেশে এখন কোনো চাকুরি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের খাদ্য বিভাগের ১১০০ পদের নিয়োগ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের কাজ বন্ধ হওয়ায় অনিয়মের অনেকগুলো মাত্রা উন্মোচিত হয়েছে। এ ঘটনা দীর্ঘসূত্রিতা, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থের বিনিময়ে আনুকূল্য বিতরণ প্রভৃতি অনাচারের ইঙ্গিত বহন করে। ..... অতীতে পুলিশ বাহিনীতে দলীয় লোক নিয়োগের কুফল আমরা হাতেনাতে পেয়েছি।[১]

নিয়োগ এবং সরকারের প্রতিটি বিভাগের বৈধ-অবৈধ প্রতিটি কাজে এখন ঘুষ আবশ্যকীয় লেনদেন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ঘুষ ছাড়া কেউ কাজ করেন না। যে কারণে এল.জি.আর.ডি মন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে, "ঘুষ নিয়ে যে অফিসার কাজ করেন, তিনি সৎ অফিসার। আর যিনি ঘুষ নিয়েও কাজ করেন না, তিনি অসৎ অফিসার।[২] অবস্থা এতই সঙ্গীণ যে, দেশের শিক্ষামন্ত্রী মিনতি জানাচ্ছেন, "কেউ ঘুষ দেবেন না। কেউ যেন ঘুষ না নেয়, সেটাও দেখুন।[৩]

বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয়ের আরো একটি দিক হলো, এ দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা আছেন তারা ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে অবলীলায় ব্যবহার করেন। এর প্রমাণ "রাজনৈতিক চাপ না থাকলে পুলিশ অনেক বেশি দায়িত্বশীল আচরণ করে। আসামি গ্রেপ্তার থেকে শুরু করে তদন্ত – সবই মান বজায় রেখে করার চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষও পুলিশের কাজে সন্তুষ্ট থাকে। পুলিশ সংস্কার কর্মসূচীর (পিআরপি) আওতায় পরিচালিত জনগণের মনোভাব (পাবলিক অ্যাটিচিউড ফলোআপ সার্ভে) সংক্রান্ত এক জরিপের ফলাফলে এসব তথ্য উঠে এসছে।[৪]

রাজনৈতিক প্রভাব যে পুলিশের কাজে এবং অপরাধ নির্মূলে বড় বাধা তার প্রমাণ পাওয়া যায় সীতাকুন্ডে এক সাংসদ পুত্রের অন্যায় কাজ থেকে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সীতাকুণ্ডে বৃক্ষ নিধনের ঘটনায় মামলা দায়েরের পাঁচদিনেও মূল হোতারা গ্রেফতার হয়নি।[৫]

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স প্রদান করে পতিতাবৃত্তিকে 'কাজ' এবং পতিতাদেরকে 'যৌনকর্মী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[৬] অথচ পতিতাদের কাজই হলো অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর ইসলামে এটি জঘন্য হারাম কাজ। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ যৌনকর্মী রয়েছে।[৭] বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের সাপ্তাহিক খদ্দের আপ্যায়নের হার এশিয়ার অন্যান্য যে কোনো দেশের থেকে বেশি। নির্দিষ্ট আবাসস্থল বা পতিতালয়ভিত্তিক যৌনকর্মীরা সপ্তাহে গড়ে ১৮.৮ জন পুরুষের সাথে মিলিত হয় এবং হোটেলে সে সংখ্যা সপ্তাহে ৪৪।[৮] অন্য এক হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের যৌনকর্মীরা গড়ে প্রতিদিন ৫জন খদ্দেরের সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতিদিন ৫ লক্ষ লোক যৌনকর্মীদের সাথে মিলিত হয়।[৯]

---

[১] প্রথম আলো ৯ জুন ২০০৯, পৃ.১০

[২] যুগান্তর ১৬ জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১

[৩] প্রথম আলো ১৪ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১২

[৪] শরিফুল হাসান, রাজনৈতিক চাপ পুলিশের কাজে সবচেয়ে বড় বাধা, প্রথম আলো ২৪ আগস্ট ২০০৯, পৃ. ২০ ও ১৯

[৫] ইত্তেফাক, ০৬ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৬] মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন ও বুদ্ধদেব বিশ্বাস, যৌনকর্মীদের এইডস সচেতনতা : একটি সমাজবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮০, অক্টোবর ২০০৪, পৃ.৪৩-৫৫

[৭] Shakkel A. I. Mohammad, Women and HIV/AIDS in Bangladesh : A Global Review, NIRMUL-Quarterly Health Journal of Bangladesh AIDS Prevention Society, Issue 4, Dhaka, March 2000, p.17

[৮] HIV in Bangladesh: Where is it going? Background Document for the Dissemination of the Third round of National HIV and Behavioral Surveillance, National AIDS/STD Program, Directorate General of Health Services, MOHFW, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, November 2001, p.13

[৯] Prof. Dr. Md. Nazrul Islam, HIV/AIDS Situation in Bangladesh : A Situation of Low Prevalence and High Risk, A Paper Presented at Dialogue on HIV/AIDS : A Case of Low Prevalence and High Risk in Bangladesh, Organized by South-South Center, Dhaka, p.45

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয়ের কয়েকটি প্রধান অনুসঙ্গ

মিথ্যাচার, প্রতারণা, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি ও অবিচার বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অনৈতিক অনুসঙ্গ। এ পর্যায়ে নৈতিক অনুসঙ্গগুলোর বিভিন্ন দিক এবং সমাধানে ইসলামের নির্দেশনা ব্যাখ্যা করা হলো।

মিথ্যাচার

বাংলাদেশে বিরাজমান নৈতিক অবক্ষয়জনিত সামাজিক সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো মিথ্যাচার। কেননা সাধারণভাবে এ দেশের সকল মানুষই কমবেশি এ অপরাধের সাথে জড়িত। ফলে অন্য যে কোনো সমস্যার চেয়ে মিথ্যাচারের সাথে সমাজের বেশি সংখ্যক লোক জড়িত থাকে। যে জন্যে এ সমস্যাটির ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য যে কোনো সমস্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি। মিথ্যা আচরণের নাম মিথ্যাচার। অভ্যাসগতভাবে যে লোক মিথ্যা বলে, যার কাজ কর্মে, লেনদেন ও সামাজিক মেলামেশায় মিথ্যা প্রবল থাকে তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। প্রকৃত ঘটনা বা অবস্থার বিপরীত বর্ণনা দেয়া, বিকৃত বা পরিবর্তিত তথ্য পরিবেশন হলো মিথ্যাচার।[১] কুর'আন মাজীদে একে 'কিযব' বলা হয়েছে। মিথ্যাবাদীকে 'কাযিব' বলা হয়। আর যার মিথ্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তাকে বলা 'কাযযাব'। যেমন – মুসায়লামা কাযযাব।[২]

মিথ্যাচারের কুফল

মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মিথ্যাচারের কুফল অপরিসীম। বাংলাদেশে যতো অশান্তি, যতো অভিযোগ, পরস্পরের প্রতি যতো অবিশ্বাস ও শত্রুতা তার প্রধান কারণ মিথ্যাচার। মিথ্যাচারের সবচেয়ে বড় কুফল হলো, এর ফলে মানুষ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কেউ কারো ওপর আস্থা রাখতে পারে না। আবার নিজের মিথ্যাচারের জন্যে মিথ্যাবাদী অন্যকে বিশ্বাস করে না। নিজের মতো অন্যদেরকেও সে মিথ্যাবাদী মনে করে। ফলে সমাজে আস্থাহীনতা, অবিশ্বাস, অবিশ্বস্ততা ও ঘৃণার দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়, লেনদেন, আত্মীয়তা, উপকার কোনো ক্ষেত্রেই মানুষ বিশ্বাস করার মতো কোনো কিছু পায় না। মিথ্যাচারের প্রভাবে প্রকৃত সত্য বিষয়ও প্রবল সন্দেহের শিকার হয়।

মিথ্যাচার সমাজের মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। বিকৃত বা পরিবর্তিত তথ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। বরং এক সময় এর প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। বাংলাদেশে মিথ্যাচারের ফলে উদ্ভূত এ জাতীয় শত্রুতা প্রতিনিয়ত আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিথ্যাচার আরো অসংখ্য মিথ্যার জন্ম দেয়। মিথ্যা বলতে পারার দরুন মানুষ দায়িত্বে অবহেলা, সম্পদ আত্মসাত, অপরাধ অস্বীকারসহ সবরকমের অন্যায় করতে পারে। যে কোনো ধরনের মিথ্যা বলতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। বাংলাদেশে এর আশংকাজনক ব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। অফিসে অন্যায় সুবিধা নেয়ার জন্য মিথ্যা বলা হচ্ছে, নকল পণ্য ভালো হিসেবে বিক্রির জন্য মিথ্যা বলা হচ্ছে, অধিক নম্বর পাওয়ার জন্য মিথ্যা বলা হচ্ছে। এভাবে একটি মিথ্যা বলার পর সেই মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রামাণ্য দেখানোর জন্য আরো আরো মিথ্যা বলতে বাধ্য হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ জন্যেই বলেছেন, 'মিথ্যা সকল পাপের জননী'।[৩]

মিথ্যাচার মানুষকে তার প্রাপ্য ও আইনসঙ্গত অধিকার লাভ থেকে বঞ্চিত করে। মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বলে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করে। মানুষের পাওনা না দিয়ে তা আদায়ের দাবি করে। দায়িত্বে অবহেলার পরও নিজেকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ দাবি করে। এভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে ন্যায্য অধিকার ও ন্যায়বিচার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়।

---

[১] হাফিয আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪

[২] রাসূলুল্লাহ (স)এর জীবদ্দশায় মুসায়লামা নবুয়তের দাবি করে। সে রাসূলুল্লাহ (স)কে নবুয়ত আধাআধিভাবে ভাগ করে নেয়ারও প্রস্তাব প্রদান করে। তার এমন ধৃষ্টতা ও মিথ্যাচারের জন্য স্থায়ীভাবে তার সাথে 'কাযযাব' বা চরম মিথ্যুক পদবী সংযুক্ত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স)এর ইন্তিকালের পর মুসায়লামা তার এই মিথ্যা দাবি আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশ করে। শেষে ইয়ামামায় (৬৩৪ খ্রি) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সে নিহত হয়। – সায়্যিদ আতহার হুসেন, পৌরবময় খিলাফত (অনুবাদ: মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান), ইফাবা, ২০০০, পৃ.৪৭

[৩] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না। তার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা) অভিশাপ দেন। মিথ্যাবাদীর ইবাদত কবুল হয় না। মিথ্যাবাদীকে মুনাফিক এবং ঈমানহীন মনে করা হয়। সে হিদায়াতের পথে চলতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে হিদায়াতের পথ দেখান না। সে জন্যে মিথ্যাচারের পরকালীন পরিণতি হলো জাহান্নাম। ইবাদত কবুল হয় না বলে এ ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। তাই মিথ্যাচারের ভয়ানক পার্থিব ও পরকালীন পরিণতির কথা মনে করেই আমাদের কর্তব্য হলো যে কোনোভাবে নিজেকে এবং সমাজকে মিথ্যাচারের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা।

মিথ্যাচার প্রতিরোধ ইসলামের বিধান ও ভূমিকা

ইসলামে মিথ্যাচারকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মুমিনদের সত্য বলার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করেন: "মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো।[১] কোনো মুমিনই আল্লাহর এ সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে মিথ্যাচারে লিপ্ত হতে পারে না। কেউ যদি লিপ্ত হয় আল-কুর'আনে তার ঈমানহীনতার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "মিথ্যার আশ্রয় তারাই নেয় যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান পোষণ করে না।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করে মানুষকে মিথ্যাচার থেকে দূরে রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে।[৩] সাধারণভাবে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়ে তিনি বলেন, "তোমাদের সত্যের অনুশীলন করা উচিত। কেননা, সত্য পুণ্যের পথে পরিচালিত করে আর পুণ্য নিশ্চিতভাবেই জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। আর ব্যক্তি যখন সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয় এমনকি আল্লাহর নিকট তার নাম পরম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে মিথ্যা পরিহার করা। কেননা, নিশ্চয় মিথ্যা পরিচালিত করে পাপের পথে আর পাপ পরিচালিত করে নরকের পথে। আর ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি আল্লাহর নিকট তার নাম চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।[৪]

মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া তিনবার শিরক করার মতো জঘন্য"।[৫]

মিথ্যাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কুর'আন হাদীসের এমন ঘোষণা ও সতর্কবাণীর পর কোনো মুসলিমের পক্ষে মিথ্যাচারে অভ্যস্থ থাকা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ বিষয়ে বলেছেন: ঈমান ও মিথ্যাচার কখনো একত্র হতে পারে না।'[৬]

স্বাভাবিক অবস্থায় মিথ্যাকে হারাম ঘোষণা এবং একে নিষিদ্ধ করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) যে ভাষা ও নীতি প্রয়োগ করেছেন – মিথ্যাচার প্রতিরোধের জন্য তাই যথেষ্ট। কিন্তু এমন মানুষ থাকা অস্বাভাবিক নয় যে, কুর'আন হাদীসের এ নির্দেশ মেনে চলবে না। ইসলাম তারও ব্যবস্থা করেছে। কুর'আন হাদীসের এমন ঘোষণার পরও কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিংবা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তার বিরুদ্ধে পৃথিবীতেই শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় আর এর অনুকূলে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না; তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না।[৭]

---

[১] আল-কুর'আন, ৩৩: ৭০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)

[২] আল-কুর'আন, ১৬: ১০৫

[৩] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৪] قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا - واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا – প্রাগুক্ত

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] আল-কুর'আন, ২৪: ৪ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

Dhaka University Institutional Repository

প্রতারণা

প্রতারণা মিথ্যারই এক বিশেষ রূপ। লোকদের ঠকানো, ফাঁকি দেয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, পণ্যে ভেজাল দেয়া, পণ্যের দোষ গোপন করা, ওজনে কমবেশি করা কিংবা অন্য কোনোভাবে হয়রানি করার নাম প্রতারণা। এ পদ্ধতিতে প্রকৃত বিষয় যে কোনোভাবে গোপন বা আড়ালে রেখে ধাপ্পা বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে স্বার্থসিদ্ধি করা হয়। মুদ্রা জাল করা, পরীক্ষায় নকল করা, পণ্য নকল করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এমনকি নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করাও প্রতারণার শামিল।

প্রতারণার কুফল

প্রতারক আল্লাহর আদেশ লংঘন করে। এর মাধ্যমে যে ক্ষমাহীন পাপের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিও না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না।[১]

প্রতারণা একটি মন্দ কৌশল। এতে একপক্ষ দারুণ ক্ষতির শিকার হয়। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত প্রতারণার বিষয়টি ধরা পড়ে। সে প্রতারকের প্রতারণার প্রতিবিধান করতে চায়। যে কোনো উপায়ে তার সাথে কৃত অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধ পরিকর হয়। ফলে প্রতারকের সাথে প্রতারিত ব্যক্তির তীব্র শত্রুতা সৃষ্টি হয়। প্রতারণার ধরন ও প্রকৃতিভেদে শত্রুতা সৃষ্টির এ বিষয়টি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

প্রতারণা প্রতারককে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। ভালোবাসে না। সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তার যে কোনো ভালো কাজকেও মানুষ সন্দেহের চোখে দেখে। সবশ্রেণীর মানুষের অবিশ্বাস ও ঘৃণায় প্রতারকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা করে না। প্রতারণার বিষয়টি প্রমাণ হওয়ার পর কেউ তার সাথে লেনদেনও করতে চায় না।

সাধারণত সংগঠিত প্রতারকগোষ্ঠী প্রতারণা করে। প্রতারণা ধরা পড়ে গেলে যাতে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে সেজন্যে পেশিশক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থাও রাখে। তারা প্রতারণা করে যেমন অন্যায় করে তার চেয়েও বড় অন্যায় করে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের নির্যাতন করে। ফলে সৃষ্টি হয় সন্ত্রাস, অস্থিতিশীলতা ও অরাজকতা। বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ে মানবজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। মানুষের সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। জীবন ও সমাজ অসহ্য পরিস্থিতির শিকার হয়।

প্রতারণা প্রতিরোধের ইসলামের বিধান ও ভূমিকা

প্রতারণা প্রতিরোধে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর বিধান দিয়েছে। প্রতারণার ধরন ও ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে প্রতারকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার অধিকার ইসলামি আদালতের থাকবে। ইসলাম প্রতারণা হারাম করেছে। কেউ যাতে প্রতারণা করে কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে না পারে সে লক্ষ্যে প্রতারণা প্রতিরোধের জন্যে বিভিন্ন নির্দেশ ও নির্দেশনা জারি করেছে। এ সকল নির্দেশ বাস্তবায়ন করে প্রতারণা প্রতিরোধ করা যায়।

প্রতারণা ঈমান পরিপন্থী কাজ। প্রতারণা করে কেউ মুসলিম থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।'[২] মুমিন থাকতে হলে প্রতারণা ছাড়তে হয়।

প্রতারণাকারী মুনাফিক। আর মুনাফিক থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: মুনাফিক নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা) আখিরাতে মুনাফিকের ভয়ংকর পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দুমুখোনীতি অবলম্বন করবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দুটি জিহ্বা থাকবে।[৪]

দুনিয়া ও আখিরাতে এ জাতীয় পরিণতি জানার পর কোনো মু'মিন প্রতারণা করতে পারে না।

---

[১] وَ لاتَلْبِسُوْا الحَق بِالبَاطِل وَتَكْتُمُوْا الحَق وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ – আল-কুর'আন, ২:৪২

[২] مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৩] আল-কুর'আন, ৪: ১৪৫ (إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)

[৪] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

Dhaka University Institutional Repository

ব্যভিচার

ব্যভিচার হলো একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহিত স্বামী স্ত্রী হওয়া ছাড়া পরস্পর যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়া। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে তারা বিবাহিত হোক বা না হোক সে বিষয়টি বিবেচ্য নয়, মূল বিবেচ্য বিষয় বৈবাহিক সম্পর্ক নেই এমন কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। কুর'আন মজীদে একে 'যিনা' বলা হয়েছে। ইসলামের নৈতিক মানদণ্ডে যে সকল আচরণ জঘন্যতম নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় তার মধ্যে ব্যভিচার নিকৃষ্টতম।

ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা

ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আনো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে নারীদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন। তোমাদের যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। এরপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তাহলে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ করো।[১]

এটি ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি বিধান। সূরা নূরে এর চূড়ান্ত দণ্ড ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে কষাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহ ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্যে সূরা নিসার প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বিবৃত করেছেন। তা হচ্ছে অবিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কষাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন আর বিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কষাঘাত ও পাথরের আঘাতে হত্যা।[৩] সূরা নূরের শাস্তির সাথে এখানে কিছু বাড়তি সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ক) আয়াতের একশত কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে;

খ) কশাঘাতের পাশাপাশি অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের জন্যে একবছরের দেশান্তরের বিধান রাখা হয়েছে।

অবশ্য দেশান্তরিত করার এ বিধান একশত কশাঘাতের মতো বাধ্যতামূলক না কি বিচারকের ইচ্ছাধীন বিষয় সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। যেজন্যে এ বিষয়ে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন।

শাফিঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীতে এক বছরের জন্য অবশ্যই নির্বাসন দিতে হবে।[৪] হানাফী ইমামগণের মতে, ব্যভিচারীকে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বিচারক যদি রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তা'যীরী শাস্তির আওতায় তাকে নির্বাসন দিতে পারেন।[৫] ব্যভিচারী বিবাহিত হলে তাদের শাস্তি রজম বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা। এ শাস্তির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা)এর কথা ও কাজ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। উবাদা ইবনে সামিত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "বিবাহিতের শাস্তি বেত্রাঘাত ও রজম।[৬] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মালিকের স্ত্রীর সাথে জনৈক মজুরের যিনার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উনায়স আল-আসলামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি

---

[১] وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا- وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا আল-কুর'আন, সূরা নিসা : ১৫-১৬

[২] الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ- আল-কুর'আন, সূরা নূর : ২

[৩] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ, সুনানে নাসাঈ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৪] মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, খণ্ড ৭, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭১; আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খণ্ড ৪, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৯; আল-মারদাভী, আল-ইনসাফ, খণ্ড ১০, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৩-৪; আল-বহুতী, কাশশাফ, খণ্ড ৬, পৃ.৯১-৯২

[৫] আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪; আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, খণ্ড ৭, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯

[৬] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদুদ

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েটি স্বীকার করে, তাহলে তুমি তাকে রজম করো। মেয়েটি যিনার কথা স্বীকার করে এবং তাকে রজম করা হয়।[১] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই যে কয়েকটি রজমের দণ্ড প্রদান করেছেন তাও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত।[২] হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, মনে রেখো, রজম আল্লাহর কিতাবেরই বিধান। বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে এবং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হলে অথবা গর্ভ হয়ে গেলে কিংবা কেউ স্বীকার করলেই তা কার্যকর হবে।[৩] তিনি আরো বলেন, আল্লাহর কসম! 'উমর আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছে' – লোকেরা এ কথা বলে বেড়াবে, এ আশঙ্কা না থাকলে আমি অবশ্যই কুর'আন মজীদে বিধানখানা লিখে দিতাম।[৪]

ব্যভিচার যেমন জঘন্যতম অপরাধ তেমনি এর শাস্তিও কঠিন। যে কারণে এ শাস্তি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে।

১। **মুসলিম হওয়া:** অবশ্য শাফিঈ ও হানাফী মাযহাব অনুসারে, ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম যারাই ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে এ শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৫]

২। **প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া:** ব্যভিচারী নারী-পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হলে শাস্তি কার্যকর করা যাবে।[৬] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়। বালক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল থেকে হুঁশ ফিরে আসা পর্যন্ত।[৭] তবে নেশাগ্রস্ত কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর হবে।[৮] কারণ নেশাগ্রস্ত হওয়াই তাদের জন্য হারাম ছিলো। অবশ্য ভুলক্রমে যদি কোনো নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কাউকেই শাস্তি দেয়া হবে না।[৯] শর্ত হলো, ভুল ধরা পড়ার পর সঙ্গম বন্ধ করে দিতে হবে।

৩। **ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা:** যে ব্যভিচারের অপরাধ এবং এর শাস্তি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না তাকে এ দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না। হযরত উমর, উসমান ও আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন: হদ্দ কেবল সে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে যে তা জানে।[১০]

৪। **স্বেচ্ছায় সঙ্গম করা:** কোনো নারী ধর্ষণের শিকার হলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমার উম্মাত থেকে ভুল-ত্রুটি ও জোরপূর্বক যে সব কাজ করা হয়, তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১১]

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুশ শুরূত,; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[২] হযরত মাইয ইবনে মালিক আল-আসলামী, গামিদ গোত্রের জনৈকা মহিলা ও দু ইয়াহুদীকে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক রজমের দণ্ড প্রদান করার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেখুন: আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৩] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ,; আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৪] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৫] আল-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড.৯, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫-৫৬; ইমাম মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খণ্ড.৪, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮৪, ৫০৮; মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, খণ্ড.৬, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫০; হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খণ্ড.৯, পৃ.১০৬

[৬] আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদাইয়ুস সনাই, খণ্ড.৭, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খণ্ড.৪, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪; আল-মারদাভী, আল-ইনসাফ, খণ্ড.১০, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭২, ১৮৭

[৭] رُفِعَ الْقَلَم عَن ثَلَث عَن الصبى حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৮] যায়লা'ঈ, তাবয়ীনুল হাকাইক শারহু কানযিদ দাকাইক, খণ্ড.৩, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৮; ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, খণ্ড. ৪, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৯

[৯] আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়াহ, খণ্ড. ২৪, পূর্বোক্ত, পৃ.২১

[১০] ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, খণ্ড.৯, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬

[১১] ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৫; জাসসাস, আহকামুল কুর'আন, খণ্ড ১, দারুল মা'আরিফা, কায়রো ১৪০২ হি পৃ.৬

Dhaka University Institutional Repository

৫। **ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যভিচার সম্পন্ন হওয়া:** রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অমুসলিম দেশে চুরি কিংবা ব্যভিচার করে চুরি বা ব্যভিচারের শাস্তির উপযোগী হলো। এরপর সে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসল, তার উপর চুরি বা ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।[১] এর কারণ হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে শালীনতার সীমা রক্ষা করে নারী পুরুষ চলাফেরা করে। এখানে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সকল সুযোগ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রে ব্যভিচারের সুযোগ অবারিত।

৬। **জীবিত নারীর সাথে সঙ্গম করা:** যদি কোনো পুরুষ মৃত কোনো নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ এটি বিকৃত রুচিসম্পন্ন মানুষের কাজ। এমন লোককে অন্য শাস্তি দিতে হবে।[২]

৭। **বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া:** ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের জন্য বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অবশ্য বাকশক্তিহীন লোক যদি লিখে, ইশারা করে বা অন্য কোনোভাবে ব্যভিচারিতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারে এবং সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা সংশয়হীন বলে প্রমাণ হয় তখন বাকশক্তিহীনের উপরও ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।[৩]

বাংলাদেশে কেউ যদি ব্যভিচার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কুর'আন-হাদীস নির্ধারিত ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। কেননা এটি ইসলামি রাষ্ট্র নয়। এখানে ব্যভিচারের সমর্থক এবং ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী অনেক অনুসঙ্গ রয়েছে। তাছাড়া এখানে অর্থের বিনিময়ে সাক্ষী-প্রমাণ করা করা সম্ভব। সুতরাং নিশ্চিত ব্যভিচারের প্রমাণ পেলেও বাংলাদেশে ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। তবে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক মান বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র যদি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে তা কার্যকর করা যাবে। আবার রাষ্ট্র যদি নৈতিক অবক্ষয় রোধে ব্যভিচারের ইসলামি আইন বাস্তবায়নের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে তাও কার্যকর করা যাবে।

মাদকাসক্তি

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "নেশাজাতীয় প্রত্যেকটি বস্তুই মাদক।[৪] আসক্তি হলো নিউরোট্রান্সমিশনের স্ব-আবেশিত এমন এক পরিবর্তন যা সমস্যা সৃষ্টিকারী আচরণের জন্ম দেয়।[৫] এর আলোকে বলা যায়, "Drug addiction is the habitual use of certain narcotic that leads in time to mental and moral deterioration, as well as to deleterious social effects.[৬]

মাদকাসক্তি হচ্ছে এমন একটি অভ্যাস যখন একজন মানুষ বিভিন্ন ধরনের মাদকের নিয়মিত ব্যবহারের মাধ্যমে তার শরীর ও মনকে ওই সব মাদকের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে তোলে।[৭] এটি এমন একটি মানসিক বা শারীরিক অবস্থা যার আবির্ভাব ঘটেছে জীবিত প্রাণী ও মাদকদ্রব্যের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে।[৮]

WHO প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে, মাদকাসক্তি হলো কিছু নির্দিষ্ট মাদকের প্রতি অনবরত অভ্যাসকে বুঝায় যা মানসিক ও শারীরিকভাবে অধঃপতন ঘটায় এবং যা সমাজের উপরও কুপ্রভাব সঞ্চার করে।[৯]

---

[১] ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৫, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬৬

[২] আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সানা'ই, খণ্ড.৭, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪; ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪, ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, খণ্ড.৯, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪; হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খণ্ড.৯, পৃ.১০৫

[৩] আল-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ৫, পৃ.৫৫, খণ্ড ৯, পৃ.৯৮, ১২৯

[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আশরিবা

[৫] এ. কে. নাজিবুল হক, মন ও মনোবিজ্ঞান, সম্পাদনা: এ. খালেক ও এ. ইউ. আহমেদ, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ.২০০

[৬] Kimbal Young & W Mack Raymond, Sociology and Social Life, New York, 1962, p.446

[৭] ড. খ. ম. রেজাউল করিম, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, নয়া দিগন্ত, ২৬ জুন ২০০৯, পৃ.৬

[৮] মুহাম্মদ সামাদ, মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক, ঢাবি পত্রিকা, ৪২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২) পৃ.১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেও বলা যায়, মাদকাসক্তি এক ধরনের অবিরাম নেশাগ্রস্ততা যার ফলস্বরূপ ক্ষেত্র মতে বিশেষ মাদকদ্রব্য অবশ্যই নিয়মিতভাবে সেবন করতে হয়।[২] ক্রমাগত ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, নিজের প্রয়োজনের তাড়নায় যে কোনো উপায়ে জোগাড় করতে হয়, শারীরিক ও মানসিক বা উভয়ভাবে এই ঔষধের প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।[৩]

বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ অনুসারে মাদকাসক্ত বলতে এমন এক মদ্যপায়ীকে বুঝায় যে অভ্যাসগতভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, মাদকদ্রব্য সেবন বা গ্রহণ যেনো তার নিকট রোগাক্রান্ত সমতুল্য; মদ্যপান তাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে, অবক্ষয়ের দিকে পলে পলে ধাবিত করে।[৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা যার ফলে রোগী ড্রাগের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একবার ড্রাগ ব্যবহারে ভালো লাগার আমেজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় পুনরায় ব্যবহারের ইচ্ছা। এভাবে পুনঃ পুনঃ ড্রাগ ব্যবহারের ফলে ড্রাগের প্রতি সহনশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে ব্যবহারকারীকে ড্রাগের মাত্রা বাড়াতে হয়। এভাবে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, ড্রাগ ব্যবহার না করলে শরীরে প্রত্যাখ্যানজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[৫]

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির বিস্তার আশংকার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ, যাদের সাথে সরাসরি ৬/৭ কোটি লোক সংশ্লিষ্ট এবং সমান সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রস্ত।[৬] কারণ দেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়ন্ত্র নিধিরাম।[৭] কেন্দ্রীয় কারাগারে সরবরাহ হচ্ছে মাদক।[৮] সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবলীলায় আসছে মাদকদ্রব।[৯] মাদক দ্রব্য এমনিতেই ক্ষতিকর, তারউপর জীবনঘাতি বিষ দিয়ে তৈরি নকল মাদক বিক্রি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে।[১০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ পাবলিক এবং বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিণত হয়েছে মাদক ব্যবসা ও ব্যবহারের অভয়ারণ্যে।[১১] দেশের অধিকাংশ এলাকায় মাদক তার সর্বনাশা থাবা বিস্তার করেছে।[১২]

বাংলাদেশে সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর মাদকাসক্তি রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ক্লাব "ঢাকা ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫শ। এদের মধ্যে সাড়ে ৪শ সদস্য বৈধ পারমিটধারী।[১]..... বছরে ঢাকা ক্লাবে গড়ে বিয়ার বিক্রি হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ ক্যান।[২] এ ছাড়া অন্যান্য দামি ব্রান্ডের মাদক কী পরিমাণ বিক্রি হয় তার তো কোনো হিসাবই নেই।

---

[১] Drug addiction is the habitual use of certain narcotics that leads in the time to mental and moral deterioration, as well as to dexterous to social effects. - WHO Expert Committee on Drug Dependence, World Health Organization Technical Report Series, No 407, Report, Geneva, 1969

[২] এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ.১

[৩] সুকুমার সাহা, মাদকদ্রব্য, সমাজ ও আইন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১, পৃ.২

[৪] আব্দুল মতীন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, মাদল প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ.৪

[৫] আব্দুল হাকিম সরকার ও মোঃ ফারুক হোসাইন, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা ঃ সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৬৫ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ.২০৬-২০৭

[৬] প্রথম আলো, ২৭ জুন ২০০৯, পৃ.১০

[৭] প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০০৯, পৃ.১-২

[৮] ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঃ ৫০টি ইয়াবা বড়িসহ কারাকর্মী গ্রেপ্তার, প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১১

[৯] টেকনাফে ৯৮৮টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, ইত্তেফাক, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.৭; মাগুরা হয়ে মাদক যাচ্ছে সারা দেশে, প্রথম আলো, ৬ জুলাই ২০০৯, পৃ.৫

[১০] ইত্তেফাক, ৫ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১৫

[১১] ঢাবি ক্যাম্পাসে রমরমা মাদক সেবন ও ব্যবসা, ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৩; কৌটা কৌটা ফেনসিডিল শিশুর মুখে, প্রথম আলো, ৬ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.৫

[১২] না.গঞ্জ শহরে মাদকের ভয়াবহ বিস্তার, অভিভাবকদের উদ্বেগ, প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.৪; মাদকের বিস্তারে উদ্বিগ্ন সুনামগঞ্জ শহরবাসী, প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০০৯, পৃ.৫; ফেনসিডিলের সদর দরোজা যশোর, প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অভিজাত এলাকাগুলোতে বেশ কিছু সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত বার রয়েছে। আছে ৩ তারকা থেকে ৫ তারকা মান সম্পন্ন অনেকগুলো আবাসিক হোটেল, যেখানে মদ পানের সরকারি স্বীকৃতি রয়েছে। ক্লাব, বার ও হোটেলগুলোয় কেবল একটি মাসের খদ্দের তালিকা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, কারা সেখানে যাচ্ছেন, কী পরিমাণে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের ২৫–৩০ বছর বয়সের ছেলে–মেয়েরাই বেশি মাদকাসক্ত। এ বয়সী তরুণেরাই মোট জনসংখ্যার ৩০% ভাগ। আবার এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছেলে–মেয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। এদের মধ্যেই প্রায় ৭০ শতাংশ মাদকাসক্ত বলে মনে করা হয়। এ দেশের যুব সমাজ নানাবিধ আর্থ–মনো–সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। এদেশের শহুরে যুবশ্রেণীর মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। তবে গ্রামে–গঞ্জেও নেশা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, যশোর, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সাইবান্ধা, বগুড়া ও খুলনা শহরের তরুণদের মাঝে ব্যাপকহারে নেশা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ঢাকা শহরেই লক্ষাধিক মাদকাসক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[৩] কয়েক বছর আগের এক পরিসংখ্যানে শুধু ঢাকার মোহাম্মদপুরেই ২২ হাজার মাদকাসক্ত রয়েছে বলে 'মুক্তি' নামের একটি বেসরকারি ক্লিনিক উল্লেখ করে।[৪] অন্য এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১২হাজার লোক হেরোইনে আসক্ত। কয়েক বছর আগের তথ্যে দেশে ৬০ হাজার লাইসেন্স প্রাপ্ত মদ্যপায়ীর মধ্যে ৪০ হাজার তরুণ বয়সী বলে জানা যায় আবার প্রতি হাজার মদ্যপায়ীর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০ জনের লাইসেন্স রয়েছে।[৫] অন্য এক তথ্যে জানা যায়, প্রতি ২৪৪৩ জন মদ্যপায়ীর মধ্যে প্রায় ২৮৫ জন বা ১১.৬৭% ছাত্র।[৬]

সম্প্রতি আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাদক আগ্রাসন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সে পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাদকসেবীদের শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ শিক্ষিত। দেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাদকসেবী রয়েছে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্প্রতি ঢাকা শহরে ৫০০ জন মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীর উপর সমীক্ষা চালিয়েছে। তাতে দেখা যায়–

১। ১৯ থেকে ২৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যেই মাদকাসক্তি বেশি;

২। বিবাহিতদের থেকে অবিবাহিতদের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রবণতা বেশি;

৩। ছাত্রদের মধ্যে মাদক ব্যবহারের প্রবণতা অকল্পনীয়ভাবে বেশি;

৪। স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবনের আগ্রহ বেশি এবং

৫। অরাজনৈতিক শিক্ষার্থীদের তুলনায় রাজনৈতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদক ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।[৭]

মাদকাসক্তির ক্ষতি

"মা গুণ্ডা ভাড়া করে খুন করিয়েছেন তাঁর মাদকাসক্ত সন্তানকে, এই রাজধানী ঢাকায়! স্কুল পড়ুয়া মাদকাসক্ত সন্তানকে মা–বাবা আটকে রেখেছেন ঘরে। নিজের পেটে জানালার ভাঙা কাচ ঢুকিয়ে দিয়ে বালক মারা গেছে মায়ের চোখের সামনে। এ দেশে প্রতিবছর প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকার মাদকের ব্যবসা হয়। মাদকের এই পুরো টাকা চলে যায় দেশের বাইরে। আর মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ ধরলে এই ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়। আইনশৃঙ্খলার এক বড় শত্রু এই মাদক। বড় মাদক পাচারকারীরা গড়ে তোলে বড় বড় অপরাধচক্র, যার সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক অপরাধীরা আর ব্যক্তি মাদকাসক্ত প্রতিদিন চুরি, ছিনতাই ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থেকে জনজীবন দুর্বিষহ করে তোলে। সব মিলিয়ে মাদকের চেয়ে বড়

---

[১] পারমিটধারী বলতে মাদক দ্রব্য সেবনের জন্য সরকারিভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

[২] দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.২

[৩] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধান, বাংলা একাডেমী ১৯৯৩, পৃ.২৬৬

[৪] সাঈদা গাফফার খানেজ ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের মাদকাসক্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৮১, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ.১০০

[৫] জনকণ্ঠ, ২২ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ.৪

[৬] মোঃ রেজাউল ইসলাম, বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে মাদকাসক্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬৮, অক্টোবর ২০০০, পৃ.১৭৮

[৭] সুভাষ সিংহ রায়, সর্বনাশা ড্রাগ : এক কাল মাকড়সার জাল, স্মরণিকা ২০০০, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০

Dhaka University Institutional Repository

দেশশক্র তাহলে কে আছে?[১] বস্তুত মাদকাসক্তির ক্ষতি অকল্পনীয়। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, নৈতিক, জাতীয়, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাদক অভাবনীয় ক্ষতির জনক। বিভিন্নভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়।

দৈহিক ক্ষতি: মাদকাসক্তির ফলে হজমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। খাবারে অরুচি হয়। দেহে অপুষ্টি বাসা বাধে। স্থায়ী কাশি ও কফ সৃষ্টি হয়। মদ্যপ ব্যক্তি মারাত্মক যক্ষায় আক্রান্ত হয়। তার লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। কিছু কিছু মাদকদ্রব্য তাৎক্ষণিক মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইথানল পানে মাদকাসক্তদের মৃত্যুর ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সাহেবের চর গ্রামে আরিফ (১৬) ও মাহফুজ (১৭) নামের দুই কিশোর মদপানে মারা গেছে। অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আরও ৮জন।[২]

হেরোইন আসক্তরা শারীরিকভাবে শক্তি ও উদ্যম হারিয়ে ফেলে। স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মহিলারা হেরোইন গ্রহণ করলে বিকৃত মস্তিষ্ক সন্তান জন্ম দেয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।[৩] শরীরে হেরোইনের কার্যকারিতা কমতে আরম্ভ করলে শুরু হয় প্রত্যাহারজনিত অসুস্থতা যা কমাতে প্রয়োজন আবার হেরোইন নেয়া। প্রত্যাহারণের তীব্রতা এতই অসহ্য যে, যন্ত্রণা উপশমের জন্য হেরোইন না পেলে মাদকাসক্ত আত্মহত্যা করে বসে।[৪]

আর্থিক কুফল: অধিকাংশ মাদক দ্রব্যই দামি। সাধারণ একটি গাঁজা ভরা সিগারেট বিক্রি হয় ১০টাকা। সর্দিতে ব্যবহার্য ৩০-৪০ টাকা দামের সিরাপ যখন মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন দাম বেড়ে যায় বহুগুণ। বাংলাদেশে ভারতে প্রস্তুত সর্দির সিরাপ ফেন্সিডিল বিক্রি হয় ১৫০-২০০ টাকায়। এক কেজি হেরোইনের দাম কোটি টাকা। এভাবে প্রতিটি মাদক দ্রব্য এবং মাদক হিসেবে ব্যবহৃত ঔষধের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে ব্যক্তি তার সকল বিনিয়োগ মাদকদ্রব্য সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ফলে তার পরিবার, দেশ এবং সে নিজে এর সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি: মাদকাসক্তি সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। গভীর রাতে মদপান করে এলোপাতাড়ি গুলি করার অভিযোগে সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার তালুকদার সারোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়েছে।[৫] মাদকব্যবসায় অনেক ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সব সন্ত্রাসী চক্র গড়ে তোলে। এদের আন্তঃকলহ ও বাজার দখলের চেষ্টায় অনেককেই চরম মূল্য দিতে হয়। এরই ধারাবাহিকতায় যেমন 'অপরাধজগতের নিয়ন্ত্রক হাসান ভাইসহ নিহত' হয়েছে।[৬]

ঘৃণা লাভ করে: মাদকাসক্তি ব্যক্তিকে সবার ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। তার সাথে বন্ধুত্ব করে না। বিয়ে ঠিক হওয়ার পরও কেবল ছেলে মদপান করে এই খবর জানার পর কন্যা ও কন্যার বাবা বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন এমন খবর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।[৭] যার মধ্য দিয়ে মাদকাসক্তের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঘৃণাই প্রকাশ পায়।

সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি: মাদক গ্রহণে কেবল মাদকসেবীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিই হয় না, এর ব্যয় নির্বাহের তাগিদ ও এর ফলে সৃষ্ট মনোবিকৃতির জন্য তাদের দ্বারা সমাজে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়।[৮]

নৈতিক স্খলন: শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচার মাদকাসক্তের কাছে অর্থহীন। অধিকাংশ ব্যভিচার ও নরহত্যার পেছনে মাদকদ্রব্যের ভূমিকা থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্যে বলেছেন, 'মদ সকল অপকর্ম ও অশ্লীলতার মূল।'[৯]

---

[১] প্রথম আলো, ২৭ জুন ২০০৯, পৃ.১০

[২] প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৫

[৩] মুহাম্মদ সামাদ, পূর্বোক্ত, ১৪৯

[৪] মীর আফরোজ জামান, মাদকের ভয়াল ধ্বংসের মুখে যুব সমাজ, সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা, ২১ সংখ্যা এপ্রিল ২০০০, পৃ.৩০

[৫] সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৬] প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৭] সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ.৭

[৮] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৭

[৯] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আশরিবা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি

ইসলামে সকল প্রকার মদপান করা ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা হারাম। মুসলিমদের কারো মধ্যে এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ইসলামের মদ্যপান সংক্রান্ত নিষেধবাণী একদিনে অবতীর্ণ হয়নি। এটা পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়: "লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, মদ ও জুয়ার মধ্যে ভয়ানক পাপ আছে এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। তবে মদ ও জুয়ার উপকারের চেয়ে এগুলোর পাপ অধিকতর ভয়ানক।[১]

এরপর সালাত আদায়কালে মদপান করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়, "হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতোক্ষণ না তোমরা যা বলো, তা বুঝতে পার।[২]

এ ঘোষণাসমূহের ধারাবাহিকতায় মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধতার সর্বশেষ ঘোষণা প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর নিঃসন্দেহে শয়তানের কাজ। তাই তোমরা তা থেকে দূরে থাক। যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান তো মদও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দিতে চায়। তারপরও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত হবে না?[৩]

হাদীসে মদপানকে মূর্তিপূজার সমতুল্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, মহানবী (সা) বলেছেন, অভ্যাসরত মদ্যপায়ী যদি মারা যায়, সে আল্লাহর সাথে সেই ব্যক্তির মত সাক্ষাৎ করবে যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে।[৪]

ইসলাম শুধু যে মদপান হারাম করেছে তাই নয়। মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসা তথা মদকে কেন্দ্রে করে যা কিছু তার সবই হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহ লানত করেছেন মদের উপর, মদপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, যে উৎপাদন করে তার উপর, যে বহন করে তার উপর এবং যার জন্য তা বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর।[৫]

একবার নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, মদ বিক্রির অর্থ দিয়ে কিছু করা যাবে কি-না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ইহুদিরা তাদের গরু-ছাগলের চর্বি হারাম হওয়ার পরও তা সংগ্রহ করে বিক্রি করতো। এই করে তারা আল্লাহর লানত কুড়ায়। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ মদ ও এর মূল্য হারাম করে দিয়েছেন।[৬]

মাদক ব্যবহার ও ব্যবসায়ের শাস্তি

সকল ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি বেত্রাঘাত।[৭] তবে বেত্রাঘাতের সংখ্যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হলো ৮০টি বেত্রাঘাত।[৮] তাঁদের দলীল হলো সাহাবা কিরামের ইজমা। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে খেজুরের ২টি ডালা দিয়ে ৪০টি আঘাত দিতেন। আবূ বকর (রা)ও তাই করেছেন। উমর (রা) মদ্যপায়ীর শাস্তি নির্ধারণের জন্য সাহাবীগণের পরামর্শ চাইলেন। তখন আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) বললেন, "তার শাস্তি হালকাতম হদ্দ, ৮০টি বেত্রাঘাতই নির্ধারণ করুন। তখন

---

[১] يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ আল-কুর'আন, ২: ২১৯

[২] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ আল-কুর'আন, ৪: ৪৩

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ আল-কুর'আন, ৫: ৯০-৯১

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আশরিবা

[৫] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আল-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আশরিবা

[৬] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুয যাকাত

[৭] ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৭

[৮] ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৭; আল-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ২৪, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০; আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, খণ্ড ৫, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৩, আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খণ্ড ৩, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪২-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

উমর (রা) এ দণ্ডই কার্যকর করতে নির্দেশ দিলেন এবং সিরিয়ায় খালিদ ও আবূ উবাদা (রা)কে লিখে এ নির্দেশ দান করলেন।[১] অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রা) পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের মত হলো আমরা তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবো। কেননা যখন সে মদ সেবন করে তখন মাতাল হয়ে যায়। আর যখন মাতাল হয় তখন অপলাপ করে। আর যখন যে অপলাপ করে তখন সে অপবাদ দেয়। আর অপবাদদানকারীর শাস্তি হলো ৮০টি বেত্রাঘাত।[২] খোলাফায়ে রাশিদার আমলে ৮০টি বেত্রাঘাতের বিপক্ষে কারো কোনো মতবাদ পাওয়া যায়নি। এ থেকে জানা যায় যে, ৮০টি বেত্রাঘাতের উপর সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শাফিঈ ও হাম্বলীগণের মতে, মদ্যপানের নির্ধারিত শাস্তি হলো ৪০টি বেত্রাঘাত। তবে বিচারকের ইখতিয়ার রয়েছে, অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে ৮০টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করতে পারবেন। তবে ৪০এর অতিরিক্ত বেত্রাঘাতসমূহ হদ নয়, তা'যীরের অন্তর্ভূক্ত। তদুপরি কাপড়, খেজুরের ডাল ও জুতা দ্বারাও যদি মারা হয়, তাতে সেটাও শুদ্ধ হবে।[৩]

তাদের দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) ৪০টি বেত্রাঘাত করেছেন এবং আবূ বকর (রা)ও তাই কার্যকর করেছেন। হযরত ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) এর খিলাফতের শুরুতে আমরা মদ্যপায়ীকে ধরে আনতাম। আমরা তাকে আমাদের হাত দিয়ে, আমাদের জুতা দিয়ে ও আমাদের চাদর দিয়ে মারতাম। হযরত উমর (রা)এর খিলাফতের শেষ দিকেও ৪০টি বেত্রাঘাতই করা হতো। তবে যদি সীমালংঘন বেড়ে যেতো তাহলে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হতো।[৪]

এ থেকে জানা যায়, হযরত উমর (রা) সাধারণত ৪০টি বেত্রাঘাত করতেন। তবে অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখনো ৮০টি বেত্রাঘাতও করতেন। হযরত উসমান (রা) এর খিলাফতকালে জনৈক ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে উকবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমন করতে দেখেছে। হযরত উসমান (রা) আলী (রা)কে নির্দেশ দিলেন, তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। তাকে ৪০টি বেত্রাঘাত করার পর আলী (রা) প্রহারকারীকে থামার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ৪০টি বেত্রাঘাত করেছেন, আবূ বকর (রা)ও ৪০টি বেত্রাঘাতই করতেন। হযরত উমর (রা) ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন। এর সবগুলোই সঠিক সুন্নাত এবং এটাই আমার পছন্দনীয়।[৫]

হযরত মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "মদ্যপানকারীদেরকে প্রথম থেকে তৃতীয়বার পর্যন্ত শুধু বেত্রাঘাতই করবে। চতুর্থবার পান করলে তাদেরকে হত্যা করো।[৬]

হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা এবং খোলাফায়ে রাশিদার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মদপান শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মদপানের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারে এ শাস্তি কম-বেশি হতে পারে তবে তা ৪০টি বেত্রাঘাতের কম হবে না এবং ৮০টি বেত্রাঘাতের বেশি হবে না। চতুর্থবার মদপান করলে হত্যার যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা নিতান্তই ভয় দেখানোর জন্য ও

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হাদীস নং ১৭৩১০

[২] আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, খণ্ড ৫, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৩; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খণ্ড ৩, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৩

[৩] ইবনে কুদামা, আল-মুগনী খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৭; মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, খণ্ড ৮, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৩; যাকারিয়া আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খণ্ড ৪, দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত, পৃ.১৬০; শামসুদ্দীন আল-মাকদিসী ইবনে মুফলিহ, আল-ফুরু, খণ্ড ৬, আলমুল কুতুব, কায়রো, পৃ.১০১; আলাউদ্দীন আল-মারদাভী, আল-ইনসাফ ফী মাআরিফাতির রাজিহ, খণ্ড ১০, দাফ ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, পৃ.২২৯

[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৫] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৬] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আশরিবা; আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ, ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, এই আইনটি প্রথম দিকে কার্যকর ছিল। পরে এটিকে রহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সতর্ক করার জন্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বা সাহাবী যুগে এ কারণে কাউকে হত্যা করা হয়নি। বরং এমন বর্ণনাই রয়েছে, মদপানে অভ্যস্ত নয় এবং শারীরিকভাবে ক্ষীণ এমন ব্যক্তিকে উমর (রা) ৪০টি বেত্রাঘাত করতেন। উসমান (রা) অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখনো ৪০ আর কখনো ৮০টি বেত্রাঘাত করতেন।

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের মত মাদক দ্রব্য উৎপাদন, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন, উপঢৌকন হিসেবে প্রদান এবং আমদানী-রপ্তানিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে তা হদ নয়, তা'যীর। ইসলামি রাষ্ট্রের আদালত অপরাধের মাত্রা ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে এ অপরাধের জন্য যে কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে পারবে।[১]

উল্লেখ্য কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোনোভাবে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় কোনো অপরাধ করলে সে শাস্তিযোগ্য হবে, চাই কাজটি সে ইচ্ছায় করুক বা ভুলবশত করুক। কারণ সে নিজেই তার বিবেক নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছে যা গ্রহণ স্বয়ং একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। অতএব, সতর্ক করার জন্য তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। এমন অবস্থায় তাকে রেহাই দেয়া হলে দুষ্কৃতিকারীরা মদ্যপান করে অপরাধ কর্ম করতে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। কোনোভাবেই তাদেরকে দমন করা যাবে না।[২]

ইসলামের বিধানের আলোকে বাংলাদেশের মাদকাসক্তি দূর করার উপায়

বাংলাদেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মদ ও মাদকাসক্তির প্রতিপক্ষ। পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, শ্রীপুরে মদ তৈরির সরঞ্জাম গুঁড়িয়ে দিয়েছে গ্রামবাসী।[৩] কেবল শ্রীপুর নয় বরং সাধারণভাবে বাংলাদেশের সকল মানুষই মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তিকে অপছন্দ করেন। এ প্রেক্ষাপটে মাদক ও মাদকাসক্তি সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধান তা যদি সঠিকভাবে তাদের নিকট তুলে ধরা যায়, তাহলে তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করবেন। যারা মাদকাসক্ত বা এর ব্যবসায়ের সাথে জড়িত, তারাও তা থেকে বিরত থাকবেন। এ জন্য বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো বহাল রেখে রাষ্ট্রীয়ভাবে মাদকাসক্তি নিরোধের জন্য মাদক দ্রব্য উৎপাদন, বিপণন, ভোগ ও ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা যায়। এ ক্ষেত্রে আইন সবার জন্য সমান হতে হবে। দরিদ্র মানুষ যারা পাঁচ তারকা হোটেলে বা অভিজাত রেস্তরা-বারে যেয়ে মাদক সেবন করতে পারে না কেবল তাদের জন্য মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করলে এ কর্মসূচী কোনোক্রমেই সফল হবে না। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সফলের জন্য সকল স্থানে সাধারণভাবে মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হতে হবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মদ ব্যবসা ও ব্যবহারের লাইসেন্স দেয়া বন্ধ করতে হবে। কোনো ধর্মই যেহেতু মদ পান সমর্থন করে না এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সাধারণভাবেই যেহেতু মাদকাসক্তিকে ক্ষতিকর ঘোষণা করে সে কারণে দেশের অন্য ধর্ম ও মতের লোকদের জন্যও রাষ্ট্রীয়ভাবে মাদক ব্যবসায় ও ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা যায়। ইসলামের বিধান অনুসারে মাদক ব্যবহার ও ভোগের শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশ মাদকাসক্তি মুক্তির পথে সার্থক যাত্রা করতে সক্ষম হবে।[৪]

অবিচার

বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয়জনিত সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অবিচার শীর্ষস্থানীয়। ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর যে আচরণ প্রাপ্য, যে অধিকার প্রাপ্য সে আচরণ ও অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করাই হলো অবিচার। অপরাধীকে মুক্তি দেয়া, নিরপরাধকে

---

[১] আল-লায়াবসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ১৩, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৭; বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, খণ্ড ১, ইফাবা ঢাকা ২০০৪ পৃ.৩৩১

[২] ইমাম আওদাহ, আত-তাশরীউল জিনা'ঈ, খণ্ড ১, কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত, পৃ.৫৮৩

[৩] প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৫

[৪] ড. জাকারিয়া আকন্দ, মাদকাসক্তি, ইসলাম ও বাংলাদেশ : পর্যালোচনা, আইআরলি, ঢাকা ২০০৬, পৃ.৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধী সাব্যস্ত করা, অপরাধীর সামাজিক মর্যাদা উচ্চ হওয়ার কারণে বা আর্থিক সমৃদ্ধির কারণে তার সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করা আর অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ করা অবিচারের দৃষ্টান্ত। যে যেমন ফলাফলের যোগ্য, যেমন চাকুরি ও আচরণের যোগ্য তাকে তারচেয়ে কম দেয়া বা বেশি দেয়া দুটোই অবিচার।

বাংলাদেশে অবিচারের প্রকৃতি

বাংলাদেশে নাগরিক জীবনযাত্রার সকল স্তর ও পর্যায়ে অবিচার হয়ে থাকে। এখানে ক্ষমতাসীনগণ সবসময়ই বিচারের উর্ধ্বে থাকেন। তাদের বিরুদ্ধে অতীতে কোনো মামলা হয়ে থাকলেও তা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে প্রত্যাহার করা হয়।[১] রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে মওকুফ করে দেয়া হয় অতীতে প্রদত্ত বিচারিক দণ্ড।[২] রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রশাসনে পদোন্নতি দেয়ার মত অবিচার বাংলাদেশে হর-হামেশা লক্ষ্য করা যায়।[৩] দেশে বিচার বহির্ভূত রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড অবিচারের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। সম্প্রতি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও কর্মজীবি নারী জনস্বার্থে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে রিট আবেদন করায় বিষয়টি নতুন করে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে। রিট আবেদনে বলা হয়, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর হাতে ২০০৪ সালে ১১জন, ২০০৫ সালে ৬১জন, ২০০৬ সালে ৫জন, ২০০৭ সালে ২১জন, ২০০৮ সালে ৪০জন ও ২০০৯ সালে এ পর্যন্ত ৭জন নিহত হয়েছে। এছাড়া পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় ২০০৪ সালে ৪৩জন, ২০০৫ সালে ১৫৫জন, ২০০৬ সালে ৬৭জন, ২০০৭ সালে ১২জন, ২০০৮ সালের ২০জন এবং ২০০৯ সালে নিহতদের কোনো তালিকা পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে র‍্যাবের হাতে ২০০৪ সালের ৬০জন, ২০০৫ সালে ১০৬জন, ২০০৬ সালে ১৭৪জন, ২০০৭ সালে ৯৫জন এবং ২০০৯ সালে এ পর্যন্ত ১১জনকে হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা জরুরি বলে রিটে বলা হয়।[৪] কিন্তু রিটের মাসেই অবিচারের ধারা অব্যাহত রেখে সংঘটিত হয় ২৮টি বিচার বহির্ভূত ও ১১টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।[৫] অযোগ্য লোকদের উচ্চপদে নিয়োগ দেয়ার অবিচার বাংলাদেশে সবসময়ই হয়ে থাকে।[৬] তবে এদেশের নাগরিকগণ সবচেয়ে বড় অবিচারের মুখোমুখি হন বিভিন্ন সময়ে সরকারের গণ-গ্রেফতার কর্মসূচির সময়। বিনা অপরাধে তারা গ্রেফতার হয়ে যান এবং আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর হাতে অকারণেই নিগৃহীত হয়ে থাকেন।[৭]

বাংলাদেশে অবিচার এমনই প্রবল যে স্বয়ং বিচারকগণ পর্যন্ত এর অসহায় শিকার। সম্প্রতি সচিবালয়ে বিক্ষোভের কারণে দু জন জেলা জজকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার ঘটনা এর একটি সাধারণ উদাহরণ মাত্র।[৮]

বস্তুত বাংলাদেশে বর্তমানে প্রশাসনে, সমাজে, পরিবারে, রাষ্ট্রে, ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে অবিচারের একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান। সর্বত্র সুবিচারের বড় অভাব। এ কারণে দেশের বিচার প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নেই। চাকুরিদাতা সংস্থার কাছে ব্যক্তির মেধা ও যোগ্যতা মূল্যহীন। অন্যায়কারী ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান হলে শাস্তি না হওয়াই এখন রীতি।

---

[১] শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা ১২ মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যাহারের তালিকায় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের কেউ নেই, নয়া দিগন্ত, ১১ জুন ২০০৯, পৃ.১ ও ১১

[২] মিজানুর রহমান খান, শাহাদাৎ আকন্দের সাজা মওকুফ করেছেন রাষ্ট্রপতি, প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.১ ও ১৯; দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা ঃ সরকারি সিদ্ধান্ত আইনের শাসনের পরিপন্থী, সম্পাদকীয়, প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০০৯, পৃ.১২

[৩] শ্যামল সরকার, প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোয় বিশৃঙ্খলা ঃ ৪৯৪ জনের পদোন্নতি, বঞ্চিত ৫২৬জন, প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১ ও ১৯; খোকন বড়ুয়া, নয়া দিগন্ত, ১৬ জুন ২০০৯, পৃ.১৬; শ্যামল সরকার, প্রশাসনে এবার পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব! ৬৯৫ কর্মকর্তা জ্যেষ্ঠতা হারিয়েছেন, প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৪] বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে রিট আবেদন, প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০০৯, পৃ.১৯

[৫] এক মাসে ২৮ বিচারবহির্ভূত ও ১১ রাজনৈতিক হত্যা, নয়া দিগন্ত, ২ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.২

[৬] ফখরুল ইসলাম, দলীয় নেতা ও সমর্থকদের পুরস্কৃত করে চার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন, প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৭] আবার গণগ্রেপ্তার, ২৪ ঘন্টায় ৪০০ঃ অভিযোগ না পেয়ে 'সন্দেহজনক' বলে জেলে প্রেরণ, প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৮] সচিবালয়ে বিক্ষোভ ঃ দুই জেলা জজকে চাকরি থেকে অবসর প্রদান, প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে অবিচারের ধারণা ও বিধান এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার মূল্যায়ন ও প্রয়োগ

মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ও ক্ষেত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবিচার বিষয়ক ইসলামি ধারণা ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন,

১। **ব্যক্তিগত অবিচার:** আত্মঅবিচার সবচেয়ে বড় অবিচার। ব্যক্তি শক্তি ও সম্ভাবনার অপব্যবহারের কারণে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। সে শিক্ষার্থী হলে লেখাপড়ায় ভালো করতে পারে না, চাকুরিজীবি হলে উর্ধ্বতন মহলের কাছে ধিক্কৃত হয়; পদোন্নতি হয় না এমনকি চাকুরিও চলে যেতে পারে, ব্যবসায়ী হলে তার ব্যবসায় অলাভজনক হয়, কৃষক হলে তার উৎপাদন ব্যাহত হয়। এমনিভাবে ব্যক্তি যে পেশা বা স্তরের লোকই হোক না কেনো, সে যদি তার নিজের প্রতি অবিচার করে, নিজের শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার না করে বা ভুল পথে ব্যবহার করে তাহলে সে নিজে অন্তহীন অকল্যাণে নিপতিত হয়। চূড়ান্তভাবে নিজের প্রতি অবিচারকারী দুনিয়াতে ব্যর্থতার পাশাপাশি আখিরাতেও ভয়ানক ব্যর্থতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে কেউ সৎপথে চলে, নিশ্চয় সে সৎপথে চলে তার নিজের জন্যে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তার ভ্রষ্টতা নিশ্চিতভাবে তারই উপর এবং কেউ বোঝা বহন করবে না, অপর কারো বোঝা।[১]

বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে অবিচার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। প্রতিটি মানুষ নিজের দায়িত্বে অবহেলা করাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করে এবং এ জন্য অন্যকে দোষ দিতে পারাকে দক্ষতা প্রমাণের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করে। অন্যকে ঠকানো, অন্যের ক্ষতি, অন্যের কুৎসা রটনা, অন্যের অকল্যাণ কামনা বাংলাদেশের মানুষের নৈতিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার যে ধারা ইসলাম চালু করেছে তা অনুসরণ করলে এ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

২। **পারিবারিক অবিচার:** বাংলাদেশে পারিবারিক ক্ষেত্রে অবিচার একটি ভয়ানক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না, স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে না, মাতাপিতা সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ করেন না, ফলে সন্তান মাতাপিতাকে যথাযথ সম্মান করে না, পরবর্তী জীবনে তাদের দায়িত্ব নেয় না, মাতাপিতার অশিক্ষার কারণে ভাইবোনদের পারস্পারিক সম্পর্ক সঠিক মাত্রায় সুগঠিত হয় না। এমনি বাস্তবতাতেই স্বামী স্ত্রীকে নির্যাতন করে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বা অবিশ্বাসের নানা ঘটনা ঘটায়, সন্তানের হাতে খুন হয় মা অথবা খুনী ভাড়া করে মা-বাবাকে খুনের আয়োজন করতে হয় প্রেমাস্পদ সন্তানকে, ভাইবোনের মধ্যে বিরাজ করে ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা আর শত্রুতা।

ইসলাম পারিবারিক ক্ষেত্রে যে সকল নীতি ও নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যের সীমা ঠিক করে দিয়েছে, অধিকারের যে ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে, ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে এগুলো স্ব স্ব পরিবারে চর্চা করে তাহলে পারিবারিক অবিচার দূর হয়ে যাবে। তখন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুদৃঢ় আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হবে।

৩। **সামাজিক অবিচার:** বাংলাদেশ সামাজিক অবিচারের এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ হয়ে পড়েছে। আত্মীয়ের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, প্রতিবেশীর অধিকার ক্ষুন্ন করা হচ্ছে, সাম্য-মৈত্রী-ঐক্য-ভালোবাসার বন্ধন ঠুনকো হয়ে মানবসভ্যতা ও অগ্রগতিকে উপহাস করছে। ভালোবাসার পরিবর্তে হিংসা, সাম্যের পরিবর্তে শ্রেণী বৈষম্য, ঐক্যের পরিবর্তে দলাদলি, মৈত্রীর পরিবর্তে সন্ত্রাস দেশের সমাজকে অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সামাজিক জীবনে সুবিচার কায়েম করতে হলে এবং অবিচার পুরোপুরি নির্মূল করতে হলে প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে সাথে সমাজের অসহায়-দুস্থ লোকদের সাথেও সদাচার করতে হবে। তাদের পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের একটি লোককেও অনাদরে, অবহেলায়, রোগে-শোকে ভুগে ধুকে ধুকে মরতে দেয়া হবে না। মানুষ মানবিক মর্যাদায় উদ্ভাসিত হওয়ার সুযোগ পাবে। যোগ্যতা বিকাশের পথে কোনো অন্তরায় কাজ করবে না। তাহলেই সামাজিক অবিচার দূর হবে। সমাজ উদ্ভাসিত হবে সুবিচারের শান্তিময় আলোকমালায়।

৪। **জাতীয় অবিচার:** বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে অকল্পনীয় অবিচার বিদ্যমান রয়েছে। দেশের মানুষের মধ্যে কোনো ঐক্য ও সংহতি নেই। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় বিশেষভাবে সক্রিয় এবং সচেতন। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি জাতির উন্নতির প্রধান এবং প্রথম মাধ্যম বলে আল্লাহ তা'আলা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। মুমিনদের

---

[১] আল-কুর'আন, ১৭:১৫ مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এ আদেশ অনুসারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা করায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর দীন ধারণ করো এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।[১] তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরেও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করেছে।[২]

ব্যক্তির দায়িত্বহীনতা, ঔদাসীন্য, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, বিশৃঙ্খলা তৈরির বিরুদ্ধে ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তার ফল কেবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরাই ভোগ করবে না। তথাকথিত শান্তিপ্রিয় লোক, যারা বিশৃঙ্খলা তৈরিতে বাধা দেয়নি, তারাও এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাক যা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী তাদের উপরই আপতিত হবে না।[৩] এ কারণেই জাতীয় জীবনকে সংহত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ করার জন্য বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। বলেছেন, "তোমরা ফিৎনা-ফাসাদসৃষ্টিকারীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতোক্ষণ না ফিতনা পুরোপুরি দূর হয় এবং দীন কেবল আল্লাহর জন্য হয়। এরপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে যালিমদের ছাড়া কারো উপর আক্রমণ করা যাবে না।[৪]

বাংলাদেশ ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ। এ দেশের মুসলিমদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য, সংহতি, সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও পারস্পারিক সুরক্ষার ধারণা বিষয়ে কুর'আন-হাদীসের এ শিক্ষাসমূহ যদি যথাযথ আবেগ ও প্রকৃত প্রকৃতি সহ বিস্তার করা সম্ভব হয় তাহলে জাতীয় অবিচারের এ ভয়ঙ্কর সমস্যা থেকে দেশ অবশ্যই মুক্ত হবে।

৬। **বিচারিক অবিচার:** বাংলাদেশে বিচারিক আদালতের অবিচার জাতীয় ঐক্য, উন্নতি, শৃঙ্খলা ও পারস্পারিক বিশ্বাসের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের আদালত বিত্তশালী ও ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সবসময়ই সোচ্চার। অন্যদিকে গরীব মানুষ হাজতে বন্দী থাকে বছরের পর বছর, তার মামলাই বিচারের জন্য আদালতে উত্থাপিত হয় না। অনেক বছর পর যখন উত্থাপিত হয় তখন অনেকেই বেকসুর খালাস পান। কিন্তু তার আগেই তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় অনেকগুলো মূল্যবান বছর। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, বিনা অপরাধে বিনা বিচারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দীর্ঘ ২৭ বছর বন্দী ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ![৫]

ইসলাম প্রথমেই ঘোষণা করে, অপরাধ প্রমাণের আগে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলা করেন, "ন্যায়বিচার ও সঙ্গত কারণ ছাড়া ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না।[৬]

আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করার বিভিন্ন আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় অথবা তোমাদের মাতাপিতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক আল্লাহ তাদের উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। তাই তোমরা ন্যায়বিচারে তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে জেনে রেখ, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সকল খবর জানেন।[৭]

---

[১] وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ আল-কুর'আন, ৩: ১০৩

[২] وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল-কুর'আন, ৩: ১০৫

[৩] وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً আল-কুর'আন, ৮: ২৫

[৪] وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ আল-কুর'আন, ২: ১৯৩

[৫] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর ২০০৪, পৃ.১

[৬] لا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإسلام بِغَيْرِ الْعَدْلِ আবূ আব্দুল্লাহ মালিক ইবন আনাস, মুয়াত্তা, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, কিতাবুল জিহাদ

[৭] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا আল-কুর'আন, ৪: ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এ সকল নির্দেশনা মেনে বাংলাদেশের বিচারপতি ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা যদি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে আশা করা যায় যে, এ দেশের বিচারিক ক্ষেত্রে সত্যিকারের ন্যায়বিচার ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭। **আর্থিক অবিচার:** আর্থিক অবিচারের স্বর্গরাজ্য বাংলাদেশ। এখানে দ্বিধাপ্রশ্নে, নির্দ্বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবিচারকে গ্রহণ করা হয়।[১] বাংলাদেশে কোনো মসজিদে জুতা চুরি করে কোনো লোক ধরা পড়লে তাকে মেরে হাড়-মাংস এক করে ফেলা হয়। কোনো ছিনতাইকারী বা পকেটমার ধরা পড়লে তাকে গণধোলাই দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণধোলাইয়ে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। অথচ পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি প্রমুখ ব্যক্তিরা জনগণের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে; তা সত্ত্বেও তারা জনসমক্ষে অসম্মানিত হয় না বরং সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবেই চলাচল করে এবং রাষ্ট্রীয় ও সর্বজনীন অধিকার ভোগ করে।

বাংলাদেশকে আর্থিক অবিচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি-বিধান হতে পারে অব্যর্থ একমাত্র বিকল্প। একমাত্র ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করলেই উল্লিখিত সকল ধরনের অবিচার থেকে এ দেশের অর্থনীতি মুক্ত হতে পারে। কুর'আন-হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক অবিচার রোধে ইসলাম প্রথমই বিশ্ব মানবকে শিখিয়েছে, পৃথিবীর কোনো কিছুরই মূল মালিক সে নয়। এসব কিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। কুর'আন মজীদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "বলো, হে আল্লাহ! সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। যাকে খুশি তুমি মালিকানা দান করো।"[২] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার নিরঙ্কুশ মালিকানা আল্লাহর এবং প্রত্যাবর্তন তারই নিকট।"[৩]

আল্লাহর দেয়া এই সম্পদ মানুষ ভোগ করবে। কিন্তু সবসময় মনে রাখবে, এতে যেমন তার নিজের অধিকার আছে তেমনি আল্লাহর নির্ধারণ অনুসারে দরিদ্র মানুষের, নিঃস্ব ও অসহায় লোকদেরও অধিকার আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।"[৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, কল্যাণকর কাজ করে, সালাত কায়িম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্যে তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার।"[৫] তিনি অন্যত্র বলেছেন, "যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, যাকাতের কর্মচারী, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণমুক্তি, আল্লাহর পথ ও অভাবগ্রস্ত পথচারীদের জন্যে। এটা আল্লাহর বিধান।"[৬]

অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ করে তিনি আরো বলেন, "তোমরা অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তানতো তার রবের সাথে কুফরি করেছে।"[৭] এ সকল নিষিদ্ধ কাজের পাশাপাশি ইসলাম সকলের জন্য কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা ফরয করে দিয়েছে। নামায যেমন ফরয, ইসলামে কাজ করার ব্যাপারে তেমন ফরযিয়াতই আরোপ করা হয়েছে। কারো জন্য বসে থাকা বা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা ইসলাম সমর্থন করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যখন সালাত আদায় শেষ হয়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করো।"[৮]

---

[১] মালিহা আকন্দ, আমাদের নৈতিক দেউলিয়াত্ব, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ.১৩

[২] আল-কুর'আন, ৩: ২৬ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ

[৩] আল-কুর'আন, ৫: ১৮

[৪] আল-কুর'আন, ৫১: ১৯ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

[৫] কুর'আন, ২: ২৭৭ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

[৬] إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল-কুর'আন, ৯: ৬০

[৭] আল-কুর'আন, ১৭: ২৬-২৭ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

[৮] আল-কুর'আন, ৬২: ১০ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের নামে তথাকথিত একদল লোক দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখিরাত নিয়ে নেতে থাকার যে অর্থহীন আচরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকেও সঠিক মনে করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতে সফলতা অর্জনের নির্দেশনা দিয়েছেন। পাশাপাশি দুনিয়াকেও গুরুত্ব দিতে বলেছেন। বলা হয়েছে: "আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের সন্ধান করো, তবে তোমাদের দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না।[১]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবিচার দূর করার জন্য কুর'আন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনা অনুসরণ করা হলে দেশের দারিদ্র্য সমস্যার যেমন সমাধান হবে তেমনি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অকল্পনীয় বৈষম্যও দূর হবে। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে সকল অর্থনৈতিক অনাচার, যা একান্তভাবে এ দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

৮। রাজনৈতিক অবিচার: বাংলাদেশে রাজনৈতিক অবিচারের অভয়ারণ্য। এখানে দেশের চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়। ব্যক্তি স্বার্থে ক্ষমতার পালাবদলের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিথ্যাচার, পদলেহন, চাটুকারিতা, সন্ত্রাসী লালন, মিথ্যা অঙ্গীকার, জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর, হত্যাকাণ্ড, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি ইত্যাদি কাজকে অনিবার্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য করে থাকে। রাজনৈতিক গুরু বা আদর্শ হিসেবে এ দেশে একদল যাকে প্রায় পুজো করে অন্যদল তাকে নরাধম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য সকল পর্যায়ের চেষ্টা করে থাকে।

ইসলামি রাজনীতির প্রথম কথাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠান নয় বরং এ ক্ষমতার একক এবং একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে: "(হে রাসূলুল্লাহ স) আপনি বলুন, 'হে আল্লাহ! আপনি রাজত্ব, কর্তৃত্ব, মালিকানা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা মুলক দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা মুলক ছিনিয়ে নেন।[২]

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে, "বলুন (মুহাম্মদ স), হুকুমদানের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।[৩]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র যেন প্রতিষ্ঠিত না পারে সে কারণে ইসলাম পরামর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা চালুর নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (পরামর্শ শেষে) আপনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। যারা (আল্লাহর উপর) ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।[৪]

রাজনৈতিক দলাদলি ও অবাধ্যতার পরিবর্তে ইসলামে নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্যের ধারা বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহর বিধান অনুসারে) আদেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তাদের আনুগত্য করো। এরপর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট অর্পণ করো।[৫] এ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসনকাজ কোনো ব্যক্তির ইচ্ছায় রচিত আইনের মাধ্যমে হয় না বলে কারো নিপীড়িত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় না। আল্লাহ বলেন, "আর যারা আলাহ তা'আলার হুকুম অনুসারে শাসনকাজ পরিচালনা করে না, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো কাফির।[৬]

---

[১] وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا আল-কুর'আন, ২৮: ৭৭

[২] قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আল-কুর'আন, ৩: ২৬

[৩] يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ আল-কুর'আন, ৩: ১৫৪

[৪] وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ আল-কুর'আন, ৩: ১৫৯

[৫] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ আল-কুর'আন, ৪: ৫৯

[৬] وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ আল-কুর'আন, ৫: ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ কুর'আন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সম্পন্ন ফয়সালা মেনে নেয়াকে মুমিনের গুণ এবং না নেয়াকে মুমিন না হওয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, "না, না, আপনার রবের কসম, এই লোকেরা কখনোই ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ না তারা পারস্পরিক ফয়সালায় আপনাকে মেনে না নেবে এবং আপনি যে রায় দেবেন তা দ্বিধাদ্বিধায় মাথা পেতে না নেবে।[১]

যে কারণে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যোগ্যতম ব্যক্তি মূল্যায়িত হতে কোনো আত্মপ্রচারণা বা প্যানেলের প্রয়োজন হয় না। হয় না বলেই দলবাজি, পক্ষপাত, অন্যকে হেয় করে নিজেকে বড় দেখানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না। প্রত্যেকে সত্যকে অবলীলায় সত্য এবং মিথ্যাকে নির্ভয়ে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতে পারে। পাপী বা সন্ত্রাসীকে সম্মান করায় কোনো উপযোগিতা তৈরি হয় না। এর ফলে সমাজে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, দলবাজি, শত্রুতা, বিপক্ষকে ঘায়েল করার নাশকতামূলক নানা কর্ম ইত্যাদি ইসলামি রাজনীতিতে পুরোপুরি অনুপস্থিত থাকে। বস্তুত এ ধারা বিদ্যমান থাকলে বাংলাদেশ থেকে সহসাই রাজনৈতিক অবিচার নির্মূল হয়ে যাবে।

৯। ধর্মীয় অবিচার: বাংলাদেশে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্তহীন অবিচার বিদ্যমান। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এ দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন উপজাতীরা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব ধর্ম পালনের সুযোগ পেলেও ইসলামের ক্ষেত্রে সবসময়ই বৈরিতামূলক আচরণ দেখানো হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতিক ও বিনোদন ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়নি। একজন হিন্দু লোক ধুতি পড়লে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পড়লে, কপালে চন্দনের তিলক আঁকলে একইভাবে কোনো হিন্দু নারী মাথায় সিঁদুর পরলে, শরীরে অন্যান্য ধর্মীয় অনুসঙ্গ পরিধান করলে বাংলাদেশে তারা ধর্মভীরু হিসেবে ধন্যবাদ লাভ করে। কিন্তু ইসলামি পোশাক পরিহিতদের সুযোগমত স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার, আল-বদর হিসেবে দাঁড় করানো হয়। পর্দানশীল নারীকে নিয়ে উপহাস করা হয় যা প্রকারান্তরে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনেই বাধা তৈরি করে। মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ, ওয়াজ-মাহফিল-ইসলামি সাহিত্যকে 'জিহাদী' জঙ্গী ইত্যাদি নেতিবাচক অভিধায় অভিহিত করে সামাজিকভাবে বন্ধ করে দেয়ার অযাচিত কর্ম প্রতিনিয়তই বাংলাদেশে ঘটে চলেছে। অথচ ইসলামই শিখিয়েছে, "দীনের ব্যাপারে কোনো জোর প্রয়োগ নেই। মিথ্যা পথ হতে সত্য পথ আলাদা হয়ে গেছে।[২]

মানুষের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।[৩]

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, মুসলিমরা বা ইসলামি রাষ্ট্র তাহলে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে কেনো? ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকলে তো যুদ্ধ হওয়ার কথা নয়? এর উত্তর হলো, ইসলামি রাষ্ট্র বা মুসলিম জনগোষ্ঠী কখনোই কারো সাথে যুদ্ধ করে না। বরং আক্রান্ত হলে কেবল আক্রমণ প্রতিরোধ করে। অমুসলিমরা যদি তাদের উপর আক্রমণ না করে বা সমাজে ও রাষ্ট্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেননি। বরং এ জাতীয় যুদ্ধ তাঁর দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট সীমালংঘন। যেমন তিনি বলেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[৪]

১০। শিক্ষায় অবিচার: বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভয়াবহ অবিচার বিদ্যমান। মুসলিম দেশে ইসলাম সম্মত শিক্ষার পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী শিক্ষা বিদ্যমান। এখানে জীবনের আদর্শ হিসেবে কার্ল মার্ক্স, লেলিন, মাও সেতুং, ডারউইন পড়ানো হয়, এরিস্টটল, সক্রেটিস পড়ানো হয় কিন্তু সেভাবে বিস্তারিত আকারে মুহাম্মদ (সা) এর জীবন দর্শন ও শিক্ষা এবং মুসলিম দার্শনিক-চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, চিন্তানায়কদের চিন্তা ও দর্শন পড়ানো হয় না। এ কারণেই এখন শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য। এ কারণেই শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটে, ছাত্রী তার বখাটে বন্ধুদের সহযোগিতায় শিক্ষককে হত্যা করেন, শিক্ষার্থীরা

---

[১] فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا আল-কুর'আন, ৪: ৬৫

[২] لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ আল-কুর'আন, ২: ২৫৬

[৩] لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ আল-কুর'আন, সূরা কাফিরূন: ৬

[৪] وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ আল-কুর'আন, ২: ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

একে অন্যকে হত্যা করে, স্বার্থ আর লোভ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের মহতি উদ্যোগ থেকে টাকা উপার্জনের ব্যবসায়ীতে পরিণত করেছে।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে শিক্ষার এ অবস্থা পুরোপুরি বদলে যাবে। তখন শিক্ষার্থীর হাত শিক্ষকবৃন্দের গায়ে ওঠার পরিবর্তে পায়ে নেমে আসবে। শিক্ষা হবে সাধনা, শিক্ষা হবে ব্রত। কারণ ইসলামি শিক্ষা আবর্তিত হয় আল্লাহর দেয়া শিক্ষার রূপরেখা অনুসারে, যেখানে প্রতিটি মানুষকে আবশ্যিকভাবে পড়তে জানতে হয়। আল্লাহ বলেন, "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।[১]

১১। সাংস্কৃতিক অবিচার: বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক অবিচার মাত্রাহীন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গায়ে হলুদ, পয়লা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব, বসন্ত বরণ, শীত উৎসব ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের করা হয়। সব উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য তরুণ-তরুণীদের নৃত্য ও গীত। নারী দেহের উন্মুক্ত প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানের সাথে অগ্নিপূজার সেতুবন্ধন গড়ে দিতে প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরু হয় মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলিত করার মাধ্যমে। কুর'আন তিলাওয়াত বা আল্লাহর নামে নয়। অগ্নির কাছে মঙ্গল চেয়ে, শুদ্ধতা চেয়ে পরিচালিত হয় অনুষ্ঠান।[২] এর পাশাপাশি পশ্চিমা ধাঁচে পালিত হয় থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন ডে'সহ নানা অসভ্য অশোভন অনুষ্ঠানের পসরা। যে দিনগুলোতে, রাতগুলোতে মাদক দ্রব্য সেবী উন্মাতাল তরুণ-তরুণীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশের মত দেশে পুলিশ ও র‍্যাবের বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয়।[৩]

তাই বাংলাদেশের ভবিষ্যত সুন্দর এবং সমৃদ্ধিশালী করার স্বার্থে দেশের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের সুবিচারের মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে ব্যক্তি পর্যায় থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। মানুষও মুক্তি পাবে সকল অন্যায় নির্যাতন আর অসভ্যতার আগ্রাসন থেকে। সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনে শান্তি নিশ্চিত হওয়ায় পাশাপাশি মুসলিম জাতি আখিরাতে মুক্তিরও নিশ্চয়তা লাভ করবেন।

নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামের বিধান

ব্যক্তিগত সমস্যা অথবা পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক সমস্যা, জাতীয় সমস্যা অথবা আন্তর্জাতিক, পার্থিব কিংবা পারলৌকিক, বাহ্যিক সমস্যা কিংবা আধ্যাত্মিক – সমস্যা যা-ই হোক, যার-ই হোক; ইসলামে মানুষের প্রথম এবং প্রধান বিবেচ্য সমস্যা এর একটিও নয়। কেননা ইসলামি জীবন দর্শনে এ সমস্যাগুলো কোনো মৌলিক সমস্যা নয় বরং একটি সমস্যার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ইসলাম নির্ধারিত সেই সমস্যাটি হলো অনৈতিকতা। প্রকৃতই মানুষের যখন নীতি থাকে না, যখন সে চরিত্রহীন বলে গণ্য হয়, তখনই সে যে কোনো মন্দ কাজ, গর্হিত ও অন্যায় কাজ অবলীলায় করতে পারে। তখনই সে যে কোনো খারাপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। যা অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কারণেই ইসলাম সবার আগে মানুষের নৈতিকতা পরিশুদ্ধির কর্মসূচী নিয়েছে।

ইসলাম পুরোপুরি একটি নৈতিক আদর্শ। গবেষক-সমালোচক-ইতিহাসবিদ-চিন্তানায়ক আর বুদ্ধিজীবিরা তাই ইসলামকে অভিহিত করেছেন 'একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব' নামে। ইসলামি নৈতিকতার প্রথম, প্রধান এবং বলা যায় একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিক, চিরন্তন এবং সর্বজনীনভাবে কাম্যগুণগুলোই গৃহীত হয়েছে। সাধারণভাবে চরিত্রের যে বিশেষ দিক ও গুণগুলোকে অনাদিকাল থেকে মানুষ গ্রহণীয় মনে করে এসেছে তারই প্রথাসিদ্ধ, সুশৃংখল শোভন উপস্থাপনা হলো ইসলামি নৈতিকতা।

---

[১] اقرأ باسم ربك الذي خلق-خلق الإنسان من علق-اقرأ وربك الأكرم-الذي علم بالقلم-علم الإنسان ما لم يعلم আল-কুর'আন, সূরা আলাক: ১-৫

[২] দেখুন: প্রথম আলো, ইত্তেফাক, সমকাল ১৬ এপ্রিল ২০১০

[৩] থার্টি ফার্স্ট নাইট : র‍্যাবের বিশেষ প্রস্তুতি (সমকাল, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯); ১৪০০ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন : থাকছে ডগ স্কোয়াডের প্রহরা (প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯); রাজধানীতে রেড অ্যালার্ট : উচ্ছৃংখলা রোধে পুলিশ-র‍্যাবের সর্বাত্মক প্রস্তুতি (যুগান্তর, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের প্রকৃতিতে চরিত্রের অনুভূতি একটি স্বাভাবিক অনুভূতি। এটা এক প্রকারের গুণ ও কাজকে পছন্দ করে এবং অন্য এক প্রকারের গুণ ও কাজকে অপছন্দ করে। পছন্দ-অপছন্দের এই অনুভূতি ব্যক্তিগতভাবে কারো কারো কম বা বেশি হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবতার তীব্র চেতনায় এই অনুভূতি তীব্র এবং চিরন্তন। চরিত্রের কোনো কোনো গুণকে ভালো এবং কোনো কোনো গুণকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে মানবতা চিরদিন এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। সততা, সত্যবাদিতা, সুবিচার, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ও বিশ্বাসপরায়ণতাকে সবসময় প্রশংসনীয় গুণ মনে করা হয়েছে। মিথ্যা, যুলম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও বিশ্বাসঘাতকতাতে কোনোকালেই প্রশংসনীয় মনে করা হয়নি। সহানুভূতি, দয়া, দানশীলতা, উদারতা সবসময়ই সম্মান পেয়েছে। পক্ষান্তরে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, কৃপণতা ও সংকীর্ণতা কখনোই মর্যাদা পায়নি। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা , আদর্শপরায়ণতা, বীরত্ব, উচ্চাশা সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য গুণ বিবেচিত হয়েছে। আর অস্থিরতা, নীচতা, তোষামোদী, হীনমানসিকতা, হীনমন্যতা ও কাপুরুষতা সর্বজনীনভাবে অগ্রহণযোগ্য গুণ বলে বিবেচিত হয়েছে। আত্মসংযম, আত্মসম্মানবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও অকপটতা মানুষের কাম্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে নন্দিত হয়েছে। বিপরীতদিকে প্রবৃত্তির দাসত্ব, অশালীন আচরণ, বিশৃংখলা ও কুটিলতা সবসময়ই মন্দ বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিন্দিত হয়েছে। কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মদক্ষতা চিরদিনই সম্মান পেয়েছে। কর্মবিমুখ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, উদাসীন মানুষ কখনোই মানুষের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা পায়নি।

কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয় বরং সমাজ জীবনের ভালো ও মন্দ গুণাবলি সম্পর্কেও মানবতার সিদ্ধান্ত চিরকাল প্রায় এক জায়গাতেই রয়েছে। পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদা কেবল সে সমাজই লাভ করতে পেরেছে যাতে নিয়ম-শৃংখলা, সহানুভূতি, পারস্পারিক সহযোগিতা, ভালোবাসা, কল্যাণকামিতা, সামাজিক সুবিচার ও সাম্য আছে। দলাদলি, উচ্ছৃংখলতা, বিভেদ-বৈষম্য, অনিয়ম, অনৈক্য, পারস্পারিক শত্রুতা, যুলম ও অসহযোগিতাকে পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিনই সামাজিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজ-কর্মের ভালো-মন্দের ক্ষেত্রেও মানবতা সবসময় এক এবং অভিন্ন সিদ্ধান্ত অব্যাহত রেখেছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা, জালিয়াত, ঘুষ, কটূক্তি, নিপীড়ন, কুৎসা রটনা, পরচর্চা, পরনিন্দা, হিংসা, অকারণ দোষারোপ এবং অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কাজকে কখনোই পূণ্যের কাজ মনে করা হয়নি। প্রতারক, ধোঁকাবাজ, অহংকারী, অন্যকে দেখানোর জন্য সৎআমলকারী, মুনাফিক, অন্যায়জেদপরায়ণ ও লোভী ব্যক্তি কখনোই ভালো লোক হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। বিপরীতপক্ষে, মাতাপিতার খিদমত করা, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করা, বন্ধু-বান্ধবের সাথে অকপট ও আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা, ইয়াতিম-মিসকীন ও অসহায় লোকদের দেখাশোনা করা, রোগীদের সেবা এবং বিপদগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো চিরকালই পূণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সৎকর্মশীল, মিষ্টভাষী, কোমল স্বভাব ও অন্যের কল্যাণকামী ব্যক্তি চিরদিনই সম্মান লাভ করেছে। মানবতা চিরদিনই সে সকল লোককে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করেছে যারা সত্যবাদী, সত্য সন্ধানী, যাদের উপর সকল কাজে নির্ভর করা যায়, যাদের ভেতর-বাহির একই রকম, যাদের কথা ও কাজে মিল আছে, যারা কেবল নিজের অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট না বরং অন্যের অধিকার উদারচিত্তে আদায় করার ক্ষেত্রেও যত্নবান, যাদের কাছে প্রত্যেকেই কল্যাণময় কাজের আশা করতে পারে এবং যাদের দিয়ে কিছুমাত্র ক্ষতি বা লোকসান হওয়ার সামান্যতমও আশা থাকে না।

বস্তুত মানবতার এই চিরন্তন স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের বাস্তব প্রতিকৃতি হলো ইসলামি নৈতিকতা। এখানে সে সকল বিষয়কেই অবশ্য করণীয় মনে করা হয়েছে যা মানবিক মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে কাজগুলোকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা মানবতাকে অপমান ও অসম্মান করে। এ জন্য ইসলাম বিশেষ কিছু নির্দেশনা প্রদান করে। যেমন, কুর'আন[১] ও হাদীস অধ্যয়ন এবং অনুসরণ,[২] ঈমান আনয়ন,[১] নিয়ত বিশুদ্ধকরণ,[২] তাকওয়া অর্জন,[৩] সত্য কথা বলা,[৪] সবর করা,[৫] যিকর

---

[১] وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا আল-কুর'আন, সূরা মুয্যাম্মিল: ৪

[২] وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا আল-কুর'আন, সূরা নজম: ৩-৪ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى আল-কুর'আন, সূরা হাশর: ৭

Dhaka University Institutional Repository

করা,[৬] শোকর করা,[৭] আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা,[৮] আল্লাহর গুণের অনুসরণ–অনুশীলন করা,[৯] আমানতদার হওয়া[১০] ওয়াদা পালন করা[১১] শালীনতা বজায় রাখা[১২] সৃষ্টির সেবা করা[১৩] হালাল উপার্জন করা[১৪] পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা[১৫] গীবত পরিহার করা[১৬] হিংসা–বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকা[১৭] আত্মসংযম বজায় রাখা[১৮] রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য সৎআমল না করা[১৯] কথা ও কাজে মিল থাকা[২০] প্রভৃতি।

বস্তুত আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র মানুষের মনুষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। এর মাধ্যমেই পশু–পাখি, কীট–পতঙ্গ, গাছপালাসহ পৃথিবীর সকল প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে নিজের অবস্থান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থেই মানুষকে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ যদি ইসলামের আদর্শ অনুসারে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে তাহলে দেশটি নৈতিক অবক্ষয়জনিত সমস্যাসমূহ দূর হয়ে যাবে।

---

১ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ – الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ – إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ – فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ – أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ – الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ কুর'আন, সূরা মুমিনূন: ১–১১

২ إنما الاعمالُ بالنياتِ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল–বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ওহী

৩ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ আল–কুর'আন, ২: ১৯৪

৪ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আল–কুর'আন, ৫: ১১৯

৫ والله يحب الصابرين আল–কুর'আন, ৩: ১৪৬ ان الله مع الصابرين আল–কুর'আন, ২: ১৫৩ الصبر ثوابه الجنة বায়হাকী الصبر نصف الايمان মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

৬ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ আল–কুর'আন, ২:১৫২ الا بذكر الله تطمئن القلوب আল–কুর'আন, ১৩:২৮

৭ لئن شكرتم لازيدنكم আল–কুর'আন, ১৪:৭

৮ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ আল–কুর'আন, ২:৪

৯ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ আল–কুর'আন, ২:১৩৮; মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

১০ لا إيمانَ لِمَنْ لا امانة له মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব; إن الله يَأمُرُ انْ تؤدوا الامانات إلى اهلها আল–কুর'আন, ৪:৫৮

১১ يَا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود আল–কুর'আন, ৫:১

১২ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذالك ازكى لهم আল–কুর'আন, ২৪: ৩০

১৩ الخلقُ عيالُ الله فاحب الخلق إلى الله منْ احسنَ الى عياله মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

১৪ طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, আলোয়ারুল হাদিস, পূর্বোক্ত, পৃ.৪২

১৫ الطهور شطر من الايمان প্রাগুক্ত

১৬ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ আল–কুর'আন, ৪৯: ১২

১৭ إياكمْ والحسد فإن الحسد يأكلُ الحسنات كما تأكلُ النارُ الحطب আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস–সিজিস্তানী, সুনানে আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

১৮ "মল্লযুদ্ধে যে প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলে সে প্রকৃত বীর নয়। প্রকৃত বীর সে ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে। - মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

১৯ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ আল–কুর'আন, সূরা মাউন: ৪–৬

২০ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ আল–কুর'আন, সূরা সাফ: ২–৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থিক অনাচার

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক অনাচার

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে আর্থিক অনাচার সন্দেহাতীতভাবে শীর্ষস্থানীয় এবং অন্যতম প্রধান। সাধারণভাবে আর্থিক অনাচার বলতে অর্থ-সম্পদ সম্পর্কীয় যে কোনো ধরনের অন্যায়-অসঙ্গত আচরণকে বুঝায়। বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক অনাচারগুলোর মধ্যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ, সুদ, জুয়া, আত্মসাৎ ইত্যাদি প্রধান। এ দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অগ্রগামিতা সুনির্দিষ্টভাবে আর্থিক অনাচারের প্রতিবন্ধকতায় রুদ্ধ। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিটি স্তরে অপচয়, অধিকার হরণ, আত্মসাৎ প্রভৃতি আর্থিক অনাচার মহামারীর মত এ দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের আর্থিক অনাচারগুলোর মধ্যে জুয়া, ঘুষ, সুদ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে এগুলো নির্মূলে ইসলামি বিধান কীভাবে কার্যকর হতে পারে তার কর্ম ও বাস্তবায়ন কৌশল তুলে ধরা হয়েছে।

জুয়া

জুয়া একটি বিশেষ ধরনের খেলা, যাতে অর্থ-সম্পদ বাজি রেখে খেলোয়াড়গণ অংশগ্রহণ করেন। আল-কুর'আন মাজীদে একে مَيْسِر[১] বলা হয়েছে। মায়সির অর্থ বণ্টন করা। জাহিলিয়া যুগে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিলো। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিলো এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বণ্টণ করতে যেয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিদের উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো। তবে উটের গোশত কেউ ব্যবহার করতো না; গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিলো এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেতো, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করতো, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য মনে করা হতো। বণ্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এ ধরনের জুয়া মায়সির নামে খ্যাত হয়।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) এবং কাতাদাহ, মুআবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (র) বলেছেন: "সব রকমের জুয়াই মায়সির, এমনকি কাঠের গুটি ও আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।[৩] এ আলোকে দাবা, লুডু, তাস খেলাও মায়সিরের মধ্যে গণ্য যদি তাতে টাকা পয়সার বাজি ধরা হয় এবং তখন এ খেলাগুলো হারাম বলে বিবেচিত হয়।[৪]

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, লটারিও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৫] যে কাজে লটারির ব্যবস্থা রয়েছে তাও মায়সিরের অন্তর্ভুক্ত।[৬] যে ব্যাপারে কোনো মালের মালিকানায় এমন শর্ত আরোপিত হয় যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। এর ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয়ই বজায় থাকবে।[৭]

জুয়ার কুফল

রাসূলুল্লাহ (সা)এর আবির্ভাব পূর্ব সময়ে আরবে জুয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর মুমিনগণ এ বিষয়ে ইসলামের বিধান সম্পর্কে জানতে চান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, মদ ও জুয়ার মধ্যে ভয়ানক পাপ আছে এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। তবে মদ ও জুয়ার উপকারের চেয়ে এগুলোর পাপ অধিকতর ভয়ানক।[৮] জুয়ায় এক পক্ষ লাভবান হয়। বাকি সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জুয়ার আয়োজকরা জয়ী জুয়াড়ির

---

[১] আল-কুর'আন, ৫: ৯০, ৯১, ২: ২১৯

[২] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ), পবিত্র কোর'আনুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭

[৩] ইবনে কাছীর, তাফসীর ইবনে কাছীর, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোর'আনুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭

[৪] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, পবিত্র কোর'আনুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

[৫] আল-জাসসাস, আহকামুল কুর'আন, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোর'আনুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭ من القمار والمخاطرة

[৬] রুহুল মায়ানী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোর'আনুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭

[৭] শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৫৫, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোর'আনুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭

[৮] يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا আল-কুর'আন, ২: ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ছিনিয়ে নিতে শক্তি প্রয়োগ করে। ভাড়া করা সন্ত্রাসী দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে। জুয়াড়িদের কেউই যেনো জিততে না পরে সে জন্যে নানারকম প্রতারণামূলক নীতি গ্রহণ করে। জুয়াড়িরা নিজেরা একে অন্যকে নিজের প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে অন্যের বিরুদ্ধে প্রবল অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে জুয়ার আয়োজক ও জুয়াড়িদের মধ্যে এবং জুয়াড়িদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, "শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়।[১]

জুয়া খেলা জুয়াড়িকে দায়িত্বহীন করে তোলে। তার মধ্যে সবসময় জুয়ার নেশা সক্রিয় থাকে। নিজ পরিবার এবং পরিবারের লোকজন সম্পর্কে সে উদাসীন থাকে। জুয়ার বিপুল অর্থ পাওয়ার লোভ ও লাভের অন্যায় বাসনা ব্যক্তিকে সকল বিষয় বিস্মৃত করে রাখে। ফলে সে ব্যক্তি ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব তার উপর দেয়া যায় না।[২]

জুয়া জুয়াড়িদের মধ্যে তীব্র হতাশা সৃষ্টি করে। জুয়াড়িরা বিশাল অংকের অর্থ লাভের জন্য জুয়ায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগের এ লক্ষ্য পূর্ণ হয় না। বারবার হেরে যেয়ে তারা আর্থিক দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি হয়। তারা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে, অনেকে তীব্র হতাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনেকে নেশাগ্রস্থ হয়ে পরিবার ও সমাজের বোঝায় পরিণত হয়।[৩]

জুয়ায় লিপ্ত ব্যক্তিরা ইবাদতে অবহেলা প্রদর্শন করে। তারা নেশাগ্রস্থ মানুষের মতো জুয়া খেলে। কখন সালাতের ওয়াক্ত হয় তাদের খেয়াল থাকে না। জুয়ায় বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও হজের জন্য অর্থ ব্যয়ে তারা ভীষণ উদাসীন থাকে। দান-সদকাহ তারা করে না বললেই চলে। বরং যতো অর্থ-সম্পদ লাভ করে তার অধিকাংশই জুয়ায় বিনিয়োগ করে। জুয়ার জন্য তারা আল্লাহর যিকর থেকে জুয়াড়িরা সম্পূর্ণ গাফিল থাকে। আল্লাহ বলেন, "শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা বিরত হবে?"[৪]

দায়িত্বহীনতা ও নৈতিক স্খলনের জন্য জুয়াড়িদের কেউ পছন্দ করে না, ভালোবাসে না। পরিবারে ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। অলসতা, অপব্যয় ও হতাশ মানসিকতার জন্য মানুষের চোখে তারা হেয় ও নিচ হয়ে পড়ে। সচেতন মানুষ জুয়াড়িদের সাথে কোনো রকমের আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না।

সমাজে সন্ত্রাস, বিশৃংখলা, বিপর্যয় সৃষ্টির নেপথ্যে জুয়া ভূমিকা পালন করে। আয়োজকরা তাদের পরিকল্পনামতো অর্থ আত্মসাত করার জন্য সন্ত্রাসী লালন করে। আবার পরাজিত জুয়াড়ি মরিয়া হয়ে নানা রকমের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হলো, এতে জুয়াড়ি প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তার একমাত্র চিন্তা থাকে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে সে অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। আধুনিক জুয়া অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ। এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েকজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।[৫] যা ইসলামে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশে জুয়া এবং তা প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

বাংলাদেশে সামাজিকভাবে এবং নৈতিক দিক থেকে জুয়াকে এখন পর্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও এখানে জুয়ার ব্যাপক প্রচল রয়েছে। বিষয়টি অনেকটাই 'ওপেন সিক্রেট'। বাংলাদেশে পেশাদার জুয়াড়ির সংখ্যা কম হলেও আয়োজক পেশাদারের সংখ্যা কম নয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন অভিজাত হোটেল ও বারে অনুমোদিত ও অননুমোদিত জুয়ার প্রচলন রয়েছে।

---

[১] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ আল-কুর'আন, ৫: ৯১

[২] মুহাম্মদ মতিউর রহমান, জুয়া ও নৈতিকতা, বিআইসি, ঢাকা ২০০১, পৃ.১৫

[৩] মওলানা শাখাওয়াতুল আম্বিয়া, জুয়া ও সুদ প্রসঙ্গে আল-কুর'আন : বিধান ও বাস্তবতা, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ.২৩

[৪] وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ আল-কুর'আন, ৫: ৯১

[৫]মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, পবিত্র কোর'আনুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের প্রায় সর্বত্র জুয়া আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত অসংখ্য খবর দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[১] রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ঘাটের কুলি এবং এ জাতীয় নিম্নবিত্তের লোকদের মধ্যেও জুয়ার প্রচলন দেখা যায়। এদের পাশাপাশি রয়েছে সৌখিন শ্রেণীর জুয়াড়ি। তারা বাজি ধরে তাস বা অন্যান্য খেলার মাধ্যমে জুয়া খেলে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেন। জুয়া প্রতিরোধে এ হারাম ঘোষণাই ইসলামের প্রধান ব্যবস্থা। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্যনির্ধারক তীর শয়তানের অপবিত্র কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই তোমরা এ সব থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারো।[২] জুয়াকে হারাম ঘোষণার পর কোনো মুসলিমের আর এ কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না। কারণ এ নিয়ম মেনেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও বিধান দিয়ে নৈতিক নীতিমালার আওতায় ইসলাম জুয়ার মতো একটি সামাজিক সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু সমাজে এমন লোকও থাকতে পারে ঈমানের এ দাবি উপেক্ষা করে যারা জুয়ায় লিপ্ত হতে পারে। তাদের জন্য ইসলাম হারাম ঘোষণাকেই এ সমস্যা নিরসনের উপায় হিসেবে যথেষ্ট মনে করেনি। এ জন্য ইসলাম জুয়াকে শুধু হারাম ঘোষণা করেই তার দায়িত্ব শেষ করেনি, বরং জুয়া প্রতিরোধের জন্যে জুয়া সংশ্লিষ্ট সকল অন্যায় কাজও হারাম ঘোষণা করেছে। মানুষের সাথে ঝগড়া বিবাদ ও শত্রুতা পোষণকে নিষিদ্ধ করেছে। সাধারণভাবে কারো অধিকার হরণ, অন্যায়ভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ, সমাজে অপরাধ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকে হারাম এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। এরপরও কেউ যদি জুয়ায় লিপ্ত হয় তাহলে ইসলাম তার জন্যে পার্থিব শাস্তি প্রয়োগের বিধান দিয়েছে। এমন ব্যক্তিকে জনসমক্ষে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতে হবে। আর ইসলামি রাষ্ট্র কোনোভাবেই জুয়ার আসর চলতে দেবে না। এ আসর উচ্ছেদ করবে এবং আয়োজকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরভাবে জুয়ার শাস্তি প্রয়োগ করবে। কারণ জুয়া শুধু আর্থিক অনাচারই নয়, বরং চরিত্র বিনাশী আচরণও বটে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম এবং এখনো সামাজিকভাবে প্রায় সকলে এবং নৈতিকভাবে অধিকাংশই জুয়াকে সমর্থন করেন না বলে, ইসলামের এই রীতি ও বিধান কার্যকর এবং নিরপেক্ষভাবে কার্যকর করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ কোনো সীমাবদ্ধতার কারণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া সম্ভব না হলে পারিবারিক বা সামাজিকভাবেও এ বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব, যাতে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের মানুষের শান্তি নিশ্চিত হবে।

সুদ

সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত আর্থিক অনাচারের মধ্যে সুদ সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক। ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ ফেরতের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময় মূল্য পরিমাণের জন্য যা-ই গ্রহণ করে, তাই রিবা বা সুদ।[৩] আবার সময় বৃদ্ধিকরণে ঋণ পরিমাণ বৃদ্ধিটাই সুদ। তবে সময় বৃদ্ধির ভিত্তিতে যে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাই একমাত্র সুদ নয়। বরং এটি সুদের একটিমাত্র রূপ এবং এর এমন আরো অনেক রূপই রয়েছে।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ঋণ কোনো মুনাফা টানে, তাই রিবা।[৫] তিনি আরো বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন লেনদেন করা

---

[১] প্রথম আলো ১১, ১৪, ১৭, ২৯, নভেম্বর ২০০৯; ৪, ১২, ১৫, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯/ সমকাল ১৪, ১৬, ১৯, ২৩ নভেম্বর ২০০৯; ১, ২২, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯/ যুগান্তর ৬ ডিসেম্বর, ২০০৯ / সংবাদ ৯ জানুয়ারি ২০১০/ নয়া দিগন্ত ২, ৭, ৫, ৯, ১৬, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯; ২১, ২৭, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯/ সাপ্তাহিক ২০০০, ১৫ মার্চ ২০০৯, ৩০ মার্চ ২০০৯

[২] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল-কুর'আন, ৫: ৯০

[৩] আল্লামা সাবূনি, তাফসীরে আয়াতুল আহকাম, ১ম খণ্ড, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ.৩৮৩

[৪] ইবনে জরীর, তাফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৯৯০, পৃ.৮৪-৮৭

[৫] كل قرض جر نفعا فهو ربا জামে সগীর, উদ্ধৃতি: মুফতি মুহাম্মদ শফি (র), তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ.৭৯৩

Dhaka University Institutional Repository

হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি গ্রহণ করবে সে সুদ সংঘটনকারী সাব্যস্ত হবে। সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ই সমান অপরাধী।[১]

তাই সমজাতীয় দ্রব্য হোক বা টাকা হোক যদি ধার নেয়া হয় এবং ধার পরিশোধের সময় প্রদত্ত বস্তু বা টাকার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো বস্তু বা টাকা গ্রহণ করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হলো তা সুদ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে কিংবা সরল হারে – যে হিসেবেই নেওয়া হোক না কেনো, অতিরিক্ত কিছু নিলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে।

সুদের ক্ষতিকর দিকসমূহ

কুর'আন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে সুদের হারাম হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করে তা থেকে মুমিনদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।[২] তিনি অন্যত্র বলেন, "মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো তাহলে সুদের মধ্যে থেকে যা এখনো অনাদায়ী আছে তা পরিহার করো।[৩] সুদের হারাম হওয়া নিশ্চিত করে বলেছেন, "আর আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায় বা বেচাকনাকে হালাল করেছেন, হারাম করেছেন সুদ।[৪]

সুদের লেনদেনের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে এই হারাম কাজ সম্পাদন করা হয়। আল্লাহর আদেশ লংঘন করে যারা সুদের লেনদেন করে তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে রয়েছে সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। বলা হচ্ছে – "এরপরও তোমরা যদি সুদ পরিহার না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো।[৫]

সুদ সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কঠোর আদেশ থাকার জন্য মহানবী (সা)ও তাঁর উম্মতদের তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা ক্ষতিকর ৭টি বিষয় থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদুবিদ্যা শেখা ও শেখানো, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ গ্রহণ করা, এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধ থেকে পালানো এবং চরিত্রবতী নারীকে ব্যভিচারিতার অপবাদ দেওয়া।[৬]

আল্লাহ সুদের লেনদেনের জন্য আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি ও দুর্বিসহ পরিণতি প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। বলা হচ্ছে, "যারা সুদ খায়, কিয়ামতের দিন তারা সে ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে স্পর্শ দিয়ে শয়তান যাকে পাগল করে দিয়েছে। ....যারা আবারো সুদ গ্রহণ করবে তারা হবে আগুণের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।[৭]

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে, "নিষিদ্ধ হওয়ার পরও বনী ইসরাঈলরা সুদ গ্রহণ করতো এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতো। তাই আমি তাদের মধ্যকার অবিশ্বাসীদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।[৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরাশদ করেন, "সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৯]

---

[১] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল বুয়ূ

[২] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল-কুর'আন, সূরা আলে ইমরান : ১৩০

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ আল-কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৭৮

[৪] وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আল-কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৭৫

[৫] فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ আল-কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৭৯

[৬] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ঈমান

[৭] الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ..... وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ আল-কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৭৫

[৮] وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا আল-কুর'আন, সূরা নিসা : ১৬১

[৯] আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরাক, আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৯৯০, পৃ.২১১

Dhaka University Institutional Repository

সুদের লেনদেন হারাম হওয়ার কারণে সুদী লেনদেনের মাধ্যমে ব্যক্তি যা উপার্জন করে, উৎপাদন করে, ভোগ করে ও ব্যবহার করে এমনকি সওয়াবের নিয়তে যা দান করে তার সবই হারাম। যারা হারাম জীবিকা উপার্জন ও ভোগ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "হারাম সম্পদে তৈরি মাংসপিণ্ড জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান।[১]

সুদ নিজেই একটি মূর্তমান পাপ। এটি কোনো সাধারণ পাপ নয়। বরং সকল বড়ো ধরণের পাপের মধ্যে সুদ লেনদেনের পাপটি হচ্ছে সর্বাধিক জঘন্য, কুৎসিততম ও বীভৎস। রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন বক্তব্যে এ বীভৎসতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, "সুদের গুণাহের তিয়াত্তরটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতর স্তরটি হলো ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের মাকে বিয়ে করার সমান।[২]

"সুদের গুণাহের সত্তুরটি পর্যায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচেরটি নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমান।[৩]

"জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক পাপ।[৪]

উল্লেখিত হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা) এটা বলেননি যে, সুদ গ্রহণ করা মানে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা বা অসংখ্যবার ব্যভিচার করা। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, মাকে বিবাহ করা বা মায়ের সাথে ব্যভিচারিতায় লিপ্ত হওয়া যেমন ঘৃণ্য, জঘন্য, অমানবিক ও অসভ্য কাজ সুদের লেনদেনও তেমনি এবং তার চেয়েও বেশি জঘন্য কাজ। কেননা সুদের অসংখ্য খারাপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখিত প্রতিক্রিয়াটি হলো সবচেয়ে সাধারণ। সুদের অন্যান্য পাপগুলো এতোই ভয়ঙ্কর যে, তার সাথে তুলনা করার মতো পাপও নেই। এ কারণে মহানবী (সা) সুদী লেনদেনের সাথে জড়িতদের জন্য অভিশাপ ঘোষণা করেছেন। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুদদাতা, সুদ-গ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদ লেনদেনের সাক্ষী দুজনের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলে সমান অপরাধী।[৫]

আল্লাহর কঠোর নির্দেশ লংঘনের পাপ হিসেবে সুদ ব্যক্তির আখিরাতের জীবন পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। সে অন্য পূন্য যাই করে থাকুক না কেনো, সুদের কারণে তাকে অনন্ত কাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

অর্থের বিনিময়ে অর্থের শর্তায়িত লেনদেন বিনিময়ের সাধারণ নীতিতেও অনুমোদিত নয়। এটা কি করে যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, এক ব্যক্তি একটি কারখানাকে বিশ বছরের জন্য ঋণ দেবে এবং এই ঋণ দেওয়ার সময়ই এ কথাও ঠিক করে নেবে যে, আগামী বিশ বছর পর্যন্ত সে নিয়মিতভাবে শতকরা ১০ টাকা মুনাফা নির্দিষ্ট হারে গ্রহন করতে থাকবে? অথচ সেই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করবে,বাজারে তার মূল্য বিশ বছর পর্যন্ত যে উত্থান-পতন হবে সে সম্পর্কে কারোই এক বিন্দু ধারণা নেই। একটি জাতির সকল শ্রেণীর লোকই একটি যুদ্ধে ঝুঁকি, বিপদ এবং ক্ষতি কুরবানী বরদাশত করবে কিন্তু তার ঋণদাতা ধনিক শ্রেণীর লোকেরা তাদের প্রদত্ত ঋণের ওপর নিজ জাতির নিকট থেকে যুদ্ধের শতাব্দীকাল পরেও সুদ আদায় করতে থাকবে- এটা কোনো দেশী কথা?[৬] তাই সুদ হলো বিনিময়নীতি বিরুদ্ধ বিষয়। এখানে সুদখোর কোনো শ্রম, দক্ষতা, সময়, বুদ্ধি বিনিয়োগ ছাড়াই একটা নির্দিষ্ট হারের লাভ গ্রহণ করতে থাকে।[৭]

---

[১] لا يَدْخُلُ الجنةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাআহ

[২] আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরাক, পূর্বোক্ত, পৃ.২১২

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, দারুল মাআরিফ, বৈরুত, ১৪০৯ হিজরি, কিতাবুল বুয়ূ

[৫] আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাআহ

[৬] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাহফহীমুল কুর'আন, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৮

[৭] ড. খুরশিদ উদ্দীন, নৈতিকতা ও মানবিকতা এবং সুদ : পর্যালোচনা, আইআরসি, ঢাকা ২০০৫, পৃ.১০৫

Dhaka University Institutional Repository

সুদ ব্যবস্থায় ব্যাপক বিনিময় বৈষম্য রয়েছে। ব্যবসায় পণ্য ও মূল্য বিনিময় শেষ হলেই কারবার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। সুদ ব্যবস্থায় সুদ গ্রহীতা সুদখোর মহাজনকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। পাশাপাশি ফেরত দেয় মূলধনও। বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কোনো বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে না।

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রধান কারণ হলো, সুদ একটি অত্যন্ত বড় ধরণের যুলুমমূলক ব্যবস্থা। সুদখোর মহাজন সুদদাতার সুবিধা-অসুবিধা, সক্ষমতা-অক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনায় না এনে যে কোনো মূল্যে তার মূলধন ও সুদ উসূলের চেষ্টা করে। ফলে প্রায়শঃ অপ্রীতিকর নানা ঘটনা ঘটে।

সুদ সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের শোষণের জন্যে একটা শোষকগোষ্ঠী গড়ে তোলে। তারা অভাবগ্রস্ত লোকদের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্যে সুদে ঋণ দান করে। মহাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ধরণের সুদ ভিত্তিক ঋণ দিয়ে গরীব, মজুর, শ্রমিক, কৃষক ও নিতান্ত অভাবগ্রস্ত জনগণের রক্ত শোষণ করে। সুদের কারণে এ ধরণের ঋণ পরিশোধ করা গরীবদের পক্ষে শুধু কঠিনই নয় বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তারা এক ঋণ শোধ করার জন্য দ্বিগুণ-তিনগুণ ঋণে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। মূল টাকার কয়েকগুণ বেশি টাকা শোধ করা সত্ত্বেও মূল ঋণ নিজ স্থানেই অপূরণীয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রমজীবিদের উপার্জিত অর্থের প্রধান অংশটাই মহাজনরা সুদ বাবদ শুষে নেয়।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয় সুদ। সুদভিত্তিক ঋণভারগ্রস্ত লোকেরা সর্বদা গভীর চিন্তা ও উদ্বেগে অতিষ্ট হয়ে থাকে। সঠিক চিকিৎসা ও খাবার তাদের ভাগ্যে জোটে না বলে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের স্বাস্থ্যও হারিয়ে ফেলে। সুদের কিস্তি আর মূলধন শোধের বিভীষিকা তাদেরকে অহোরাত্র তাড়া করে। দুঃচিন্তা, দুর্ভাবনা তাদের মনের শান্তি কেড়ে নেয়। নবী (সা) বলেছেন, "তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ ঋণ রাতের দুঃশ্চিন্তা, দিনের অপমান।[১]

সুদ ঘৃণা সৃষ্টি করে। গরীব ও মধ্যবিত্তদের শোষণের পথ অব্যাহত রেখে সুদ শোষক জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের অপরিসীম ঘৃণার জন্ম দেয়। শোষিতরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পরিণতিতে শোষক দলও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায় না। কেননা তাদের এই অমানবিক স্বার্থপরতার দরুন গরীব ও মধ্যবিত্তদের অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। এর ফলে তাদের মনে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণার এক বিরাট ঝঞ্ঝা তৈরি হয়। প্রতিনিয়ত তা ক্ষুব্ধ হতে ও বিক্ষোভে ফুলতে থাকে। এরপর কোনো বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে এই আগ্নেয়গিরি তখন অগ্ন্যুদগীরণ করে তখন এই যালিম ধনী সম্প্রদায় ধন-সম্পদের সাথে নিজেদের সম্মান এমনকি জীবনও হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।[২]

ব্যবসায় সাধারণভাবেই Production ও Profit বাড়ায়। কিন্তু সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে। হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। এমনিভাবে সুদের হার যদি শূন্যের কোঠায় নেমে আসে তাহলে বিনিয়োগে বিপুল গতি সঞ্চারিত হয়। ধরা যাক পাঁচটি এমন প্রকল্প যার একটিতে লাভের হার শতকরা ৫ ভাগ, দ্বিতীয়টিতে শতকরা ১০ ভাগ, তৃতীয়টিতে শতকরা ১৫, চতুর্থটিতে শতকরা ২০ এবং পঞ্চমটিতে লাভের হার শতকরা ২৫ ভাগ। সুদের হার যদি শতকরা ১০ ভাগ হয় তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকল্পে কেউ সুদে ঋণ নিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করবে না। অর্থাৎ তাতে ৪০% ভাগ বিনিয়োগ সম্ভাবনাময় প্রকল্প কেবল সুদের কারণে কোনো বিনিয়োগ পাবে না। কেননা ১০% হারে সুদ পরিশোধের শর্তে নেওয়া ঋণের টাকা কেউ ১০% বা ৫% ভাগ লাগের প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে না। কেননা তাতে করে ব্যবসায় লোকসান হবে। এমনকি সুদের কিস্তি শোধের মতো লাভও করা সম্ভব হবে না। তাতে করে একটি বিপুল এলাকা বিনিয়োগ সুবিধা বঞ্চিত থেকে যাবে। যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সুদ। এভাবে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধক কোনো রীতি মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

সুদ আর্থিক দিক দিয়ে অভাবনীয় বৈষম্য তৈরি করে। ধনীকে আরো ধনী বানায়। গরীবকে আরো গরীব। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণও সম্প্রতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য

---

[১] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল মুসাক্বাহ ওয়াল মুযারাআহ

[২] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুর'আন, ১মখণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, "দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুদখোরের মুঠোর মধ্যে চলে গেছে।[১] বাস্তবতাও তাই। সুদ কোটি মানুষের আয়ে কয়েকজন পুঁজিপতির ধন-ভাণ্ডারকে কেবল সমৃদ্ধ করে।

সুদভিত্তিক ঋণ পদ্ধতিতে দরিদ্রদের ধন সম্পদ নিশ্চিতভাবে ধনীদের হস্তগত হয়। ফলে সম্পদ বন্টনে শোষণমূলক অসাম্য অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং এ কারণে সমাজ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। এটা ইসলামের সমাজদর্শন ও সামষ্টিক স্বার্থপরিপন্থী। উপরন্ত বিষয়টি আল্লাহ তা'আলারও ইচ্ছা পরিপন্থী। তিনি তো মানুষের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সুদ এ চেষ্টাকে প্রভাবহীন করে দেয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্নতর অকল্যাণ ধারা সৃষ্টি করে।

সুদের প্রতিক্রিয়া উৎপাদন ও ভোগ ব্যবহারের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সাধারণত এটা দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, ভোগ ব্যবহারিক ঋণে এক শ্রেণীর উচ্চতর ভোগ সম্পন্ন লোকদের হাত থেকে তাদের ক্রয় ক্ষমতার একটা অংশ ভোগের নিম্নতম প্রবণতা সম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে চলে যায়। এ লোকেরা তাদের অব্যবহৃত বা অব্যয়িত সম্পদ সুদের ভিত্তিতে পুনর্বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন বাড়লেও ভোগ-ব্যবহারের চাহিদা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনমূলক কার্যক্রমে গৃহীত ঋণে সুদ ধার্য হওয়ার পর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। এই অতিরিক্ত মূল্যদানে জনগণ বাধ্য হয় বলে তাদের হাতের সম্পদ মূল্যবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় অন্যায়ভাবে শুষে নেওয়া হয়। তা চলে যায় এমন লোকদের হাতে, যাদের ভোগ-ব্যবহারের প্রবণতা গড় ভোগ প্রবণতার চেয়ে কম।

এই বৈষম্য বহু রকমের অকল্যাণ সৃষ্টি করে। সমাজে অর্থ প্রবাহ রুদ্ধ করা, উদ্যমহীনতা হেতু বাণিজ্য মন্দা, একচেটিয়া কারবার এবং শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার মূলেও এ কারণই নিহিত থাকে।

সুদ এক অলস ও কর্মবিমুখ মানব শ্রেণী তৈরি করে। তারা তাদের পূর্বেকার পুঞ্জিভূত সম্পদ দ্বারা কোনোরূপ শ্রম বা ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই নতুন সম্পদ করায়ত্ত করে। ফলে সাধারণ মানুষ শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের উৎসাহ, উদ্যম ও সুযোগ হারিয়ে ফেলে। সুদখোর মহাজনরা সুদের নিশ্চিত আয় ভোগের আশায় মুনাফার অনিশ্চিত ঝুঁকি নেয় না। পুঁজি খাটিয়ে ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের ঝামেলা থেকে দূরে থেকে তারা অলস, অকমর্ণ্য ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

সুদ শ্রমজীবি মানুষ যারা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে তাদের শ্রম শোষণ করে। তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে উৎপাদন করে কিন্তু সুদের শোষণ তাদেরকে এমনভাবে শুষে নেয় যে, তাদের নিকট নিজের উপার্জিত অর্থের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে তারা ক্রমশ শ্রম ও উপার্জনের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। কেননা তারা যখন নিজেদেরই শ্রমোপার্জিত অর্থে অন্যকে পুষ্ট হতে দেখে, তখন উপার্জনে মনোনিবেশ করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সুদভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায়। কেননা এতে উৎপাদিত পণ্যের স্বাভাবিক মূল্যের সাথে সুদের একটা অংশ যুক্ত হয়। ফলে দ্রব্যের স্বাভাবিক দামের চেয়ে বাজার দর বৃদ্ধি পায়।[২]

সুদ অর্থের অবাধ গতি নষ্ট করে সম্পদের সুষম বন্টন অসম্ভব করে তোলে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের সকল উপার্জন কিছু সংখ্যক পুঁজিপতির পকেটস্থ হয়। ফলে পুঁজি বাজারে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি হয়। সুদের উচ্চহারের জন্যে তা উৎপাদনে ব্যয়িত হয় না।

অনেক মুসলমানই এখন অনুধাবন করা শুরু করেছেন, কেনো মহান আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং সুদবিহীন ব্যবসাকে হালাল করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৮ সালে যে আর্থিক বিপর্যয় ঘটে গেল এটা অন্য অর্থে সুদী ব্যবস্থারই ধ্বস।[৩] ওই দেশের

---

[১] মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫

[২] মুহাম্মদ ইফতেখার ইকবাল, পুঁজিবাজার ও সুদ : পর্যালোচনা, আইআরসি, ঢাকা ২০০৪, পৃ.১৭৪

[৩] ২০০৮ সালের এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই নয় বরং পাশ্চাত্যের অধিকাংশ উন্নত দেশে একযোগে দেখা দিয়েছিল। যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়াসহ শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। মন্দা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দেশগুলোর বিভিন্ন কোম্পানি গণহারে কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাটাই শুরু করে। কেবল যুক্তরাজ্যেই ছাটাই হয় ১০ লক্ষাধিক শ্রমিক। মন্দা মোকাবেলায় বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি হাস্যকর নানা কর্মসূচি ঘোষণা করে। অনেক খ্যাতিমান কোম্পানি দেউলিয়াত্বের কলঙ্ক নিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ঢাকা ২৩ মার্চ ২০০৯)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিতে বলা চলে অন্য বাজার তথা কথিত মুক্ত অর্থনীতিতেই আয় অর্জনের একটা বড় উৎস হলো সুদ। সুদও যদি এক জায়গায় স্থির থাকত তাহলে বিপর্যয়ের মাত্রা হয়তো কম হতো। ওরা সুদকে ছেড়ে দিয়েছে বাজারের উপর। স্থির সুদ বলতে তেমন কিছুই ছিলো না। ফলে সুদের সাথে সম্পর্কিত অন্য আর্থিক হাতিয়ারের বাজার মূল্যে উত্তোলন দেখা দিলে সুদের হারেও উত্থান-পতন ঘটতে থাকে। যারা বাড়ি ঘর বন্ধক রেখেছিলো সুদের বিনিময়ে অর্থঋণ করার জন্য তারা দেখল এক পর্যায়ে সুদের জালে আটকা পড়ে গেছে। একদিকে বাড়ির মূল্য কমতে লাগল, লগ্নিকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ ফেরত দেয়ার জন্য তাগাদাপত্র দিতে লাগল, অন্যদিকে ওইসব ঋণগ্রস্ত লোকেরা সুদিনে ঋণের অর্থ ভোগের কাজে লাগানোর জন্য তাদের ঋণ ফেরত দেয়ার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলল। ওই অবস্থায় বাড়ি কেনার জন্য যেসব ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানিগুলো অতি সেধে ঋণ দিয়েছিলো তারা অতি দ্রুত বন্ধকী বাড়ি নিলামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করলো। এই নিলামেও দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ায় লাখ লাখ আমিরিকানবাসী তাদের স্বপ্নের বাড়িগুলোকে অপেক্ষাকৃত বড় লোকদের কাছে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরই সরকারের কাছে হারিয়েছে। সরকার কীভাবে মধ্যবিত্ত আমেরিকানদের বাড়ির মালিক হলো? হলো এইভাবে যে, ওইসব বাড়ি তো ব্যাংকের কাছে বন্ধক ছিলো। বাড়ির মালিক ঋণ ফেরত দিতে পারেনি বলে সরকার ব্যাংকগুলো থেকে ওই ঋণ কিনে নেয়। ফলে এতদিন সরকার বাড়িগুলোকে ফেরত দিলেও অনেক মালিক ওইসব বাড়ির পুনঃমালিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ঋণ যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের আয়ের দিক দিয়ে আরো নিচে ঠেলে দিয়েছে। এদের কোমর সোজা করে দাঁড়াতে অন্তত একযুগ সময় লাগবে।[১]

এজন্যই আমাদের ধর্মেও বলা আছে, সুদকে পরিহার করো বটে, অতিরিক্ত ঋণের মধ্যেও ডুবে যেয়ো না। যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হয় সবচেয়ে বড় ঋণী অর্থনীতি। এটার দুটি দিক আছে। এক. যুক্তরাষ্ট্র চাইলেই অন্য রাষ্ট্রগুলো থেকে ঋণ পায়। আজকে যুক্তরাষ্ট্র শত শত বিলিয়ন ডলার ঋণী ভারত, চীন, কোরিয়া ও জাপানের কাছে। এসব দেশ বাণিজ্য করে যে ডলার মজুদ গড়ে তুলেছে তার বেশির ভাগ এরা পুনঃবিনিয়োগের নামে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। উৎপাদন করেছে চীন, ভারত, জাপান, কোরিয়ার মত বড় অর্থনীতির দেশ আর সস্তা পেয়ে ঋণ করে ভোগ করেছে আমেরিকানরা। এভাবে এতন আমেরিকানদের বহিঃঋণ বিশ্বের সর্বোচ্চ। ঋণের অন্যদিক হলো যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ বেচতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা যে ঋণের উপযুক্ত নয় তাকেও ঋণ দিতে থাকে। ফল হয়েছে এক ঋণ শোধ করার জন্য মার্কিন নাগরিকরা শুধু অন্য ঋণ গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য নিয়ে যখন প্রশ্ন দেখা দিল তখন ঋণের আবর্তনের গতি থেমে গেল এবং তখনই তাদের নামি-দামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একে একে ধ্বসে পড়তে লাগল। এসব প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ছিলো খুবই সামান্য। তারা শুধু একপক্ষের ডলার এনে অন্যপক্ষকে সরবরাহ করে বড় অঙ্কের ফি ও সেবামূল্য আদায় করতো।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারও ভেতরের খবর জানতে চেষ্টা করেনি। সব আর্থিক জগতকে দক্ষতা ও উৎকৃষ্টতার নামে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলো। রেগুলেশনের বালাই ছিলো না। ওদের বড় বড় এক্সিকিউটিভরা লাখ লাখ ডলারের বেতন-বোনাস নিয়েছে, অন্য দিকে তাদেরই চালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে লালবাতি জ্বলা শুরু করেছিলো। পুঁজিবাদের সেই কথিত স্বাধীনতা যে কতবড় ক্ষতির কারণ হতে পারে সেটা আর একবার দেখা গেল ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক জগতে বিপর্যয়ের মাধ্যমে। এটা ঠিক, বিপর্যয়ের পর তাদের সরকার আরেক ধরনের সংস্কার তথা রেগুলেশনে হাত দেবে। কিন্তু ততক্ষণে লাখ লাখ আমেরিকান স্রেফ বড়লোকদের পাতানো জালে আটকা পড়ে তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় করা সম্পদগুলোকে হারিয়েছে। তাদের ধারণা দেয়া হয়েছিলো এই বলে যে, তাদের সামনে শুধু শুভদিন। তারা তাদের বর্ধিত মূল্যের সম্পদের বিপরীতে ঋণ করে উঁচু ভোগের স্তরে যেতে পারবে। কিন্তু সেই লোভের আশা বেশি দিন টিকল না। অধিকাংশ আমেরিকান টের পেল, তাদের

[১] মুহাম্মদ ইফতেখার ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। অতি অল্প সময় অতি বেশি ধনী হতে চাওয়ার পরিণাম হলো এই যে, অতি চালাক কিন্তু লোকের পাতানো জালে তারা ধরা দিয়ে দেয়।[১]

এই আর্থিক টালমাটালের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে, যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদকে এড়িয়ে ব্যবসাকে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ঝুঁকির সাথে বেঁধে দিয়েছে, ওইসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বিশ্বে ইসলামি মডেলে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর বাঁচার রহস্য কী এটা এখন অনেক মার্কিন ও ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা জানতে চাইছে। সত্য হলো, আমেরিকান ও ইউরোপীয়রাও এমন সুদবিহীন আর্থিক হাতিয়ার ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে। সুদ পরিহার করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আর্থিক জগত চালানোর জন্য কাউকে বিশ্বাসে মুসলমান হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এটা হলো একটি মডেল যেটা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদগত। তবে এটার ব্যবহারিক দিকটা সবাই গ্রহণ করতে পারে, এরা করেছেও। অংশীদারিত্বের মডেলের মধ্যে তারা অধিক উপকার দেখতে পাচ্ছে।[২]

বাংলাদেশে সুদের প্রচলন ও অবস্থা

সুদ একটি ভয়ানক পাপাচার এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামি চেতনা বিরোধী বিষয় হলেও বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের এ দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদভিত্তিক অর্থনীতিই প্রচলিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রীয় যে চার নীতি গ্রহণ করা হয় তাতে সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণের ঘোষণা থাকলেও বাস্তবিকপক্ষে বাংলাদেশে পুঁজিবাদের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংহত রূপ পায়। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে এ দেশ পুরোপুরি পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সে হিসেবে বাংলাদেশের সরকারি লেনদেনে, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বীমা ও অন্য সকল ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সাধারণভাবে সুদভিত্তিক লেনদেনের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৮৩ সালে ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সুদমুক্ত ব্যাংকিং শুরু করার পর ব্যাংকিং খাতে এবং পরবর্তীতে বীমা খাতেও সুদমুক্ত বীমার নবতর ধারা শুরু হয়। বর্তমানে কেবল ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার প্রত্যাশায় এইচ.এস.বি.সি'র মত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকও বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা খুলেছে। অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক স্বতন্ত্রভাবে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকিং শাখা পরিচালনার ব্যবস্থা রেখেছে। এগুলো সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার কল্যাণকর দিক নির্দেশনা করে এবং বাংলাদেশের মানুষ যে তা গ্রহণ করার জন্য নৈতিকভাবে সম্মত তা প্রমাণ করে কিন্তু এসবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুদমুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু থাকলেও সুদী অর্থনীতি যে এ দেশের মানুষকে স্বস্তি দেয়নি তা বিভিন্ন সেমিনার, গবেষণা ও পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিমাগার ব্যবসার আড়ালে সুদের কারবার!

নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে হিমাগারে আলু রাখেন কৃষক-ব্যবসায়ীরা। হিমাগারে রাখা কৃষকের সেই আলুই ব্যাংকে বন্ধক রেখে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকার ঋণ। এ টাকা আবার চড়া সুদে দাদন দেয়া হচ্ছে কৃষক-ব্যবসায়ীদের। আর হিমাগার থেকে আলু তুলতে গিয়ে নাজেহাল হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন কৃষক-ব্যবসায়ীরা। জয়পুরহাটের কলাইয়ের পুনট কোল্ডস্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এভাবেই সুদের কারবার চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

[১] অধ্যাপক আবু আহমেদ, সুদ লোভ এবং আর্থিক বিপর্যয়, ৫ম বর্ষপূর্তি ক্রোড়পত্র, নয়াদিগন্ত, ৩০ জুন ২০০৯, পৃ.১৮

[২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা কৃষি বিভাগ জানায়, কালাইয়ে প্রতি মৌসুমে গড়ে ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়। এসব আলু সংরক্ষণের জন্য এখানে রয়েছে আটটি হিমাগার। নির্দিষ্ট ভাড়ার চুক্তিতে এসব হিমাগারে বীজ ও খাওয়ার আলু পাঁচ–ছয় মাসের জন্য রাখা হয়। কৃষকদের অভিযোগ, উপজেলার বেশির ভাগ হিমাগার বেশ কয়েক বছর ধরে আলু বন্ধক রেখে ঋণ উত্তোলন করে তা দিয়ে সুদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে চলতি মৌসুমে শুধু পুনট কোল্ডস্টোরেজ এই ব্যবসা চালাচ্ছে।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) কালাই শাখা সূত্র জানায়, চলতি মৌসুমে এই শাখা থেকে পুনট কোল্ডস্টোরেজের অনুকূলে চার কোটি ৬০ লাখ টাকার চলতি পুঁজি (সিসি–প্লেজ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। হিমাগার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত ৬৫ হাজার বস্তা আলু তাদের বলে চালিয়ে দিয়ে ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ নির্ধারিত চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে এর চাবি ব্যাংককে বুঝিয়ে দেয়। বিনিময়ে হিমাগার কর্তৃপক্ষ ঋণের চার কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেয়। ১২ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে হিমাগার কর্তৃপক্ষ ২০ থেকে ২২ শতাংশ সুদে ঋণ দেয় কৃষক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী–পেশার মানুষের কাছে। ঋণগ্রহীতারা জানান, ঋণের জন্য ১০০ টাকায় তাদের আবেদন ফরম কিনতে হয়। মৌসুম শেষে নির্ধারিত সুদ, সার্ভিস চার্জসহ আসল পরিশোধ করতে হয়। এ জন্য ঋণ আদায়ের ছাপানো রসিদ প্রদান করে হিমাগার কর্তৃপক্ষ। কেউ পরিশোধে ব্যর্থ হলে হিমাগারে রাখা তার আলু বাজেয়াপ্ত করা হয়।

চলতি মৌসুমে ভাড়া পরিশোধ করে কৃষকেরা আলু তুলতে গেলে হিমাগার কর্তৃপক্ষ তাদের ঘোরাতে থাকে। এক পর্যায়ে ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। কৃষকেরা জানতে পারেন, তাদের আলুভর্তি চেম্বারের চাবি ব্যাংকের জিম্মায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চেম্বার থেকে আলু বের করতে দিচ্ছে না।[১]

আইএনএমের কর্মশালায় অভিমত ॥ ক্ষুদ্রঋণের সুদ আরও কমানো সম্ভব

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে বড় ধরনের অস্ত্র ক্ষুদ্রঋণ। তবে এর সুদের হার নিয়ে এখনো অস্পষ্টতা রয়েছে। অর্থনীতিবিদেরা এ বিষয়ে একেক ধরনের মত দেন। তবে তারা এ–ও বলেন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুদের হার কমছে। ভবিষ্যতে তা আরও কমানো সম্ভব।[২]

বড় বাজেটের চাপ সামলাতে সরকার চড়া সুদে ৫০ কোটি ডলার ঋণ নিচ্ছে

চলতি ২০০৯–১০ অর্থ বছরের জন্য গত মাসের ঘোষিত বড় বাজেটের চাপ সামলাতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছে সরকার। এই অর্থ পাওয়ার ব্যাপারে ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এডিবিকে অনুরোধ করা হয়েছে। জানা গেছে, বাজেটের জন্য সহায়তা হিসেবে ২০ কোটি ডলারের ঋণ নেওয়া হবে। এর মধ্যে ১০ কোটি ডলার পাওয়া যাবে সহজ শর্তে। আর বাকি ১০ কোটি ডলার নিতে হবে কঠিন শর্তে। এর বাইরে বাড়তি আরও ৫০ কোটি ডলার ঋণ নেয়ার ব্যাপারে সরকার এডিবির কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই অর্থও নিতে হবে উচ্চ সুদে। সব মিলিয়ে ৬০ কোটি ডলার বা স্থানীয় মুদ্রায় চার হাজার ১৪০ কোটি টাকার চড়া সুদের ঋণ নিতে যাচ্ছে সরকার।

এই ঋণ নিলে বাংলাদেশ সরকারকে লন্ডনের আন্তব্যাংক মুদ্রাবাজারের কলমানির (একটি ব্যাংককে সীমিত সময়ের জন্য যে হারে অর্থ ধার দেয়া হয়) সুদ দিতে হবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে এডিবির ২ শতাংশ তহবিল খরচ ও শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ কমিটমেন্ট চার্জ। এতে মোট সুদের হার ৫ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত পড়বে। আবার এই ঋণ পরিশোধের সময়কালও হবে মাত্র পাঁচ বছর এবং আসলের সুদ কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে ছাড়ও পাওয়া যাবে মাত্র তিনবছর।

---

[১] আনোয়ার পারভেজ, হিমাগার ব্যবসার আড়ালে সুদের কারবার, প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৪

[২] রাজধানীর পিকেএসএফ ভবনে ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)–এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ও স্বচ্ছতা শীর্ষক কর্মশালা শুরু হয় ১১ আগস্ট ২০০৯ তারিখে। কর্মশালায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, আইএনএমের চেয়ারম্যান ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক এম এ বাকী খলীলী, এমআরএ'র ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মাজহারুল হক, পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মেজবাহউদ্দীন আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা মাইক্রোফিন্যান্স ট্রান্সপারেন্সির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চাক ওয়াটারফিল্ড প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। (প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১৫)

Dhaka University Institutional Repository

..... স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশের অন্যতম দাতা সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান ও স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে আসছে এডিবি। তবে নিজস্ব এই ধারা বদলে সংস্থাটি এরই মধ্যে কঠিন শর্তে ও চড়া সুদে ঋণ দেয়ার পথে চলতে শুরু করেছে। ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত এডিবি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে যে সকল ঋণ দিয়েছে, এর অর্ধেকই এসেছে চড়া সুদের তহবিল থেকে।[১]

সুদের হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের দাবি বিটিএমএর

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি আব্দুল হাই সরকারের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাত করে। এ সময় বিটিএমএ'র সভাপতি কয়েকটি বিষয়ে গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়গুলো হচ্ছে, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের সুযোগ প্রদান, সুদের হার যৌক্তিক পর্যায়ে তথা সিঙ্গেল ডিজিটে নির্ধারণ, রপ্তানির ঋণপত্রের বিপরীতে রপ্তানিমূল্য পরিশোধ করার জন্য এলসিতে সুনির্দিষ্ট বিধান সংযোজন, ব্যাংক কমিশন ও চার্জ একইহারে নির্ধারণসহ তা সহনীয় পর্যায়ে ধার্য করা।[২]

আইসিসিবি'র সেমিনারে মশিউর রহমান ॥ অর্থনীতির জন্য ঋণের উচ্চ সুদ ঝুঁকিপূর্ণ

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এ কে এম মশিউর রহমান বলেছেন, দেশে ব্যাংক ঋণের সুদের হার এখনো উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, যা মূল্যস্ফীতির সঙ্গেও মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি উচ্চ সুদ হারকে অর্থনীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অভিহিত করে বলেন, এই উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ হবে অনেকটা জুয়ার মত। এ ধরনের ক্ষেত্রে তাই ভুল ব্যক্তির ঋণ সুবিধা পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি এসব ঝুঁকির কথা তুলে ধরে সুদ হার কমানোর পরামর্শ দেন। ..... তিনি বলেন, ঋণ নিয়ে বিনিয়োগকারীরা খুব একটা ভালো ব্যবসা না করলেও ব্যাংকগুলো ঠিকই উচ্চহারে মুনাফা করছে। আসলে কয়েকটি ব্যাংক সংঘবদ্ধ হয়ে বা ওলিগোপলির মাধ্যমে পুরো মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে।[৩]

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে অনুদানসহ সামগ্রিক ঘাটতি ধরা হয়েছে ২৯ হাজার ২২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ২৬ শতাংশ বা এক চতুর্থাংশ ঘাটতি অর্থায়ন করা হবে। এর মধ্যে ৮ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বিদেশি ঋণ হিসেবে। আর অভ্যন্তরীণ খাত থেকে সংগ্রহ করা হবে ২০ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ খাতের মধ্যে ১৬ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা নেওয়া হবে ব্যাংক খাত থেকে ঋণ হিসেবে এবং তিন হাজার ৮০০ কোটি টাকা নেওয়া হবে ব্যাংকবহির্ভূত খাত থেকে।

বাজেটের একক খাত হিসেবে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ঋণের সুদ পরিশোধে। এ খাতে ব্যয় হবে মোট খরচের ১৩.৯ শতাংশ বা ১৫ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মূল বাজেটে সুদ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিলো ১২.৬ শতাংশ বা ১২ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা, যদিও সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ আরও কিছুটা বেড়ে গেছে। হয়েছে ১৩ হাজার ৩১৪ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে আরও একধাপ বেড়ে গেছে সুদের ব্যয়। কয়েক বছর ধরে সুদের ব্যয়ই বাজেটের বৃহত্তম খাতের জায়গা দখল করে নিয়েছে।

বাজেট পরিকল্পনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকার আশা করছে ভবিষ্যতে বিদেশি সাহায্য বেশি আসবে। গত বছর সিডরের কারণে বেশি সাহায্যের উদাহরণ ছাড়া দেশের ইতিহাসে এই পরিমাণ সাহায্য খুব কমই এসেছে। আর গত জুলাই থেকে মার্চ সময়ে বিদেশি সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৪ কোটি ডলার। সরকার যদি ভবিষ্যতে বিদেশি সাহায্য বেশি আনতে সক্ষম হয়, তবে তা অবশ্যই স্বস্তিদায়ক হবে। তবে বিশ্ব অর্থনীতির চলমান মন্দা পরিস্থিতিতে বড় অর্থনীতির দেশগুলো যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দাতা ও ঋণদানকারী সংস্থাগুলো বিদেশী সাহায্য নিয়ে সেদিকেই বেশি ধাবমান হবে বলে ধারণা করা যায়।

---

[১] প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০০৯, পৃ.১৭

[২] প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ.১৭

[৩] প্রথম আলো ১০ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১৫

Dhaka University Institutional Repository

আর ক্ষতিগ্রস্ত ধনী দেশগুলো যেহেতু নিজেদের পুনরুদ্ধার তাই বেশি অর্থ ব্যয় করবে ফলে বেশি সাহায্য পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। তারপরও সরকার যদি আশানুরূপ অর্থ সাহায্য আনতে পারে, সেটা বড় কৃতিত্বের দাবি রাখে।

কিন্তু বিদেশি সাহায্য আশানুরূপ না এলে বাজেট বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। সে ক্ষেত্রে একদিকে ঋণের সুদের হার কয়েক গুণ বেশি হবে। অন্যদিকে বেসরকারি খাত বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) পরামর্শ দিয়েছে, যেন ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে বন্ড বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এতে মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ তেমন পড়বে না আবার বেসরকারি খাতও ঋণবঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।[১] কিন্তু এখানেও একটি ঝুঁকি আছে। বন্ড বিক্রি করতে হলে সেটার সুদের হারও মোটামুটি আকর্ষণীয় হতে হবে। তার মানে সুদের ব্যয় পরিশোধের দায় বাড়বে। সুতরাং যে প্রক্রিয়াতেই ঘাটতি অর্থায়ন হোক না কেনো, ঋণ ও সুদের দায় বাজেট থেকেই পরিশোধ করতে হবে। বছর বছর বেড়ে সুদের দায় ইতিমধ্যে ব্যয়ের সবচেয়ে বড় খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।[১]

বস্তুত এ বাস্তবতাতেই সরকারকে কম সুদে ঋণ দিতে অনীহা প্রকাশ করেছে বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এ কারণে গতকাল বাজার থেকে পূর্বনির্ধারিত ৪৫০ কোটি টাকার ঋণ নিতে পারেনি সরকার। গতকাল ১০ বছর মেয়াদী সরকারি ট্রেজারি বন্ডের নিলামে ১০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৫০০ কোটি টাকা নিয়ে অংশ গ্রহণ করলেও সুদ না ফমানোর ফলে শেষ পর্যন্ত কোনো টাকা নেয়া হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের (এডিপি) কোনো গতি নেই। উন্নয়নব্যয় কম হওয়ায় সরকারের ঋণের চাহিদাও কমে গেছে। এসব কারণে বেশি সুদে ব্যাংক থেকে আপাতত ঋণ নেয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। জানা গেছে, সরকার তার বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। সরকারি ঋণের যোগান দিতে গিয়ে বেসরকারি ঋণের ওপর কোনো প্রভাব না পড়ে সেজন্য সারা বছরের ঋণ নেয়ার আগাম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রতি সপ্তাহে সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে কী পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করবে তার তালিকা তৈরি করা হয়। সরকার বিভিন্ন ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য ঋণ নিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণের যোগান দেয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন মেয়াদি বিল ও বন্ডের নিলামের আয়োজন করা হয়। গতকাল ছিলো ১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলামের দিন। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে ৪৫০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার কথা ছিলো। এ নিলামে ১০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ৮টি ব্যাংক রয়েছে। ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংক ৮.৯৫ শতাংশ সুদে ৫৭ কোটি টাকা, সোনালী ও উত্তরা ব্যাংক ৮.৯৮ শতাংশ সুদে যথাক্রমে ১০০ কোটি ও ৫৪ কোটি টাকা, অগ্রণী, প্রাইম ও যমুনা ব্যাংক ৯ শতাংশ সুদে যথাক্রমে ৫৭ কোটি, ৫৪ কোটি ও ৫১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, এনসিসি ব্যাংক ৯.০৫ শতাংশ সুদে ৫৪ কোটি টাকা, সাউথ-ইস্ট ব্যাংক ৯.০৯ শতাংশ সুদে ৫৪ কোটি টাকা নিয়ে নিলামে অংশ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর পৌনে ৯ শতাংশ সুদে ব্যাংকগুলো ১০ বছর মেয়াদি বন্ডে বিনিয়োগ করেছিলো। আগের সপ্তাহ থেকে বেশি সুদ হাকানোর ফলে গতকাল কোনো টাকাই ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন তহবিল ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, আমানতকারীদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে সবমিলিয়ে ব্যাংকের ৯ শতাংশের উপরে ব্যয় হয়। সেখানে ৯ শতাংশের নিচে ১০ বছর মেয়াদি বন্ডে সরকারকে ঋণ দিলে ব্যাংক লোকসানের সম্মুখীন হবে। তবে অনেক ব্যাংকের হাতেই পর্যাপ্ত নগদ টাকার প্রবাহ রয়েছে। বিনিয়োগকারী বিনিয়োগমুখী না হওয়ায় ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারছে না। এর ফলে অনেক ব্যাংকের হাতে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল অতিরিক্ত রয়েছে। এ কারণে অনেক ব্যাংক বাধ্য হয়ে কম সুদে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে অংশগ্রহণ করে।

---

[১] মনজুর আহমেদ, সুদের ব্যয়, সুদের দায়, প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০০৯, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

অপর একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, বেসরকারি খাতে ঋণচাহিদা না থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অনেকটা বিকল্প বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর অর্থ হিসেবে টাকা অলস না রেখে পরিচালন ব্যয় সমন্বয় করতে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর কারণ হিসেবে ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে দেশে বিনিয়োগ চাহিদা বেড়ে যেতে পারে। সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করলে তহবিল আটকে যাবে। এতে চাহিদা মাফিক বাণিজ্যিক বিনিয়োগ করতে পারবে না। অপর দিকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ করলে কম সময়ের মধ্যে তা নগদায়ন করা যাবে। এসব কারণে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগের দিকেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছে ব্যাংকগুলো।[১]

সরকারি ব্যাংকগুলো গত আট বছরে ৩ হাজার ৬৪৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা ঋণের সুদ মওকুফ করে দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সুদ মওকুফ করেছে সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক। সোনালী ব্যাংক ৮ বছরে ২১৫ ঋণ খেলাপির ৯৮৭ কোটি ৯৩ লাখ টাকা মওকুফ করেছে। জনতা ব্যাংক থেকে এ সুবিধা পেয়েছে ১১৭ জন এবং মওকুফ করা সুদের পরিমাণ ৬৫৫ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। অগ্রনী ব্যাংক ১১৫ জনের ৯৪৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা মওকুফ করেছে। রূপালী ব্যাংক করেছে ৫৬ জনের ১৮৩ কোটি ২৭ লাখ টাকা। বিশেষায়িত ব্যাংকের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৭০ জন ঋণ খেলাপির ২৫৯ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, শিল্প ব্যাংক ৬৩ জনের ৩২৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১০ জনের ১৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা, শিল্প ঋণ সংখ্যা ৪১ জনের ২৫৬ কোটি ৫ লাখ টাকা এবং বেসিক ব্যাংক ৬ ঋণ খেলাপির ১১ কোটি ৮০ লাখ টাকা মওকুফ করেছে।[২]

এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, বাংলাদেশে সুদ প্রচলিত থাকলেও এবং বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সুদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। বরং এর মাধ্যমে একটি বিশেষ শ্রেণী সকল সম্পদ কুক্ষিগত করছে। আর গরীব ও দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র হয়ে দেশে দারিদ্র্যসীমাকে কেবল সমৃদ্ধ করে চলেছে।

বাংলাদেশে সুদ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা

সুদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ও মানবতাবিরোধী। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) তাই অর্থনৈতিক লেনদেন সুদমুক্ত রাখার জন্যে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কঠোরভাবে সুদ নিষিদ্ধ করে আল্লাহ বলেছেন, "মুমিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।[৩]

সুদ প্রতিরোধের জন্যে সুদের কারবারিদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "মুমিনগণ, যদি তোমরা সত্যিই মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো। আর যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।[৪]

সুদ প্রতিরোধের জন্যে সুদকে হারাম ঘোষণার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা এর ভয়াবহ পরকালীন পরিণতিও জানিয়ে দিয়েছেন, "যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দাঁড়াবে যেমন দাঁড়ায় ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা বলেছে, ক্রয় বিক্রয়তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয় বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। তাই যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয় তারা জাহান্নামে যাবে।[৫]

---

[১] আশরাফুল ইসলাম, সরকারকে কম সুদে ঋণ দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনীহা, নয়া দিগন্ত, ৪ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.১৬ ও ১৫

[২] মনজুর আহমেদ ও শওকত হোসেন, আট বছরে ৩৬৪৪ কোটি টাকার সুদ মওকুফ, প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ.১

[৩] আল-কুর'আন, সূরা আলে ইমরান: ১৩০ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

[৪] সূরা বাকারা: ২৭৮–৭৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

[৫] الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ আল-কুর'আন, ২: ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সুদের ধ্বংসাত্মক পথ থেকে মুমিনদের বিরত রাখতে মহানবী (সা) সুদ এবং সুদ সংশ্লিষ্ট লোকদের ধ্বংস কামনা করেছেন। হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ (সা) যে সুদ খায়, যে সুদ দেয়, যে সুদের দলীল লেখে এবং যে দুজন সুদের সাক্ষী হয় তাদের লানত করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন, পাপী হওয়ার দিক থেকে তারা সমান।[১] অর্থাৎ সুদ গ্রহীতা ও দাতাই শুধু নয় বরং এর যে কোনো পর্যায়ের সহযোগীরাও সমান অপরাধী।

সুদ অত্যন্ত জঘন্য একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা। সুদের গুনাহের ভয়ঙ্করূপ আর বীভৎসতা তুলে ধরতে রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যত্র বলেছেন, "সুদের গুণাহের তিয়াত্তরটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতর স্তরটি হলো ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের মাকে বিয়ে করার সমান।[২] তিনি আরোবলেন, "সুদের গুণাহের সত্তরটি পর্যায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচের পর্যায়টি হলো নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।[৩]

অন্যত্র বলেছেন – "জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক পাপ।[৪]

বাংলাদেশের ধর্মভীরু সাধারণ মুসলিমদের নিকট যদি সুদের ভয়ঙ্কর পাপের এই বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে তারা এমনিতেই সুদ থেকে দূরে থাকবে। বাংলাদেশে 'সুদখোর' একটি গালি এবং এখনো গ্রামের ধর্মভীরু কৃষক বিশ্বাস করেন, ১০ জন সুদখোরের নাম লেখা কাগজ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত গরুর গলায় বেঁধে দিলে গরুর ঘা থেকে পোকা চলে যায়।[৫]

সুদের প্রতি দেশের ধর্মভীরু মানুষদের এ ঘৃণা ধর্মীয় বোধ, বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে কাজে লাগানো সম্ভব হবে বর্তমান বাংলাদেশেও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এ জন্য অর্থব্যবস্থা সুদমুক্ত হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে এ উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করবে তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিক সফলতা থেকে বিষয়টির ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে সুদভিত্তিক ও সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের শাখা বৃদ্ধির পাঁচ বছর মেয়াদী তথ্য[৬]

ব্যাংক	১৯৯৮ সালে শাখা সংখ্যা	২০০২ সালে শাখা সংখ্যা	২০০৭ সালে শাখা সংখ্যা
সোনালী ব্যাংক	১৩০৬	১১৮৬	১১৮৩
অগ্রনী ব্যাংক	৯০৩	৮৭২	৮৬৬
জনতা ব্যাংক	৮৯৬	৮৪৭	৮৪৮
রূপালী ব্যাংক	৫১৩	৪৯৩	৪৯২
পুবালী ব্যাংক	৩৫০	৩৫০	৩৬১
ইসলামী ব্যাংক	১১০	১৪১	১৮৬
আল-আরাফাহ	৩৫	৪০	৪৬
এসআইবি	১২	২৪	২৪
শাহজালাল	০	৮	২৬

[১] আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল বুয়ূ

[২] আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, আল-মুসতাদরাক, পূর্বোক্ত, পৃ.২১৯

[৩] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪১১ হিজরি, কিতাবুল বুয়ূ

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল বুয়ূ

[৫] এটি একটি সাধারণ জনশ্রুতি। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সাথে আলাপ করে এর সত্যতা জানা গেছে। বিশেষত শরীয়তপুর জেলায় বিভিন্ন থানার বয়স্ক কৃষকবৃন্দ এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

[৬] 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh, ibid, p.377

Dhaka University Institutional Repository

তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সুদভিত্তিক সরকারি ও প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর বিকাশের হার সুদমুক্ত ব্যাংকগুলোর চেয়ে অনেক কম। তবে এটি প্রকৃত চিত্র নয়। কারণ সরকার সুদভিত্তিক নীতিমালার কারণেই ইসলামি ব্যাংকসমূহকে বেশি শাখা খোলার অনুমতি দেয় না। সাধারণ অনুমতি দেয়া হলে, অন্ততঃ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে এদেশের মানুষ ইসলামি ব্যাংকিংই গ্রহণ করে নিত। সুদের ক্ষতি এবং সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে যথাযথভাবে জানানো সম্ভব হলে বাংলাদেশ থেকে সহজেই সুদ উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে।

ঘুষ

বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক অনাচার সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার মধ্যে সম্ভবত ঘুষ সবচেয়ে জঘন্য এবং সর্বাধিক ক্ষতিকর। এর অর্থ উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ bribe.[১] এর আরবি প্রতিশব্দ رِشْوَة (রিশওয়া)।[২] হাদীসেও ঘুষকে 'রিশওয়া' বলা হয়েছে। যে বস্তু বা বিষয় লাভের অধিকার ব্যক্তির নেই সে ব্যক্তি যদি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে কোনো কিছু দেয়ার মাধ্যমে সে অধিকার লাভ করে তাহলে তা ঘুষ বলে বিবেচিত হবে। ঘুষ শুধু অর্থের লেনদেন নয়, বরং অন্যায় সুবিধা নেয়ার জন্যে যা কিছুই দেয়া হোক তা ঘুষেরই অর্ন্তভূক্ত হবে। যেমন নগদ অর্থের বিনিময়ে চাকরি নেয়া, বিচারক বা পুলিশকে টাকা দিয়ে অপরাধী হওয়ার পরও মুক্তিলাভ, উপহারের নামে টিভি, ফ্রিজ বা এ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে অন্যায় সুবিধা নেয়া প্রভৃতি। এমনিভাবে কারো বৈধ অধিকার বা কাজ প্রয়োজনীয় টাকার চেয়ে বেশি টাকা নিয়ে করাও ঘুষ। যেমন ইচ্ছে করে টেলিফোন বিল উল্টোপাল্টা করে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা আদায়, বিভিন্ন ফাইল আটকে রেখে টাকা আদায়। এমনকি অন্যায় কোনো সুবিধা দিয়ে তার বিনিময়ে অন্যায় সুবিধা নেয়াও ঘুষের অন্তর্ভূক্ত। যেমন কারো ক্ষমতা আছে, সে তার দপ্তরে বা ক্ষমতাধীন ক্ষেত্রে কাউকে অন্যায়ভাবে চাকুরি দিল এই শর্তে যে, অন্য একজন আবার এর বিনিময়ে তার ক্ষমতাধীন এলাকায় বা দপ্তরে তার সুপারিশ রেখে একটি অন্যায় নিয়োগ প্রদান করবে।

বাংলাদেশে জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘুষের প্রচলন রয়েছে। সন্তান স্কুলে ভর্তি করাতে হলে স্কুল কমিটি বা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়, সন্তানের ভালো ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে ঘুষ দিতে হয়, স্কুল-কলেজ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট বা কাগজপত্র তুলতে ঘুষ দিতে হয়, শিক্ষাবোর্ডের প্রতিটি কাজে সংশ্লিষ্ট লোককে ঘুষ না দিলে ফাইল নড়ে না। দেশের সকল বিভাগে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের বিনিময়ে নিয়োগ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হাসপাতালের চিকিৎসক, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য, ব্যাংকার, ড্রাইভার, আইনবিদ, বিচারক এমনকি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগেও এদেশে ঘুষের লেনদেন হয়। দলীয় পরিচয় বা ময়দানে ভূমিকা যা-ই থাক, বড় দলের নির্বাচনী মনোনয়ন পাওয়ার জন্যও এখন দলীয় ফান্ডে অনুদানের নামে বড় অংকের ঘুষ দিতে হয়। চিকিৎসের চিকিৎসা পেতে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেবা পেতে, শিক্ষকের মনোযোগ পেতে, নিজের মালিকানাধীন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দরকারি কাগজটি পেতে নামে-বেনামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘুষ আমাদের দিতেই হয়। অফিসে, আদালতে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে এমনকি খেলাধুলায় বাংলাদেশে ঘুষ লেনদেনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। ঘুষ দিলে রাস্তায় বা নদীতে চলাচলের অযোগ্য পরিবহণ ফিটনেস সার্টিফিকেট পাবে আর না দিলে সদ্য আমদানী করা ব্রান্ড নিউ কার বা পরিবহণও সিস্টেমে ধরা খাবে। ঘুষ না দেয় একটি ট্রাক নগরে ঢুকতে পারবে না। ঘুষ দিতে না চাইলে অযথাই

[১] ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯

[২] আল-কাওসার, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়রানির শিকার হতে হবে। জনগণের অধিকার ফি দিয়ে পাসপোর্ট পাওয়া। বাংলাদেশে তদন্তকারী পুলিশ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কাউকে ঘুষ না দিয়ে বৈধ কাজও উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সবমিলিয়ে বাংলাদেশ ঘুষখোরদের অভায়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।[১]

বাংলাদেশে ঘুষের প্রভাব

ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে কিছু লোক আর্থিকভাবে লাভবান হয় সত্য। কিছু কিছু লোক আলাদীনের চেরাগ[২] এই ঘুষের প্রভাবে হঠাৎ বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক বনে যায় এটাও সত্য। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর সূত্রে জানা যায়, এই ঘুষের প্রভাবেই বাংলাদেশে গ্যাস-বিদ্যুত-টেলিফোনের সাধারণ লাইনম্যান, মিটার রিটার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রাজধানীতে প্রাসাদোপম একাধিক বাড়ির মালিক হয়েছেন। এসবই সত্য। কিন্তু এটি ঘুষের আর্থিক প্রভাবের একটি মাত্র দিক এবং অবশ্যই এটি প্রশংসার্হ বা গ্রহণীয় কোনো দিক নয়। অবশ্য ঘুষখোর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে এটি ইতিবাচক দিকই বটে (!)। ঘুষের ইতিবাচক (?) এই একটি দিক বাদ দিলে বাংলাদেশে ঘুষের অসংখ্য নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

১। **আমানতের খিয়ানত:** মানুষ যে দায়িত্বে নিয়োজিত সেই দায়িত্ব ও ক্ষমতা তার নিকট আল্লাহর আমানত। ঘুষ নিলে মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। সে ঘুষ দেয়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেয়। এতে তাকে দায়িত্বশীলতার যে আমানত দেয়া হয়েছে তার খিয়ানত করা হয়। আবার যে ঘুষ দিয়ে চাকুরি বা অন্যকোনো কাজের দায়িত্ব নেয় তারপক্ষেও ঠিকমতো কাজ করা সম্ভব হয় না। সে খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারীর মতো কাজ করে। ঘুষের দাপটে সবকিছুকে অধীনস্থ বা আওতাধীন ভেবে নিয়ে কাজ করে। তাছাড়া ঘুষ দিয়ে চাকুরি বা কাজ নেয়া হয় বলে ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকে চাকুরি বা কাজটি থেকে প্রথমেই ঘুষের অর্থ তুলে নেয়া, তারপর নিয়মতান্ত্রিক মুনাফা করা। ফলে সে যথাযথভাবে কাজটি করে না। আবার ঘুষদাতার এই অনিয়মের কথা জানার পরও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ তিনি নিজে ঘুষ গ্রহণ করে কাজ দিয়েছেন বলে সঠিকভাবে তদারকি করা সম্ভব হয় না। ফলে দু পক্ষই দায়িত্বে অবহেলা করে। তারা তাদের কাছে প্রদত্ত আমানত নিদারুন অবহেলায় নষ্ট করে।

২। **অধিকার হরণ:** ঘুষ মানুষের অধিকার নষ্ট করে। ঘুষের মাধ্যমে মানুষ এমন কাজ করে বা এমন বিষয় লাভ করে স্বাভাবিকভাবে যা করার যোগ্যতা তার নেই বা যা পাওয়ার আরো বেশি যোগ্য লোক আছে। এর ফলে যোগ্য লোকদের অধিকার হরণ করা হয়। যেমন যে শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার মত মেধা রয়েছে ঘুষ না দেয়ার কারণে সে ভর্তি হতে পারছে না। যে লোকের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার ঘুষ না দেয়ার কারণে তাকে সেবা বঞ্চিত করা। যে লোকের দরকারি কাগজগুলো পাওয়া নিরাপত্তা লাভের অধিকার, ঘুষ না দেয়ার কারণে তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। টেন্ডারে সবচেয়ে নিম্নতম দরদাতাকে কাজ না দেয়া অথবা পূর্বাহ্নেই সংশ্লিষ্ট ঘুষদাতাকে সর্বনিম্ন দর জানিয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে যোগ্য দরদাতাকে বঞ্চিত করা। বস্তুত ঘুষ লেনদেন এক্ষান্তভাবে যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে অধিকার দেয়ার জন্যই হয়ে থাকে। কারণ যে ব্যক্তি যোগ্য সে কখনো ঘুষ দিয়ে কোনোকিছু অর্জনের চেষ্টা করে না। সবসময় অযোগ্য লোকেই এ চেষ্টা করে। আর এভাবে তারা যখন সফল হয় তখন সাধারণভাবেই যোগ্য লোককে বঞ্চিত করা হয়।

৩। **হয়রানি:** ঘুষের জন্যে কর্মকর্তা বা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ সাধারণ লোকদের অযথা হয়রানি করে। তারা ঘুষের জন্যে ফাইল আটকে রাখে। অসঙ্গত চাপ প্রয়োগ করে বা অন্যায় ভয় দেখায়। হয়রানি করা ছাড়া সাধারণত কেউই ঘুষের এই অন্যায়

---

[১] বাংলাদেশে ঘুষ দেয়া ও নেয়ার এই চিত্র ওপেন সিক্রেট। সরকারের উচ্চমহলও এ সম্পর্কে জানেন কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান সরকারের মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন, "ঘুষ খেয়ে যারা কাজ করে দেন, তারা সৎ কর্মকর্তা। আর যারা কাজ করেন না, তারা অসৎ কর্মকর্তা। (প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

[২] বিশ্ববিখ্যাত আরবীয় রূপকথা আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আলাদীনের চেরাগ। ভাগ্যবান আলাদীন এই চেরাগ লাভ করেন এবং এতে লুকোনো দৈত্যের সৌজন্যে তার অপূর্ণ সকল ইচ্ছা নিমিষেই পূরণ করতে পারেন। বাংলাদেশে ঘুষখোরদের হঠাৎ বিত্তবান হওয়া দেখে মনে হয় তারা হয়তো আলাদীনের চেরাগই লাভ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

লেনদেন করে না। যে জন্য ঘুষখোর ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে সবসময় হয়রানির মধ্যে রাখে। সহজ একটি কাজও সহজভাবে করে দেয় না। ঘুরিয়ে পেচিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করে যে, মানুষ ঘুষ দেয়াকেই বেশি নিরাপদ মনে করে। বাংলাদেশে ঘুষ দিয়ে কাজের বরাদ্দ নিতে হয় এমনকি বিল নিতেও ঘুষ দিতে হয়।

৪। **মানুষের ক্ষতি:** ঘুষ বিভিন্নভাবে মানুষের ক্ষতি করে। ঘুষ নিয়ে ত্রুটিযুক্ত গাড়ি চলাচলের অনুমতি দিলে দুর্ঘটনা ঘটে। ভেজাল ও মানহীন পণ্য বাজারজাত করার অনুমতি দিলে জাতীয় স্বার্থ ও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হয়। ঘুষ নিয়ে অযোগ্য লোককে চাকরি দিলে শিক্ষায়-প্রশাসনে অনিয়ম স্থায়ী রূপ পায়। সাধারণ বিবেক থেকেই বুঝা যায়, ভালো কাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বা ভালো কোনো পণ্য বিপণনের জন্য ঘুষ দিতে হয় না। ঘুষ দিতে হয় খারাপ ও মানহীন পণ্য বা বিষয় প্রচলনের জন্য। তাই ঘুষ যখন এ সকল বিষয়ের প্রচলন অব্যাহত রাখবে তখন তা মানুষের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ না হয়ে পারবে না। সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের দেয়া তথ্যমতে প্রতিদিন নৌপথে সহস্রাধিক ঝুঁকিপূর্ণ লঞ্চ চলাচল করছে।[১] সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ লঞ্চগুলোকে সার্ভে সনদ দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে[২] যা লাখ লাখ যাত্রীর জীবন সংহারের উন্মুক্ত ঘোষণাপত্র মাত্র।

৫। **সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি:** বাংলাদেশে ঘুষ সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঘুষ নিয়ে অপরাধী ও সন্ত্রাসীকে মুক্তি দিলে অপরাধ বেড়ে যায়। ঘুষ দিয়ে যা খুশি তা করতে দিলে বিত্তশালীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সমাজে মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করে অর্থ সম্পদের অন্যায় দাপট। ফলে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যাদের অর্থ আছে তারা আইন, শৃঙ্খলা, মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতাকে অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতা পোষণ করে। কারণ ঘুষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা কর্মকর্তাদের এমনকি রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের কিনে নেয়ার দৃষ্টান্তও বাংলাদেশে রয়েছে।

৬। **সামাজিক অপরাধ ও অপব্যয় বৃদ্ধি:** ঘুষ নানা রকম সামাজিক অপরাধের মূল কারণ। ঘুষ গ্রহীতা প্রায় অনায়াসে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হয়। এই টাকা সে বেহিসেবী খরচ করে। মদ্যপান, জুয়াখেলা ও অন্যান্য অশালীন কাজে লিপ্ত হয়। ঘুষ দিয়ে কোনো দায়িত্ব বা কাজ পেলে সেই কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করে না। তার প্রথম লক্ষ্য হয় ঘুষসহ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা। ফলে একদিকে যেমন বাড়ে অপচয় অন্যদিকে তেমনি অপরাধের মাত্রাও বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ঘুষ সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির মূল প্রেরণা। কষ্টে মানুষ যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে সে টাকা অন্যায় পথে ব্যয় করা যায় না। সে টাকায় মদ কিনে খাওয়া বা অশালীন কাজে ব্যয় করার মানসিকতা এখনো বাংলাদেশের মানুষের হয়নি। কেবল ঘুষ বা অন্যায় পথের টাকাই এ পথে ব্যয় হয়ে থাকে। এ পথের টাকাই ব্যয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো ধরনের হিসাবের ধার ধারে না। ঘুষ আদান প্রদানের মাধ্যমে ইচ্ছামাফিক সম্পদ লেনদেন হয়। এতে ন্যায় অন্যায়ের তোয়াক্কা করা হয় না। যে বেশি ঘুষ দেয় তার অনুকূলে থাকে প্রশাসন। এভাবে মানুষ তার প্রকৃত অধিকার অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ঘুষের কারণে সাধারণ মানুষের সম্পদ অত্যন্ত অমানবিক ও অন্যায্যভাবে ঘুষখোর আত্মসাত করে। ঘুষে অন্যের অধিকার ও সম্পদ আত্মসাতের দুটি ভয়ঙ্কর গুনাহ সংঘটিত হয়। তাছাড়া ঘুষের লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের জমি নিজের নামে, অন্যের শেয়ারে নিজের নামজারি করিয়ে নেয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। ঘুষের মাধ্যমেই এসকল অপকর্ম হয়ে থাকে।

ঘুষ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা

বাংলাদেশে ঘুষ একটি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। লেনদেনের এমন কোনো পর্যায় নেই, সামাজিক আচরণের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ঘুষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য একান্তভাবে ঘুষ সম্পর্কিত ইসলামি বিধান বাস্তবায়ন আবশ্যক। এ জন্য বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি বিধান কার্যকর না থাকলেও অসুবিধা নেই। কারণ ইসলামে সুদ

[১] মোহাম্মদ আবু তালেব, নৌপথে সহস্রাধিক ঝুঁকিপূর্ণ লঞ্চ, ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে তা নিষিদ্ধ না হওয়ার জন্য ইসলামি বিধান কাজে লাগিয়ে সুদ নির্মূল করা অনেকখানিই অসম্ভব। কিন্তু ঘুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তেমন নয়। কারণ ইসলামে যেমন ঘুষ নিষিদ্ধ বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও তেমনি ঘুষ নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে যদি যথাযথভাবে ইসলামি আবেগ তৈরি করা যায় এবং প্রচলিত আইনের সাথে সাথে ইসলামি বিধান কার্যকর করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই ঘুষ প্রতিরোধ সম্ভব। আর যদি পুরোপুরি ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে ঘুষ প্রতিরোধের জন্য অন্য কোনো আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে না। বরং ইসলামে যে আইন রয়েছে সে আইনেই ঘুষ পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে।

অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ঘুষ একটি পন্থা। ইসলাম এ পন্থায় উপার্জনকে হারাম করেছে। একজন মুমিনের জন্য ঘুষ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে ঘুষকে হারাম করার এই নির্দেশই যথেষ্ট। কারণ হারাম ভাবে উপার্জিত জীবিকায় যে দেহ পুষ্ট হয় তার স্থান জাহান্নাম এবং হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত কবুল হয় না।[১] তারউপর মহান আল্লাহ ও তাঁর নবীর পক্ষ থেকে ঘুষের লেনদেন না করার জন্য মুমিনদেরকে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘুষ দেয়া আর ঈমান আনাকে একত্রিত না করতে বলেছে। বিভিন্নভাবে মানুষকে ঘুষ না নেয়া ও না দেয়া এবং ঘুষ বিরুদ্ধ পরিবেশ তৈরির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

আল্লাহ বলেন, (হে মুমিনগণ!) তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না এবং জেনেশুনে মানুষের সম্পদের অংশবিশেষ (বা পুরো সম্পদ) অন্যায়ভাবে আত্মসাতের জন্য বিচারকদের কাছে পেশ করো না।[২]

আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণার একটি অর্থ হলো, শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অবৈধ উপায়ে স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করো না। আর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তোমরা নিজেরাই যখন জান যে, ইহা অপরের সম্পদ, তখন তার নিকট তার নিজ মালিকানার কোনো প্রমাণ না থাকায় সুযোগে কিংবা কোনো কলা-কৌশলের সাহায্যে তোমরা তা হস্তগত করতে পার; কেবল এ কারণে আদালতে উহার মোকদ্দমা নিয়ে যেয়ো না। কেননা মামলার ধারাবিবরণী অনুযায়ী বিচারক এই সম্পদ তোমাকে দিয়েও দিতে পারে কিন্তু বিচারকের এই রায় ভুল বিবরণীর ভিত্তিতে প্রতারিত হওয়ারই ফল হবে। এ জন্য আদালত হতে উহার মালিকানা অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তুমি উহার সঙ্গত মালিক হতে পার না। খোদার দরবারে উহা তোমার জন্য হারাম হয়ে রয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে নবী (সা) ঘোষণা করেছেন: "আমি একজন মানুষ বইতো কিছুই নই। তোমরা হয়তো কোনো মোকদ্দমা আমার সম্মুখে পেশ করবে, আর তোমাদের মধ্যে একটি পক্ষ অধিকতর চতুর ও বাকপটু এবং তার যুক্তিমূলক কথাবার্তা শুনে হয়তো আমি তার পক্ষেই রায় দিতে পারি; কিন্তু এই কথা মনে রেখ যে, কোনো ভাইয়ের হক যদি এই ধরনের মোকদ্দমায় আমার ফয়সালার ভিত্তিতে হাসিল করে নাও, তবে তার ফলে দোযখের একটি খণ্ডই তোমাদের হাসিল করা।[৩]

ঘুষের সম্পদ হারাম ও অপবিত্র। পরিমাণে তা যতোই বেশি হোক এবং তার চাকচিক্য যতোই প্রবল হোক মুমিনদের দায়িত্ব হলো তাতে প্রভাবিত না হওয়া। তার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ না করা। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "বলুন মুহাম্মদ (সা)! হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের অধিক্য তোমাদের বিস্মিত করে।[৪]

---

[১] রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "হালাল উপার্জন করা ফরযের চেয়েও ফরয।" অন্যত্র ঘোষণা করেছেন, "যে দেহ হারাম জীবিকা দ্বারা তৈরি হয়েছে বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, জাহান্নামই তার যোগ্য আবাস।" আরো বলেছেন, "লোকেরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হজের জন্য মক্কায় আগমন করে। তাদের শরীর বিধ্বস্ত ও ধূলি ধূসরিত। সে অবস্থাতেই তারা আল্লাহর কাছে হাত তুলে মুনাজাত করতে থাকে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! কিন্তু তাদের আহ্বান আল্লাহ শুনবেন কেন? হারাম জীবিকার জন্য তাদের পোশাক অপবিত্র, তাদের রক্ত অপবিত্র। (মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব)

[২] আল-কুর'আন, ২: ১৮৮ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

[৩] انما انا بشر وانتم تختصمون الى ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحوما اسمع منه فمن قضيت له بشئ من حق اخيه- فانما اقضى له قطعة من النار সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুর'আন, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৪৪

[৪] আল-কুর'আন, ৫: ১০০ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামতে ঘুষ গ্রহীতার জন্যে লজ্জাজনক পরিণতি রয়েছে। তারা যে ঘুষ গ্রহণ করবে তা নিয়ে তাদেরকে কিয়ামতে দাঁড়াতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! ব্যক্তি যা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়েই উপস্থিত হবে। যদি গাধা গ্রহণ করে থাকে গাধা চিৎকার করতে থাকবে। যদি গাভী গ্রহণ করে থাকে গাভী চিৎকার করতে থাকবে।[১]

আখিরাতে ঘুষখোর চিরকালীন ব্যর্থতা বরণ করে নিতে বাধ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার জন্যে জাহান্নামের অঙ্গীকার করেছেন। বলেছেন, "ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামী।[২] মি'রাজের অলৌকিক সফরে মহানবী (স) স্বয়ং ঘুষখোরদের ভয়ানক পরিণতি প্রত্যক্ষ করে এসেছেন।[৩]

এভাবে ঘুষ হারাম করে এবং ঘুষের জন্যে পৃথিবীতে অসম্মান ও পরকালের চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ঘুষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছে। তারপরও কেউ যদি ঘুষের লেনদেন করে তাহলে অপরাধের ধরন, প্রকৃতি ও ঘুষের পরিমাণ বিবেচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘুষখোরের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ করে, তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করেও ঘুষ বন্ধ করা যায়। বাংলাদেশের মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ঘুষখোরের সাথে কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখবে না এবং নতুন করে কোনো আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধও হবে না; তাহলে সামাজিকভাবেই ঘুষ প্রতিহত হয়ে যাবে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলাদেশে বরং এর উল্টো চিত্রই দেখা যায়। কন্যাপক্ষ বা কন্যা নিজে জানেন যে, একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা যে ক্যাডারেরই হোন না কেনো, তাদের বেতন সমান। তাসত্ত্বেও তাদের নিকট পুলিশ, করো কমিশনার, মেজিস্ট্রেটসহ এমন ক্যাডারগুলো বেশি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে যেখানে ঘুষের সুযোগ বেশি। ইসলাম ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা, শাস্তির ভয় এবং ধর্মীয় প্রকৃত আবেগ যথাযথভাবে জাগ্রত করা ছাড়া তাই এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্ভব নয়।

চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাই

চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই অর্থ সম্পর্কীয় সামাজিক সমস্যা। কিন্তু প্রায়ই চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে খুন ও জখমের ঘটনা ঘটে। শ্লীলতাহানির খবরও প্রায়শ পাওয়া যায়। চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাই তাই কেবল অর্থ সম্পর্কীয় সামাজিক সমস্যা নয় বরং এগুলো হলো সমন্বিত সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশে এ তিনটি বিষয়ই অত্যন্ত প্রবল ও আশঙ্কাজনকভাবে প্রচলিত রয়েছে।

গোপনভাবে, অন্যকে না দেখিয়ে পরের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করাই হলো চুরি। অন্যদের কথাবার্তা তাদের অজ্ঞাতসারে শ্রবণ করাকে বলা হয় চুরি করে শোনা। অন্যকে না জানিয়ে তাকে দেখা হচ্ছে চুরি করে দেখা।[৪] সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ত করাকে চুরি বলে।[৫] শরীআতের পরিভাষায়, কোনো মুকাল্লাফ (বালিগ[৬] ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন) কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলভুক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে চুরি বলে।[৭]

---

[১] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[২] الراشى والمرتشى كلاهما فى النار তাখরীজ, উদ্ধৃতি: মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২৪

[৩] এ সম্পর্কিত বেশ কিছু বর্ণনা সহীহ হাদীস সংকলনসমূহে লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য বর্ণনায় মূল বিষয় হলো, ঘুষ থেকে বেঁচে না থাকলে আখিরাতে ভীষণ ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। কোনো অজুহাতেই নিজেকে রক্ষা করা যাবে না।

[৪] মুহাম্মদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ইফাবা, মে ২০০৭, পৃ.২৪৫

[৫] আবূ বকর মুহাম্মদ আল-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ৯, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, পৃ.১৩৩

[৬] ইসলামি শরীআতে নর-নারীর বালিগ হওয়ার সাথে বয়সের সম্পর্ক কম। সাধারণত পুরুষের স্বপ্নদোষ এবং নারীর ঋতুস্রাব শুরু হলে তাদেরকে বালিগ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তবে অনুহ্যতা বা দেহগত গঠন ও ভৌগোলিক প্রভাবে স্বপ্নদোষ ও ঋতুস্রাব বিলম্বিত হলে সাধারণত ১২ বছরের পর থেকে নর-নারীকে বালিগ হিসেবে গণ্য করার বিধান রয়েছে।

[৭] আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খণ্ড ২৪, ওয়ামারাতুল আওকাফ ওয়াল শুয়ূন আল-ইসলামিয়া, কুয়েত ১৯৯৫, পৃ.২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ডাকাতি ও ছিনতাই হয়ে থাকে সশস্ত্র অবস্থায়। দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নেয়াই ডাকাতি ও ছিনতাই। সশস্ত্র ডাকাতি ও ছিনতাই-লুণ্ঠনকে আরবিতে حرابة (হিরাবাহ) বলা হয়। আরবিতে লুটতরাজ ও ডাকাতি প্রভৃতি শব্দও ডাকাতি ও ছিনতাই বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১] হিরাবাহ'র আভিধানিক অর্থ যুদ্ধ কিংবা লুণ্ঠন ও অপহরণ।[২] শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ হলো, কারো সম্পদ অর্জন করা কিংবা কাউকে হত্যা করা বা কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা[৩] অথবা ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে দাপটের সাথে কারো উপর চড়াও হওয়া।[৪] অধিকাংশ ইমামের মতে, এ রূপ আক্রমণ যেখানেই হোক, চাই তা শহর-নগর-গ্রাম-জনপদে হোক বা নির্জন পথে-ঘাটে কিংবা মাঠে-ময়দানে হোক, তা হিরাবাহ বা ডাকাতি বলে গণ্য হবে।[৫] উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায়, ডাকাতি ও ছিনতাই বলে গণ্য হবে নিম্নের কাজগুলো যদি-

ক) কারো সম্পদ ছিনতাই বা কাউকে হত্যা বা কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হওয়া হয়; যদিও তারা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে বা ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করতে বা কাউকে হত্যা করতে সক্ষম না হয়;

খ) কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যা করা বা মারধর করা কিন্তু সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়নি;

গ) কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যাও করেনি কিংবা মারধরও করেনি; তবে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে এবং

ঘ) সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কারো সম্পদও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কাউকে হত্যাও করেছে কিংবা মারধর করেছে অথবা মারধর ছাড়াই শুধু সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে।[৬]

হিরাবাহকে বড় চুরিও বলা হয়। কারণ দেশের সর্বত্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ডাকাত ও ছিনতাইকারীরা সরকারের অগোচরেই মানুষের সম্পদ নষ্ট করে। বড় চুরি বলার কারণ হলো, এর অপকারিতা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সর্বসাধারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৭]

বাংলাদেশে চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের প্রভাব

চুরি করে যে সফল হয় সেই চোর আর্থিকভাবে সফলতা লাভ করে। একই ধরনের লাভবান হয় ডাকাত ও ছিনতাইকারী। কিন্তু এ লাভই খুবই স্থূল এবং সামান্য। কারণ বাংলাদেশে চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের কারণে সকল মানুষের জীবনেই নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে যা থেকে এমনকি চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীরাও মুক্ত নয়। যেমন,

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯

[২] আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, খণ্ড ১, দারু সাদির, বৈরুত, পৃ.৩০৪

[৩] হাম্বলীগণের মতে, কেবল সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে কারো উপর সশস্ত্র চড়াও হওয়াকে হিরাবাহ বলা হয়। তবে শাফিঈ ও মালিকী ইমামগণ সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেননি। বরং কাউকে হত্যা করা কিংবা কারো ইজ্জত আব্রু নষ্ট করা অথবা পথ-ঘাট বন্ধ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ত্রাস সৃষ্টি করা প্রভৃতি অপরাধও হিরাবাহ'র পর্যায়ভুক্ত। পরবর্তীকালের হানাফীগণও সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেননি। (ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯)

[৪] সুলায়মান আল-বাজী, আল-মুন্তাকা শরহুল মুয়াত্তা, খণ্ড ৭, দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত, পৃ.১৬৯

[৫] ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে, কেবল জনপদের বাইরে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতিই কেবল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (আল-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.২০১-২, মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবনু কুদামা, আল-মুগনী খণ্ড ৯, দারু ইহয়া'ইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, পৃ.১২৪)

[৬] মুহাম্মদ আল-বাবরতী, আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, খণ্ড ৫, দারুল ফিকর, কুয়েত, পৃ.৪২৪-২৬; কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়া, খণ্ড ৫, দারুল ফিকর, কুয়েত, পৃ.৪২৩-২৪

[৭] উসমান যায়ল'ঈ, তাবয়ীনুল হাকাইক শারহু কানযিদ দাকাইক, খণ্ড ৩, দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত, পৃ.২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চুরি, ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের মাধ্যমে অপরের মালিকানাভূক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করা হয়। এতে সম্পদের ওপর ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ হয়। অপরের অধিকার হরণ করা হারাম এবং তা আরো অনেক ধরনের অপরাধ জন্ম নেয়ার কারণ। চুরি-ডাকাতির জন্যে ঘরে এবং ছিনতাইয়ের জন্যে বাইরে মানুষ নিদারুণ নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। এতে তার ধন-সম্পদ হুমকির সম্মুখীন হয়। চোর, ডাকাত বা ছিনতাইকারী অবস্থা বেগতিক দেখলে বা মালিক সম্পদ দিতে দেরী করলে নানা রকম নির্যাতন করে। ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কায় তারা খুনও করে। ফলে ঘরে বাইরে মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। ছিনতাইকারী, ডাকাত এবং চোরেরও জীবন সংশয় ঘটে। প্রায়ই খবর দেখা যায়, গণধোলাইয়ে ছিনতাইকারী বা ডাকাত কিংবা চোর নিহত। এমনকি চোর সন্দেহে পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলার ঘটনাও বিরল নয়।[১]

চোর যখন চুরি করে কোনোকিছুই বাছবিচার করে না। এ প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত বাংলা গান রয়েছে, "চোর যদি যায় শশুড়বাড়ি, সুযোগ পাইলে করে চুরি। বাংলাদেশে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই প্রচলিত থাকায় সহকারী এটর্নি জেনারেল থেকে সাধারণ মানুষ কেউ-ই এর হাত থেকে কেউ-ই রেহাই পাচ্ছে না।[২] জনগণের বৈদ্যুতিক সুবিধার জন্য সরকারিভাবে স্থাপিত ট্রান্সফরমারেরও একই রকম ভাগ্য বরণ করে নিতে হচ্ছে।[৩] প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে ছিনতাই করা হচ্ছে।[৪] বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজনে বাংলাদেশে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই নতুন নতুন মাত্রা পায়। অজ্ঞান পার্টি[৫] মলম পার্টি নানাভাবে তাদের কার্যোদ্ধার করে। শহরের বিভিন্ন কোম্পানির ট্যাক্সিক্যাব চালকবৃন্দ ছিনতাইকারীদের সাথে সখ্যতা গড়ে এ ক্ষেত্রে নানামুখী ছিনতাই কাজে অংশ নিয়ে থাকে। চোরের উপদ্রব বাড়লে মানুষ শান্তিতে ঘুমুতে পারে না। দিনে গুলি-ছিনতাই, রাতে চুরি[৬] মানুষের শান্তি, স্বস্তিঃ ও সমৃদ্ধি পুরোপুরি বিনষ্ট করে।

বাংলাদেশের চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা

চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাই অত্যন্ত বড় রকমের অপরাধ। এর মধ্যে ডাকাতি ও ছিনতাই চুরির চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ। পরকালীন শাস্তির অঙ্গীকার ছাড়াও এই অমানবিক অপরাধগুলো প্রতিরোধের জন্যে ইসলাম পার্থিব দণ্ডবিধানের আদেশ দিয়েছে। বাহ্যত এ আদেশগুলো কোনো কোনো অতি মানবিক গোষ্ঠীর কাছে অমানবিক মনে হলেও – সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কেননা শরীরের কোনো অঙ্গে যদি নিরাময় অযোগ্য ক্যান্সার হয় তাহলে আক্রান্ত অঙ্গের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে তাকে না কাটা পুরো শরীরকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা মাত্র। এ ক্ষেত্রে শরীরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার নিদর্শন হতে পারে আক্রান্ত হাত কেটে ফেলা। কেননা এতেই একমাত্র পুরো শরীর বাঁচানো সম্ভব হবে।

তাই চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিরোধে ইসলামের দণ্ডবিধান কার্যকরা করা হলে যেহেতু পুরো মানবসমাজ রক্ষা পাবে তাই এ বিধান কার্যকরা করাই হলো প্রকৃত মানবতাবোধ। আর ইসলাম প্রদত্ত শাস্তি কার্যকর করতে হলে আগে ইসলামি আইন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে চুরি বা অন্য যে কোনো দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে ইসলামি আইন কার্যকর করা যাবে না। তবে বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম অধ্যুসিত দেশ এবং চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই যেহেতু বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা সে কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামি আইন বলবত না থাকলেও কেবল চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে ইসলামি আইন বজায় রেখে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও স্বস্তি লাভ সম্ভব।

---

[১] প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১৫

[২] সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৩] প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.১২

[৪] প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ৩

[৫] নজরুল ইসলাম, ঈদ সামনে রেখে বেড়েছে অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা ঃ দুই দিনে খপ্পরে পড়েছে ১৪ জন, প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.২

[৬] প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

চুরি এবং ছিনতাই ও ডাকাতির মাধ্যমে যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা হয় তা হারাম। এর সাথে সাথে ত্রাস সৃষ্টি করা বা মানুষ হত্যা করার যে ঘটনা ঘটানো হয় তাও হারাম। বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে হারাম থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হলে লোকেরা নিজেদেরকে এ সকল অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতো। কারণ কুর'আন মজীদে খুব স্পষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, "মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। তবে তোমরা যদি পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসায় করো, তা করা তোমাদের জন্য হালাল হবে। তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসীম দয়ালু।[১]

চুরি না করা, চুরি করতে না দেয়া, ছিনতাই ও ডাকাতি থেকে বেঁচে থাকা, নিজে ছিনতাই ও ডাকাতিতে জড়িত না হওয়া মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। কোথাও ডাকাতি-ছিনতাই-চুরির ঘটনা ঘটলে ঈমানের অনিবার্য দাবি, তা প্রতিরোধ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যখন কোনো লোক কোনো মূল্যবান জিনিস ছিনিয়ে নেয় আর লোকেরা তা চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তখন সে আর মুমিন থাকে না।[২] তাই বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি, ছিনতাই ও ডাকাতির বিরুদ্ধে ঈমানী এই চেতনা জাগ্রত করা সম্ভব হলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

চুরি এবং ডাকাতি ও ছিনতাইকৃত উপার্জন হারাম হওয়ার কারণে এ পথের উপার্জনকারীদের ইবাদত কবুল হয় না। জীবিকা হারাম হওয়ার কারণে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নির্ধারিত হয় জাহান্নাম। ঈমান আনা কোনো ব্যক্তি যার আখিরাতে বিশ্বাস আছে তার মধ্যে যদি দৃঢ়তা ও সঠিক শিক্ষার সাথে এ বিষয়গুলোর চেতনা সজিব করে তোলা যায় তাহলে তারপক্ষে আর ছিনতাই, ডাকাতি ও চুরিতে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হবে না।

আখিরাতে শাস্তি এবং হারাম উপার্জনের মন্দ পরিণামের চিন্তাও যাকে চুরি, ডাকাতি বা ছিনতাই থেকে দূরে রাখতে পারে না, ইসলাম সে ব্যক্তির জন্য নানা রকম পার্থিব শাস্তিরও ব্যবস্থা রেখেছে। যেমন,

চুরি

চুরির শাস্তি হলো হাত কাটা। এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সম্পূর্ণ একমত।[৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন: "পুরুষ চোর ও মহিলা চোরের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি।[৪] তবে হাত কতটুকু কাটতে হবে, কীভাবে কাটতে হবে এবং কোন হাত কাটতে হবে, এ সকল বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে।

চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, প্রথমবারের চুরিতে ডান হাত কবজি থেকে কাটতে হবে।[৫] দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে ফেলতে হবে।[৬] আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। এরপর সে আবার চুরি করলে তার পা কেটে দাও।[৭] তবে তৃতীয়বার চুরি করলে কী শাস্তি দেয়া হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও কতিপয় হাম্বলী ইমামগণের মতে, তৃতীয়বারে চুরির শাস্তি হলো কারাগারে আটক রাখা।[৮]

---

[১] - সূরা নিসা: ২৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[২] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ ولاينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

[৩] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৫-০৬

[৪] আল-কুর'আন, ৫: ৩৮ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[৫] ড. আহমদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৮

[৬] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৫-০৬

[৭] আলী দাক্ব কুতনী, আস সুনান, দারুল মাআরিফাহ, বৈরুত ১৯৬৬, কিতাবুল হুদুদ

[৮] আস সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০-৪১; আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, খণ্ড ৭, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত, পৃ.৮৬-৮৭; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী খণ্ড ৯ পূর্বোক্ত, পৃ.১০৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

মালিকী ও শাফিঈ ইমামগণের মতে, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে ফেলতে হবে। তারপরও যদি চুরি করে তাহলে তাকে তাযীরের আওতায় কারাগারে বন্দি করে রাখা হবে।[১] তাদের দলীল রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস, "যখন চোর চুরি করে, তার হাত কেটে দাও। যদি পুনরায় চুরি করে তার পা কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে দাও। ফিরে আবারো চুরি করলে তার পা কেটে দাও।[২]

উল্লেখ্য যে, তৃতীয় এবং তার পরের চুরিগুলোর শাস্তি হদ্দ বা শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি হিসেবে নয় বরং তা তা'যীরের আওতায় কার্যকর হবে। হযরত আলী (রা) এক চোরকে তৃতীয়বার চুরির ক্ষেত্রে হাত-পা কাটার শাস্তির পরিবর্তে বেত্রাঘাত করেছিলেন।[৩]

ডাকাতি ও ছিনতাই

ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মধ্যে কেবল অর্থ ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটিই অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা ত্রাস সৃষ্টি করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের জীবন ও সম্ভ্রমহানি ঘটায়। সে জন্যে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের শাস্তি কার্যকর হবে। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দেশে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।[৪]

ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের ক্ষেত্রে আয়াতে ঘোষিত শাস্তিসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে ইমামগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। তবে শাস্তিগুলো অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে প্রয়োগ করা হবে না কি বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী এ শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি শাস্তি দেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

শাফিঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে এ শাস্তিসমূহের কোনো একটি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল, ধন-সম্পদও ছিনিয়ে নিল তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। আর যে কেবল হত্যা করলো, সম্পদ ছিনিয়ে নিল না, তাকে কেবল হত্যা করা হবে। আবার যে হত্যা করলো না তবে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিল তার ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে। আর যে লোক ত্রাস সৃষ্টি করলো কিন্তু হত্যা করলো না বা অর্থ-সম্পদও ছিনিয়ে নিল না, তাকে নির্বাসিত করা হবে। অপরদিকে হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, বিচারক এ চারটি শাস্তির যে কোনো একটি এ পর্যায়ের যে কোনো অপরাধে প্রয়োগ করতে পারবেন। কৃত অপরাধের দৃষ্টিতে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তা নির্ধারণ করবেন।[৫]

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কিংবা কারো কোনো ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়ার আগে কোনো ডাকাতকে গ্রেফতার করা হলে তাকে তাযীরের আওতায় যে কোনো উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার পর কারাবন্দি করে রাখা হবে, যে পর্যন্ত না সে বিতদ্ধ তওবাহ করবে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যদি নিসাব পরিমাণ কারো অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া হবে। যদি কেউ নিরপরাধ কাউকে হত্যা করে কিন্তু কোনো অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়নি তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড ঘটাল এবং অর্থ-সম্পদও অপহরণ করলো, তাহলে তার ব্যাপারে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি ইচ্ছা করলে প্রথমে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলবেন এরপর হত্যা করবেন অথবা শুধু

---

[১] মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, খণ্ড ৮, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, পৃ.৩৭১; ইমাম মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খণ্ড ৪, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত, পৃ.৫৩৯; আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-মাওয়াক, আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, খণ্ড ৮, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত, পৃ.৪১৪, ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৯-১০

[২] আলী দারু কুতনী, আল সুনান, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৩] আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪০-৪১, আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, খণ্ড ৭, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৬-৮৭

[৪] إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল-কুর'আন, ৫: ৩৩

[৫] দেখুন: মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, পূর্বোক্ত; ইমাম মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করবেন অথবা শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলবেন। তাঁর মতে, এ ধরনের গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে শুধু হত্যা করাই যথেষ্ট হবে না বরং এর সাথে হত্যা কিংবা শূলবিদ্ধকরণকে যোগ করতে হবে।[১]

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রমুখের মতে, এমতবস্থায় শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। হাত-পা কাটা হবে না।[২]

বস্তুত জাতীয় সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য যেমন তেমনি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্যও চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই থেকে বেঁচে থাকা এবং দেশকে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত আবশ্যক। ইসলামে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং দেশকে বাঁচিয়ে রাখার অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছে। এর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের অশেষ কল্যাণ।

---

[১] আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খণ্ড ২৪, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৪

[২] ড. আহমদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সমস্যা

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬২.৬৬ ভাগ লোক শিক্ষিত।[১] জনগণের শিক্ষার এই হার থাকার পরও শিক্ষা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। শুধু তাই নয় বরং আরো অসংখ্য সামাজিক সমস্যার কারণ। যে শিক্ষা মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোলে না, যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত করে না, মানুষের আত্মিক ও দৈহিক চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। একইভাবে বাস্তবতা ও প্রয়োজনের সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ শিক্ষাও শিক্ষা নয় বরং সমস্যা। বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এগুলো অনেক ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি।[২] সে কারণে বাংলাদেশে শিক্ষা একটি মুখ্য সামাজিক সমস্যা। এ অধ্যায়ে ইসলামি বিধানের আলোকে শিক্ষাসমস্যা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার নীতি ও কর্মকৌশল অনুসন্ধান করা হয়েছে।

শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষা

শিক্ষা মানে জ্ঞান চর্চা। দৃশ্যমান জীবকূলের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই জ্ঞান চর্চা প্রয়োজন। অন্যান্য জীবের জন্য সহজাত জ্ঞানই (সহজাত বুদ্ধি, সহজাত প্রবৃত্তি) যথেষ্ট। তাদেরকে মানুষের মত জ্ঞান চর্চা করতে হয় না। প্রয়োজন পড়ে না।[৩] ইসলামে শিক্ষা হলো আল্লাহর হুকুম-আহকাম অনুধাবন, তা মেনে চলার পন্থা লাভ এবং বাস্তবায়নে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপক প্রক্রিয়া, ইসলামি নীতিমালা, অনুশাসন ও বিধি মোতাবেক মানুষের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চরিত্র এবং মানসিক শক্তি বিকাশের প্রয়াস। আল্লাহকে চেনা-জানা, তাঁর নির্দেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানা, নবী-রাসূলদের জীবন পদ্ধতি অবহিত হওয়া এবং তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করার শিক্ষাই হলো ইসলামি শিক্ষা। এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় শিক্ষাই অন্তর্ভুক্ত।[৪] শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানব সত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা। এমন একটি লালন কর্মসূচী যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না আর কোনো একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।[৫] ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হলো ইসলাম শিক্ষা। অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় এবং যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার স্বীয় আত্মাকে ও মহান স্রষ্টাকে জানতে ও চিনতে পারে তাই হলো ইসলামি শিক্ষা।[৬]

আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানের আধার। মানুষকে তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতি দান করেছেন। ইসলামি শিক্ষা সেই জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশে সহযোগিতা করে। মানুষের আচরণ, চরিত্র ও কর্মদক্ষতাকে পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত করে। তাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ মানুষে পরিণত করে। সে অজানাকে জানে। অজ্ঞেয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তা শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।[৭] এ হিসেবে বলা যায়, ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই ইসলামি শিক্ষা। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। নিজের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সক্ষম হয়। সংশয়বাদীদের মত নিজের কাছে অর্থহীন সংশয়বাদী প্রশ্ন[৮] রেখে নিজেকে বিভ্রান্ত করে না।

---

[১] অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮, উদ্ধৃতি: সোলায়মান মোস্তফা কিরন, আজকের বিশ্ব, গ্রিনিয়ার পাবলিকেশন্স, ঢাকা ৩৬তম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ.১৩৯

[২] পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮, পৃ.৪০৭

[৩] এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ.৭

[৪] আবুল শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৭৪

[৫] মোঃ শামছুল আলম ও মোঃ জহিরুল ইসলাম, ইসলামের শিক্ষাদর্শন, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-জুন ২০০৭, পৃ.১০২

[৬] নূরুল ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, মাসিক পৃথিবী, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.৪১

[৭] عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ আল-কুর'আন, সূরা আলাক: ৫

[৮] সংশয়বাদীদের কাছে খুব জনপ্রিয় একটি হেয়ালিপূর্ণ জিজ্ঞাসা হলো, "প্রশ্ন করি নিজের কাছে, কে আমি? কোথায় ছিলাম? কোথায় যাবো?" কুর'আন মজিদে মহান আল্লাহ এ প্রশ্নের অসংখ্য উত্তর দিয়েছেন। সূরা বাকারায় খুব সংক্ষিপ্ত করে বলে দিয়েছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "নিশ্চয় আমি আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শিক্ষা সমস্যার প্রভাব

শিক্ষা সমস্যা বাংলাদেশকে আধুনিক বিশ্বের উন্নয়ন সূচক থেকে অনেক পিছিয়ে রেখেছে। এক সময় বাংলাদেশের চেয়েও অনুন্নত দেশ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান কেবল শিক্ষায় উন্নতি লাভের সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে এতটাই উন্নতি লাভ করেছে যে, এখন দেশগুলোকে শিল্পোন্নত দেশের সারিতেই স্থান দেয়া হয়। বাংলাদেশের ৬২.৬৬% ভাগ স্বাক্ষরতার বিপরীতে মাথাপিছু জি.ডি.পি যেখানে ৫৯৯ মার্কিন ডলার[১] সেখানে মালয়েশিয়ার স্বাক্ষরতার হার ৮৭% ভাগ, মাথাপিছু জি.ডি.পি ৯৮০০ মার্কিন ডলার, সিঙ্গাপুরের স্বাক্ষরতার হার ৯২.১% ভাগ, মাথাপিছু জি.ডি.পি ২২,৯০০ মার্কিন ডলার, থাইল্যান্ডের স্বাক্ষরতার হার ৯৫.৩% ভাগ, মাথাপিছু জি.ডি.পি ৬৯০০ মার্কিন ডলার, তাইওয়ানের স্বাক্ষরতার হার ৯৩% ভাগ, মাথাপিছু জি.ডি.পি ১৩৫১০ মার্কিন ডলার। এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত শ্রীলংকার স্বাক্ষরতার হার ৯১.৪% ভাগ হওয়ায় মাথাপিছু জি.ডি.পি ৩৬০০ মার্কিন ডলার হয়েছে বলেই প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

অশিক্ষা বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা সমস্যার অন্যতম কারণ। অশিক্ষার কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যা একটি বাস্তব সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষ এবং গ্রামের নিরক্ষর জনগোষ্ঠী নানা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কারণে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কোনো পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয়। অশিক্ষার প্রভাবে অদক্ষ, অক্ষম এবং দেশের জন্য বোঝা এমন একটি জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যা বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।[৩]

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। অশিক্ষা এই দারিদ্রতার প্রধান কারণ। অশিক্ষা লোকদের অদক্ষ, অসচেতন, অলস, অকর্মণ্য, পরনির্ভরশীল, অসচেতন এবং বেকার করে রাখে। এর ফলে দেশের জনশক্তি দেশের সম্পদের পরিবর্তে বোঝা এবং অভিশাপে পরিণত হয়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার অভাবে লোকেরা দরিদ্রতা লালন করে একে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়ে পরিণত করে রেখেছে। অশিক্ষা প্রশস্ত করে রেখেছে অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের রাজপথ।

যে কোনো ধরনের বেকারত্বের প্রধান কারণ অশিক্ষা। সুশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কাজের অভাব কখনই হয় না। হয়তো বিলম্ব হতে পারে কিন্তু শিক্ষিত লোক কাজ পাবেই। দেশে-বিদেশে তার কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে। অশিক্ষিত লোক কোনো কাজই করতে পারে না। কৃষিকাজ, ব্যবসায়, চাকুরিসহ যে কোনো কাজ সঠিক ভাবে করার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। বাংলাদেশে অশিক্ষিত লোকেরাই মূলত বেকারত্বের সমস্যা তৈরি করে রেখেছে। ইতোপূর্বে আমরা অশিক্ষার সংজ্ঞা ও সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলেছি, কর্মমুখী নয় বা মানুষকে কোনো কাজের উপযুক্ত করে না এমন শিক্ষাও অশিক্ষাই। এ হিসেবে বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষিত লোক মূলত অশিক্ষাই লাভ করে। তাদের শিক্ষা বাস্তবে কোনো কাজে লাগে না বলে কেরানীগিরির জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী লোকদের আবেদন করতে দেখা যায়।

পুষ্টিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি এবং স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ অশিক্ষা। অশিক্ষার কারণে লোকেরা পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবারের পরিবর্তে মুখরোচক এবং দামি খাবারের প্রতি অধিক আসক্তি প্রদর্শন করে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং স্বাস্থ্যসম্মত রাখার কোনো প্রেরণা পায় না। রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে না জানার কারণে অজ্ঞাতেই নানা রকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং অন্যকেও আক্রান্ত করে। আর সবকিছুর মিলিত ফলাফল হিসেবে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যহীন জনগণ দৃষ্টিগোচর হয় সবচেয়ে বেশি। এ কারণেই দেখা যায় কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমের বিভিন্ন কাজে বাংলাদেশের লোকেরা সবসময়ই প্রাণশক্তির অভাবে ভোগেন।

জন্য, আর আল্লাহর কাছেই আমার ফিরে যাওয়া।" (আল-কুর'আন, ২: ১৫৬) এ উপলব্ধির পর মানুষ আর নিজের মূল নিয়ে প্রশ্ন করে না। বরং মহান আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে নিজের জীবন পরিচালনা করে স্থায়ী সফলতা লাভের পথে এগিয়ে যায়।

[১] গোলাম মোস্তফা কিরন, আজকের বিশ্ব, পূর্বোক্ত, পৃ.৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.৩০১-৩০৪

[৩] ড. ফজলুর রহমান, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : নীতি ও কাঠামো, প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা ২০০৭, পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে অশিক্ষার প্রভাবে অসামাজিক এবং অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ জন্ম দেয় অশিক্ষার কারণে তা জন্ম নিতে পারে না এ কারণেই মানুষ পতিতাবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তির মত অসম্মানজনক পেশা বেছে নিতেও কোনো দ্বিধা করে না। প্রকৃত শিক্ষিত লোক পরিশ্রমী ও সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন হন বলে তিনি সবসময় অসামাজিক, অপরাধমূলক এবং আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হয় এমন যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার প্রভাবে অসংখ্য অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, আত্মসাৎ, পণ্যে ভেজাল দেয়া, নকল পণ্য বিক্রি করা, মাদকাসক্তি, মাদকব্যবসায় ইত্যাদি নানা কাজের নেপথ্যে অশিক্ষা এবং অনৈতিক শিক্ষা যাকে আমরা অভিহিত করেছি কুশিক্ষা নামে – তাই মূলত দায়ী।

অশিক্ষার প্রভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে ভীষণ উদাসীন। এই ঔদাসীন্য, অবহেলা ব্যক্তির নিজের জীবনে যেমন তেমনি সামাজিক জীবনেও অন্তহীন দুর্ভোগ নামিয়ে নিয়ে এসে। জীবন বিপর্যস্ত হয় নানা রকম সীমাবদ্ধতা, অভাব ও বিড়ম্বনায়। এমনকি মানুষ নিজে কর্তব্য পালন করে না বলে অন্যের কর্তব্য পালনের ব্যাপারেও সে কোনো আরজি বা অধিকার উপস্থাপন করতে পারে না। ফলে বাংলাদেশের জনগণ নানারকম অন্যায়, জুলুম, শোষণ, উৎপীড়ন এবং অর্থহীন ভোগান্তি বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। শিক্ষিত হলে মানুষ নিজে নিজের দায়িত্ব পালন করে যেমন নিজের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারতো, সাথে সাথে গড়ে তুলতে সক্ষম হতো সমৃদ্ধি দেশ ও জাতি।

এ থেকে প্রমাণ হয়, অশিক্ষা কেবল নিজেই একটি সামাজিক সমস্যা নয় বরং বাংলাদেশের আরো অসংখ্য সমস্যার জন্য দায়ী একটি ক্রনিক ও সামষ্টিক সামাজিক সমস্যা।[১] এর প্রভাব মহাক্ষতিকর, এর পরিণাম ভয়াবহ। এ কারণে একে সামাজিক সমস্যার শীর্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

বাংলাদেশে শিক্ষা সমস্যার কারণ

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী এ দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। তারা বরং সবসময়ই প্রজাসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকারে রাখার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে। কেননা সে সময়ের শাসকগোষ্ঠী প্রজাদের উপর নানা রকম অন্যায় করের বোঝা চাপিয়ে দিত। শাসনের নামে শোষণ করতো। নিজেদের অক্ষমতা, অযোগ্যতা, অনৈতিকতা, অজ্ঞানতা ও অদক্ষতা আড়াল করা এবং জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকারের ব্যাপারে অন্ধকারে রাখার জন্য ক্ষমতাসীনরা সাধারণ মানুষের শিক্ষা গ্রহণের অধিকারকে নির্মমভাবে হরণ করেছিলো। রাজবাড়িতে শাসকগোষ্ঠীর সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয় বসত, রাজকীয় শিক্ষাগুরু সেখানে শিক্ষা দিতেন। সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার সেখানে একেবারেই ছিলো না। নানা চড়াই-উৎরাই আর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম শেষে বর্তমানের বাংলাদেশে এসে শাসকগোষ্ঠীর অনীহা আর আগের মত নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কার্যকর কোনো পরিকল্পনা অদ্যাবধি কেউ গ্রহণ করেননি।

বাংলাদেশে অশিক্ষা বহাল থাকার কারণ এ দেশে প্রচলিত শিক্ষার অকার্যকারিতা। শিক্ষা গ্রহণের দীর্ঘ সময় ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যয় করার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে তেমন কোনো সুফল বয়ে আনে না। কেননা সরকারের অনীহা, শাসকগোষ্ঠীর মেধাশূন্যতার কারণেই বাংলাদেশে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা আজো চালু রয়েছে যা প্রবর্তন করেছিলো বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী। যে শিক্ষায় কর্মকর্তা বা শিক্ষক কিংবা ব্যবসায়ী বা অন্যকোন পেশাজীবি তৈরির কোনো লক্ষ্য ছিলো না। লক্ষ্য ছিলো কেরানী তৈরি করা। সেই একই শিক্ষায় বাংলাদেশে এখনো কেরানীই তৈরি হচ্ছে। যে কারণে সাধারণ মানুষ শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ করছে অকার্যকর শিক্ষা হিসেবে। এই পর্যবেক্ষণ তাদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে অনাগ্রহী করে রেখেছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তা নীতিহীন শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষাদান ও গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে এই নীতিহীনতা অত্যন্ত প্রকট ও নগ্নভাবে সর্বসাধারণের চোখে পড়ে। দেশে মাদরাসা শিক্ষা, বিভিন্ন আশ্রমে

[১] হাসান মতিউর রহমান, প্রসঙ্গ নিরক্ষরতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, জাতিসংঘ সমিতি বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ধর্মের শিক্ষাদানের যে ধর্মীয় ধারা রয়েছে সেখানে নীতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন ও পাঠের প্রচলন থাকলেও বাস্তবে তা অনুশীলনের তেমন কোনো দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। বরং সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত মাদরাসার শিক্ষার্থীদের নকল করা, আশ্রমের শিক্ষার্থীদের নানা রকম অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়া এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অনৈতিকতা বন্যাহীন হয়ে ওঠায় আপামর জনগোষ্ঠী শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশে অশিক্ষার ধারা বহাল থাকার একটি অন্যতম কারণ হলো দুর্নীতিগ্রস্ততা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দুর্নীতে টানা পাঁচবার সমগ্র বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। অতি সম্প্রতি এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষ ১৫ দেশের মধ্যেই রয়েছে।[১] লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশে যতো রকমের দুর্নীতি হয় তার সাথে শিক্ষিত লোকেরাই অধিকাংশ ক্ষেতে সম্পৃক্ত। শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষিতদের ব্যাপকহারে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে আপাত নিরক্ষর লোকেরা শিক্ষাকে শ্রদ্ধার পরিবর্তে ঘৃণার চোখে দেখে এবং এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে না।

বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো প্রচলিত শিক্ষায় এমন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যা মানুষের বাস্তব প্রয়োজন ও মানবিক চাহিদা পূরণে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন বাংলাদেশে যে সিলেবাসে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় কর্মক্ষেত্রে সে শিক্ষা কোনো তাই লাগে না। বিশেষত জাতির উন্নতি যেখানে দক্ষ মাঝারি বা উচ্চমানের প্রকৌশলী–শ্রমিক–কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীল সেখানে প্রচলিত বাংলাদেশি শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৌশলগত দক্ষ কোনো শিক্ষিত লোক তৈরি করে না। সময়ের দাবি বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে শিক্ষিত লোকদের এমন দীনতার কারণে নিরক্ষর লোকেরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয় না।[২]

বাংলাদেশের অধিকাংশ মা–বাবা দারিদ্র্যের কারণে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। অথবা ভবিষ্যতে উচ্চ শ্রেণীতে পড়ার ব্যয় বহন করতে পারবেন না ভেবে আগে থেকেই স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দেন। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পাঠ্যবই কিনতে হয় না, প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়ার জন্য বেতনও লাগে না – তা সত্ত্বেও স্কুলের কাপড়, খাতা, কলম ও আনুসঙ্গিক খরচ নির্বাহ করাই অনেক অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া স্কুলে পাঠালে সন্তানরা শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয়ে অর্থোপার্জন করতে পারে না। এতে অভিভাবকগণ দ্বিগুণ ক্ষতির আশংকায় জটস্থ থাকেন। প্রথমত, সন্তানরা অর্থোপার্জন করে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সন্তানদের পেছনে তাদেরকে উল্টো অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই দ্বিবিধ বিষয় বিবেচনায় দরিদ্র মা–বাবারা সন্তানদের স্কুলে পাঠানো থেকে বিরত থাকেন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় বিনিয়োগ লাভজনক কি–না তেমন একটি প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। কারণ এটি যদি লাভজনক বিনিয়োগ হতো, তাহলে অভিভাবকগণ কেনো তাদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করবেন না? কেনো শিক্ষিত করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিধা ও সংশয় কাজ করে? অথচ আমাদের গ্রামীণ জনগণ হোন কিংবা শহুরে অধিবাসী – প্রত্যেকেই কিন্তু অত্যন্ত বাস্তববাদী, স্বার্থসচেতন এবং বৈষয়িক। তাহলে তারা শিক্ষায় আগ্রহ হারাচ্ছেন কেনো বা শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না কেনো? এর কারণ রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা। বাংলাদেশের অভিভাবক মাতাপিতাগণ অত্যন্ত বেদনা নিয়ে লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশের শিক্ষিত অধিকাংশ যুবক চাকুরিহীন। লেখাপড়া করার সময় তাদের পেছনে মাতাপিতার বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে। লেখাপড়া করার সময় তারা অর্থোপার্জনের কোনো কাজ করেনি। উপরন্ত তাদের পেছনে উপার্জিত অর্থের বিশাল অংশ ঢালতে হয়েছে এই প্রত্যাশায় যে, লেখাপড়া শেষে তারা উপার্জনে অংশ নিয়ে আগের ক্ষতি পুরোপুরি পুষিয়ে দেবেন এবং অভিভাবকদেরকে সকল আর্থিক অনটন ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের এ প্রত্যাশা অলীক এবং অবাস্তব প্রতীয়মান হয়। শিক্ষিত সন্তান বেকার হয়ে মাতাপিতার

---

[১] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত সর্বশেষ জরিপ অনুসারে দুর্নীতিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ১৩তম। (প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১)

[২] হাসান মতিউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

বোঝায় পরিণত হয়। তারা কৃষিকাজ শেখেনি, যে জন্য কৃষিতে কোনো অবদান রাখতে পারে না আবার চাকুরি না পাওয়ায় তাদের মধ্যে কাজ করে হতাশা। এ কারণে মাতাপিতা সন্তানকে শিক্ষিত বেকার বানানোর চেয়ে অশিক্ষিত কৃষক-শ্রমিক বানানোর ক্ষেত্রে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। বস্তুত শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি না পেলে বা শিক্ষা বৈষয়িক উন্নতির অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত না হলে শিক্ষার প্রতি কেউ-ই আগ্রহী হবেন না। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাঙ্ক্ষিত গতিবৃদ্ধি না হওয়ার নেপথ্যে এ কারণটি অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে।

বাংলাদেশে অশিক্ষার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, মাতাপিতার নিজেদের নিরক্ষরতা। বর্তমান সময়ে এসে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, শহরের নতুন প্রজন্মের মাতাপিতাদের অধিকাংশই শিক্ষিত হওয়ার কারণে তারা সন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে যত্ন নিয়ে থাকেন। কিন্তু গ্রামীণ জীবনে এবং শহরের নিম্নবিত্ত পরিবারের মা-বাবাগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত বলে তারা সন্তানদের লেখাপড়া করানোর বিষয়টিকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তারা মনে করেন, লেখাপড়া ছাড়া তারা যেহেতু নিজেদের জীবন চালিয়ে নিতে পেরেছেন সুতরাং তাদের সন্তানদেরও লেখাপড়া ছাড়া জীবন চালিয়ে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। শিক্ষার গুরুত্ব ও উপযোগিতার প্রতি নিজেদের অজ্ঞতার কারণে অনেক মাতাপিতা সন্তানদের লেখাপড়া করান না।[১]

বর্তমান বাংলাদেশে সরকারিভাবে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করে দেয়া হলেও নারীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা এখনও দূর হয়নি। বিয়ের পরে মেয়ে স্বামীর ঘরে চলে যাবে বলে মাতাপিতাগণ কন্যাকে শিক্ষা দেয়াকে অলাভজনক বিনিয়োগ মনে করে। ফলে একুশ শতকে এসেও নানারকম পারিবারিক ও সামাজিক বাধার কারণে নারী শিক্ষা গ্রহণের অধিকার বঞ্চিত হয়। এর পাশাপাশি নারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত না করতে পারার কারণেও নারী শিক্ষায় এগিয়ে আসতে পারে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুসারে নারী পুরুষের অনুপাত ১০৩ ঃ ১০০।[২] নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সামাজিক বাধার কারণে নারী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হতে পারে না বলে দেশে শিক্ষার হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

বর্তমান বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের অধিকাংশ লোকই স্বাক্ষর। দেশের অশিক্ষার হার বৃদ্ধির পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছেন বয়স্ক শিক্ষার্থীরা। তারা উপযুক্ত সময়ে নানা অবজ্ঞা, অবহেলা ও অলসতা এবং কেউ কেউ বাস্তবিক কারণেই লেখাপড়া করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রচলিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার কোনো সুযোগ তাদের নেই। অথচ তাদেরকে যদি স্বাক্ষর করা সম্ভব না হয় তাহলে দেশ থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করা একেবারেই অসম্ভব। সে জন্য প্রচলিত স্কুলিংয়ের সাথে সাথে এ সকল বয়স্ক, কর্মজীবি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্নতর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আবশ্যক। বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান একেবারেই অপ্রতুল। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের স্বল্পতার জন্য দেশে অশিক্ষা কমছে না।[৩]

বাংলাদেশের মত অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে শিক্ষা বিলাসিতা বা নৈতিকতা উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত নয় বরং এখানে শিক্ষা হলো বাস্তব চাহিদা পূরণ এবং উপার্জনের হাতিয়ার। শিক্ষা অর্জন করে মানুষ মানসম্পন্ন মানবিক জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় রসদ উপার্জন করতে সক্ষম হবে এটাই বাংলাদেশের শিক্ষার প্রধান এবং ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা এ লক্ষ্য পূরণে একেবারেই অক্ষম। এখানে কর্মবিমুখ শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে শিক্ষা শেষে কেউ আর কর্মী হতে চায় না। সবাই চায় 'সাহেব' হতে। অথচ বাস্তবতা হলো যে কোনো দেশেই সাহেবের চেয়ে কর্মীর প্রয়োজন বেশি। শিক্ষা ব্যবস্থার এমন কর্মবিমুখতার কারণে বাংলাদেশে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে এর থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রেখেছেন।

---

[১] ড. জামিলুর রহমান, শিক্ষা ও উন্নয়ন ভাবনা, আগামী প্রকাশন, ঢাকা ২০০২, পৃ.১২

[২] Population Census 2001, ibid, p.34

[৩] ড. জামিলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা গ্রহণের প্রতি ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। সালাত, যাকাত, সাওম, হজসহ বিভিন্ন ইবাদত এমনকি ঈমানেরও আগে ইসলাম শিক্ষাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। কারণ শিক্ষা ছাড়া ঈমান সুদৃঢ় হতে পারে না আর শিক্ষা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে ইবাদত করাও সম্ভব হয় না। মুমিন হওয়ার জন্য বা ইবাদত করার জন্য যেমন, তেমনি মুমিন হিসেবে জীবন যাপনের জন্যও শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। ইসলাম যে শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্বারোপ করেছে তা কুর'আন মজীদ ও হাদীসের বিভিন্ন ঘোষণা থেকে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়।

ইসলামের প্রথম নবী হযরত আদম (আ) আশরাফুল মাখলুকাত মনোনীত হয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ আদমকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর জ্ঞানের পরীক্ষায় ফেরেশতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কুর'আন মজীদে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলা করেছেন: "আল্লাহ আদমকে প্রতিটি বিষয়ের নামসমূহ শেখালেন। এরপর তা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে আমাকে এগুলোর নামসমূহ জানাও।' ফেরেশতাগণ বললেন, 'আপনি মহাপবিত্র। আপনি আমাদের যা শেখান, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।' আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে বিষয়সমূহের নামগুলো জানিয়ে দাও।' এরপর যখন আদম তাদেরকে বিষয়গুলোর নাম জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গায়ব সম্পর্কে জানি? এবং আমি খুব ভালো ভাবেই জানি যা তোমরা প্রকাশ করো ও যা গোপন রাখ। যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, এরপর ইবলীস ছাড়া তারা সকলেই সিজদা করলো। ইবলীস অবাধ্য হলো ও অহঙ্কার করলো এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[১]

আল্লাহর ঘোষণা ও বিবরণ থেকে সহজেই বোধগম্য হয়ে ওঠে, অশিক্ষার কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়। কারণ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া ও অহঙ্কার করা নিতান্তই মূর্খতা। ইবলীস সে কাজই করেছিলো এবং এর পরিণামে অভিশপ্ত হয়েছিলো। অন্যদিকে বাধ্যগত ফেরেশতারাও শ্রেষ্ঠত্ব পাননি, পেয়েছেন আদম। কারণ তিনি বাধ্য ছিলেন এবং জ্ঞানী ছিলেন। মহান আল্লাহই তাঁকে এ জ্ঞান দান করেছিলেন। ইসলামে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারণা তা একান্তভাবেই শিক্ষা নির্ভর। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টির সেরা। কিন্তু শিক্ষাহীন লোক এ মর্যাদা ভোগ করতে পারবে না। আল্লাহর অন্য একটি ঘোষণা থেকে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন: "(হে রাসূল স) আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? নিশ্চয় কেবল জ্ঞানী লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।[২]

ইসলামে জিহাদ একটি ফরয কাজ। ইসলাম প্রচার, ইসলামের জন্য নিপীড়ন সহ্য করা, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আল্লাহর আদেশ অনুসারে যে কোনো চেষ্টা এবং ত্যাগ ও কুরবানি হলো জিহাদ। মুমিন জীবনে এর গুরুত্ব জীবনের চেয়ে বেশি। ইসলাম ও মুসলিমের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুমিনদেরকে কখনো কখনো সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। নানা অভিযানে বের হতে হয়। ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশি যে, সেই যুদ্ধাবস্থায় যা বিপদসঙ্কুল সেই অভিযানের সময়ও শিক্ষার বিষয়টি যেন বন্ধ হয়ে না যায় বা বন্ধ করা না হয়, মহান আল্লাহ সেই নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। বলেছেন: "মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। বরং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল কেনো বের হয় না, যাতে অবশিষ্ট লোকেরা দীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের সতর্ক করতে পারে, যখন দলটি সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে আসে, যাতে তারা সতর্ক হয়?[৩]

---

[১] আল-কুর'আন, ২: ৩১-৩৪

[২] আল-কুর'আন, সূরা যুমার: ৯ (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)

[৩] وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
আল-কুর'আন, সূরা তাওবা: ১২২

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘোষণা থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণ হয়। তা হলো, মুমিনদের মধ্যে যেমন যোদ্ধার একটি শ্রেণী প্রয়োজন, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবি, প্রকৌশলী, চিকিৎসক ইত্যাদি নানা শ্রেণী থাকা আবশ্যক ঠিক তেমনি আবশ্যক একদল শিক্ষাবিদের। শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠাই হবে যাদের একমাত্র কাজ। এমন একটি বিশেষায়িত দল ছাড়া মুমিনদের সামগ্রিক পূর্ণতা আসে না। কারণ জাতি হিসেবে মুমিন-মুসলিমদের যে শ্রেষ্ঠত্ব তা একান্তভাবে দলগত প্রচেষ্টায় মানুষের কাছে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্যই ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু মুমিন আছেন, তবে অধিকাংশই ফাসিক।[১]

ইসলামে শিক্ষার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে মহানবী (সা)এর প্রতি মহান আল্লাহর প্রথম আদেশে। আরবে মানবতার নিরন্তর অমর্যাদা দেখে মহানবী (সা) নবুয়্যাত লাভের আগেই ভীষণ নুবড়ে পরেছিলেন। নানাভাবে তিনি উপায় খুঁজছিলেন, কীভাবে মানবতাকে এই অমর্যাদা থেকে মুক্তি দেয়া যায়। পথের খোঁজে তিনি শহর থেকে দূরে নিরব হেরা গুহায় নিয়মিত ধ্যান শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি একটি উপায় লাভ করেন। সেই উপায়টির প্রথম কথা শিক্ষা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে। কারণ শিক্ষা গ্রহণ না করলে মহান আল্লাহ নির্দেশিত কোনো উপায়ই মানুষের কাছে গ্রহণীয় মনে হবে না। আবার বিশ্বাস ও আবেগের কারণে কোনো কিছু গ্রহণীয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তাতে টিকে থাকা হবে ভীষণ কষ্টসাধ্য বিষয়। আল্লাহ তাঁর প্রথম নির্দেশে বলেন: "পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন এবং (জেনে রাখুন) আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না।[২] পরবর্তীতেও আদেশের এই ধারা অব্যাহত থাকে। অন্যত্র তিনি বলেন: "পরম করুণাময়, তিনি কুর'আন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।[৩]

মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্যের কথা মহান আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন তা সফল ও সার্থক করে তোলার জন্যও প্রয়োজন শিক্ষার। আল্লাহ বলেন, "আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমার ইবাদাত করবে (আমার নির্দেশ মেনে চলবে)।[৪] এখন ব্যক্তি যদি ইবাদত কী তা না জানে এবং কীভাবে ইবাদত করতে হয় সে সম্পর্কে কোনো ধারণা না রাখে, তাহলে তার পক্ষে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ইবাদত করা সম্ভব হবে না। সে সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারবে না। শিক্ষাকে ইসলামে তাই ইবাদাতের পরিপূরক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)তো সরাসরি বলে দিয়েছেন, শিক্ষা অর্জনও ইবাদত। যেমন, আবূ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ এর দ্বারা তাকে বেহেশতের পথসমূহের একটি পথে পৌছে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। জ্ঞানীদের জন্য আকাশ ও যমীনে যারা আছেন তারা সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করতে থাকেন। এমনকি পানির মধ্যে থেকে মাছও। ইবাদতকারী জ্ঞানীগণের মর্যাদা জ্ঞানহীন ইবাদতকারীদের উপর তেমন যেমন তারকারাজির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র। ইবাদতকারী জ্ঞানীগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান শুধু জ্ঞান। তাই যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছে, সে পূর্ণ অংশই অর্জন করেছে।[৫]

---

[১] كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ আল-কুর'আন, ৩: ১১০

[২] اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ কুর'আন, সূরা আলাক: ১-৫

[৩] আল-কুর'আন, সূরা আর-রাহমান: ১-৪

[৪] وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আল-কুর'আন, সূরা যারিয়াত: ৫৬

[৫] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ইলম

Dhaka University Institutional Repository

আয়শা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন – যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব। যে ব্যক্তির দুই চোখ আমি নিয়ে গিয়েছি তাকে এর পরিবর্তে জান্নাত দান করবো। ইবাদত অধিক হওয়ার চেয়ে জ্ঞান অধিক হওয়া উত্তম। দীনের প্রকৃত বিষয় হচ্ছে সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা।[১]

আবূ উমামা বাহিলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)এর নিকট দুজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাদের একজন ইবাদতকারী জ্ঞানী অন্যজন জ্ঞানহীন ইবাদতকারী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: "জ্ঞানহীন ইবাদতকারীর উপর জ্ঞানী ইবাদতকারীর মর্যাদা এমন যেমন তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর আমার মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আকাশ ও যমীনের অধিবাসীরা এমনকি পিপিলিকা তার গর্তে আর মাছ পানিতে এমন লোকের জন্য দুআ করতে থাকে যে ব্যক্তি মানুষকে ভালো কথা শিক্ষা দেয়।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "একজন জ্ঞানী ইবাদতকারী শয়তানের বিরুদ্ধে জ্ঞানহীন হাজার ইবাদতকারীর চেয়েও অধিক শক্তিমান।[৩]

শিক্ষার কারণে ব্যক্তির এমন সুউচ্চ মর্যাদার কথা কুর'আন মজীদেও ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সকল কিছুই জানেন।[৪]

জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য বিশেষ প্রতিদানের কথা ঘোষণা করে ইসলাম এর গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। এমনকি চেষ্টা করে কেউ যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, ইসলামে তাও সওয়াব প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হওয়ার ঘোষণা রয়েছে। ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেছে এবং তা লাভ করেছে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। আর যে তা অর্জন করতে পারেনি তার জন্যও সওয়াব রয়েছে।[৫]

ইসলামে ইবাদাতের জন্য শিক্ষাকে অনিবার্য করা হয়েছে। কারণ জ্ঞান ছাড়া ইবাদত অসম্ভব। যদি জ্ঞান ছাড়া ইবাদত করা হয়, তা হয় অন্তসারশূন্য। কেননা অশিক্ষিত লোক ইবাদাতের তাৎপর্য বুঝতে পারে না বলে আবেগের বশবর্তী হয়ে সে হয়তো ইবাদত করে কিন্তু তাতে বিবেচনার কোনো অংশ গ্রহণ থাকে না। জ্ঞানের গুরুত্ব বুঝাতে এ কারণে ইসলামে জ্ঞান সাধনাকে সরাসরি ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: "রাতের এক মুহূর্ত জ্ঞান গবেষণা করা পুরো রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।[৬]

মহানবী (সা) নিজে নিছক ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে জ্ঞান চর্চাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁর মসজিদে পৌছে সাহাবীদের দুটি মজলিস দেখতে পেলেন। একটি দু'আর, অপরটি জ্ঞান চর্চার। তিনি বললেন: দুটি মজলিসই ভালো। তবে একটি অন্যটি থেকে উত্তম। দু'আর দলটি আল্লাহ তা'আলাকে ডাকছে এবং তাঁর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণ করতে পারেন; নাও করতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি যে জ্ঞান চর্চা করছে আর যারা জানে না তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে; এরাই উত্তম। আমিও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। এরপর মহানবী (সা) জ্ঞানচর্চাকারী দলটির সাথেই বসে পড়লেন।[৭]

আখিরাতে জ্ঞানীদের জন্য মহানবী নিজে সুপারিশ করার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞানের মাহাত্ম্য আর শিক্ষার গুরুত্ব। আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জ্ঞানের কোনো সীমায় পৌছলে ব্যক্তি ফকিহ হতে

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] আল-কুর'আন, সূরা মুজাদালা: ১১ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

[৫] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ইলম

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পারে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দীনের ব্যাপারে ৪০টি হাদীস শিখেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ফকিহ হিসেবে উপস্থিত করবেন। আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব।[১] শিক্ষাদানকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সবচেয়ে বড় দান হিসেবে।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা বলতে পার কি দানের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় দাতা কে? সাহাবীগণ বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক ভালো জানেন। তিনি বললেন: "দানের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাতা আমিই। আমার পরে বড় দাতা সেই ব্যক্তি যে শিক্ষা অর্জন করে এবং তা বিস্তার করে। কিয়ামাতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা একটি উম্মত হিসেবে উত্থিত হবে।[২]

মহান আল্লাহর প্রতি জ্ঞানী লোকদের হৃদয়বৃত্তিক অনুরাগের দৃশ্যকল্প উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "নিশ্চয় মুমিন হলো তারা আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের হৃদয় চমকে ওঠে (আল্লাহর প্রতি প্রেমের কারণে বিগলিত হয়); যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে; তারা কেবল তাদের প্রতিপালকের উপরেই ভরসা রাখে।[৩]

এ কারণেই মহানবী (সা)কে জ্ঞান অর্জনের কাজে, শিক্ষা নেয়ার কাজে তাড়াহুড়া না করার পরামর্শ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। কারণ শিক্ষা গ্রহণের মত একটি মহান ইবাদতে তাড়াহুড়া করলে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা একান্ত আবশ্যক। ব্যক্তি বরং এ জন্য মহান আল্লাহর দরবারে নিরন্তন প্রার্থনা করতে পারে। আল্লাহ সে পথও বলে দিয়েছেন। বলা হয়েছে: "বস্তুত আল্লাহ তা'আলা হলেন (সর্বকিছুর) প্রকৃত মালিক। আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী পুরোপুরি নাযিল হওয়ার আগে আপনি কুর'আন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না। (আপনি বরং) বলুন: 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।[৪]

বস্তুত একজন শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব তার সৃষ্টি রহস্য, তার পরিণতি, করণীয় এবং বর্জনীয়। এ কারণে শিক্ষিত লোকই মহান আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। জীবনে তাঁর অনুগ্রহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন এবং এরই ফলশ্রুতি হিসেবে মহান আল্লাহর প্রতি প্রযোজ্য তাকওয়া নীতি অবলম্বন করেন। কুর'আন মজীদে মহান আল্লাহও এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। বলেছেন: "একইভাবে মানুষ, বিভিন্ন প্রাণী এবং গবাদী পশুও ভিন্ন ভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী (যারা আল্লাহর পরিচয় জেনেছে) কেবল তারাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, অসীম ক্ষমাশীল।[৫]

শিক্ষা অর্জনের পথ ও পদ্ধতি যাতে সহজ হয়, সকলেই যাতে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে ইসলামে সেই পথ সুগম রাখা হয়েছে। কোনোভাবেই এ ক্ষেত্রে অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো প্রতিবন্ধকতা যেন না আসে তা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, "তোমরা সহজ পথ অবলম্বন করো, কঠিন করে তুলো না। সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।[৬]

কারণ শিক্ষার পথ ও পদ্ধতি কঠিন করে ফেললে সকলের পক্ষে শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অথচ ইসলামে শিক্ষাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিভূ হিসেবে। যার জ্ঞান আছে বা যাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা কল্যাণের জন্য দেয়া হয়েছে বলেই ইসলাম ঘোষণা করেছে। মুয়াবিআ (রা) বলেন, আমি নবী (সা)কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আমি জ্ঞান বিতরণ করি, আল্লাহ তা দান করেন। এ উম্মাহ সবসময় আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা কিয়ামত আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৭] সকলের জন্য সহজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব না হলে মানুষ এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

[৩] আল-কুর'আন, ৮: ২ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

[৪] আল-কুর'আন, সূরা ত্বাহা: ১১৪ (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

[৫] আল-কুর'আন, সূরা ফাতির: ২৮ (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)

[৬] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ইলম

[৭] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শিক্ষার এমনই গুরুত্ব যে এতে শিক্ষিত লোকের প্রতি ইতিবাচক হিংসাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এমনিতে হিংসা ভয়ানক পাপ হিসেবে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তির মনে বিন্দু পরিমাণ হিংসাও থাকবে, সে যাবে জাহান্নামে।[১] অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও নিষেধাজ্ঞা বদলে ফেলা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "শুধু দুটি বিষয়ে মানুষকে হিংসা করা যায়। এমন ব্যক্তিকে হিংসা করা যায় যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করার ক্ষমতা দেয়। এমন ব্যক্তিকেও হিংসা করা যায়, আল্লাহ যাকে জ্ঞান দিয়েছেন আর সে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করে ও অন্যকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দেয়।[২]

অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে হিংসার অর্থ শিক্ষিত লোকের ক্ষতি বা ধ্বংস কামনা করা নয়। বরং এর তাৎপর্য হলো, শিক্ষিত লোককে হিংসা করে তার মত শিক্ষিত হওয়ার প্রবল আশা ও প্রচেষ্টা।

মহানবী (সা) এর কাছে শিক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ই ছিলো না। এ কারণে তিনি যখন স্নেহাস্পদ কারো জন্য দুআ করেছেন; একান্তভাবে তার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই দুআ করেছেন। অর্থ-সম্পদ বা ক্ষমতা বৃদ্ধির বা প্রাপ্তির দুআ তিনি করেননি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে কিতাব শিক্ষা দাও।[৩] কারণ মহানবী (সা) বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার চেয়ে জরুরী এবং শিক্ষার চেয়ে উপকারী আর কোনো কিছুই মানবজীবনে থাকতে পারে না।

সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষাকে মহানবী (সা) উপকারী বস্তু হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত জীবনকে প্রকৃত ও সফল জীবন হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। জ্ঞানকে তিনি এমন উপকারী বিষয় বলে আখ্যায়িত করেছেন যার মাধ্যমে কেবল জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেই উপকৃত হয় না বরং তার আশেপাশের লোক এমনকি পারিপার্শিকতা পর্যন্ত উপকৃত হয়ে থাকে। হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, "যে জ্ঞান ও সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো মাটির উপর বর্ষিত বিপুল বৃষ্টির মত। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্বর, তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত, তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ তার সাহায্যে মানবজাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে। কিছু অনুর্বর মাটি রয়েছে, যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপাদন করে না। এটাই হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর এটা সেই লোকেরও দৃষ্টান্ত যে তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহ যে পথনির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাও গ্রহণ করে না।[৪]

শিক্ষাকে ইসলাম এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, অশিক্ষাকে নির্ধারণ করা হয়েছে কিয়ামাত পূর্ব মহাধ্বংসের আলামত হিসেবে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কিয়ামাতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নিদর্শন হলো: জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা জেকে বসবে, মদ পান করা হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।[৫] কারণ শিক্ষিত মানুষ যেমন আত্মরক্ষা করে তেমনি অন্যকে রক্ষায়ও ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অশিক্ষিতের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। সে নিজে ধ্বংস হয় এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস করে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে দীনি জ্ঞান বের করে নেন না, বরং দীনি জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের ইন্তিকালের মাধ্যমে জ্ঞান নিয়ে নেন। এমনকি যখন একজন জ্ঞানী লোকও থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। এরপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে আর তারা না জেনেও এর উত্তর দেবে। এতে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৬]

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শিক্ষার এমনই গুরুত্ব যে, অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তি কম জ্ঞানীর নিকট থেকে যেন জ্ঞান আহরণ করতে পারে, সে সুযোগ রাখা হয়েছে। আবার বিশেষ কোনো জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন হলেই কেউ যেন না ভেবে বসে তার জ্ঞান অর্জন শেষ হয়েছে, সেই নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল মূসা (আ) এবং অন্যতম আল্লাহ ভীরু জ্ঞানী হযরত খিযির (আ)[১]এর মধ্যকার প্রসিদ্ধ ঘটনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) বলেছেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)কে বললাম, নউফ আল-বাকালী মনে করে যে, খিযির (আ) এর কাহিনীতে বর্ণিত মূসা বনী ইসরাঈলের কথিত মূসা (আ) নয়, সে অন্য মূসা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে।[২] উবাই ইবন কাআব আমার কাছে নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেন, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী।[৩] এতে আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন। কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেননি। তারপর আল্লাহ তাঁকে ওহী যোগে জানালেন, সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে। তিনি তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী।'

মূসা (আ) বললেন, প্রভু আমার! আমি কীভাবে তার সাথে দেখা করতে পারি? তখন তাঁকে বলা হলো, 'একটি থলিতে একটি মাছ রাখো। যেখানে তুমি ঐ মাছ হারাবে সেখানেই সে থাকবে।

তারপর মূসা (আ) তাঁর সাথী ইউশা ইবন নূনকে নিয়ে চললেন। থলেতে একটি মাছ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বড় পাথরের কাছে পৌঁছলেন এবং সেখানে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমালেন। মাছটি থলে থেকে বের হয়ে সাগরে সুড়ঙ্গ করে চলে গেল। মূসা ও তাঁর সাথীর জন্য এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিলো। তারপর তারা বাকি দিন ও রাতভর চললেন। পরদিন ভোরে মূসা (আ) সাথীকে বললেন, নাশতা আনতো! আমাদের এ সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

মূসাকে যে স্থানের কথা বলা হয়েছিলো সে স্থান অতিক্রম করার আগে তিনি কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি। তার সাথী তাকে বললো – দেখুন আমরা যখন পাথরের চটানে আশ্রয় নিয়েছিলোম আমি তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলোম।' মূসা বললেন, ঐ স্থানই তো আমরা খোঁজ করেছিলোম।

তারপর তারা উভয়ে নিজের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন। যখন তারা ঐ পাথরের চটানে পৌঁছলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা (আ) সালাম দিলেন। খিযির (আ) বললেন, তোমার এ দেশে সালাম কোথায়?

মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বনী ইসরাঈলের মূসা। এরপর মূসা বললেন, আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছুটা আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ উদ্দেশ্যে কি আমি আপনার অনুসরণ করবো? খিযির বললেন, তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তাই রাখি। তুমি তা জানো না। আর তোমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিখিয়েছেন তা তুমি রাখো, আমি তা জানি না। তিনি বললেন, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো ব্যাপারে আপনার অবাধ্য হব না।

তারপর তারা দুজন সাগরের পাড় দিয়ে চলতে লাগলেন। তাদের কোনো নৌকা ছিলো না। ঐ সময় তাদের কাছ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিলো। তারা তাতে তাদেরকে তুলে নেয়ার জন্য নৌকার লোকদের বললেন। খিযির (আ)পরিচিত ছিলেন বলে তারা

---

[১] খাজা খিযির, খোয়াজ খিযির, হযরত খিযির ইত্যাদি নামে তিনি পরিচিত। তিনি নবী ছিলেন কি-না সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে ইসলামের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং সত্যিকারের সাধক ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা আধ্যাত্মিক ধারার শিক্ষা গ্রহণের জন্য হযরত মূসা (আ)কে তাঁর নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

[২] কুর'আন মজীদে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সুতরাং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মূসা যে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ) সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংশয় লোষণের কোনো কারণ বা যুক্তিও নেই।

[৩] সাধারণ বিবেচনা অনুসারে হযরত মূসা (আ) সত্য কথাই বলেছিলেন। কারণ তাঁর নিকট আল্লাহর ওহী আসে এবং তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল। সে কারণে তাঁর দাবি অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু তিনি তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল সে কারণে তাঁর প্রতিটি বিষয় রাসূলগণের জন্য নির্ধারিত মানে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। সে কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিরস্কার করেছেন। তা না হলে সাধারণ বিবেচনা এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ হযরত মূসা (আ)এর দাবিই সঠিক ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিনা ভাড়ায় তাদেরকে তুলে নিল। তারপর একটা চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারায় বসলো এবং একবার কি দু'বার সাগরে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। তখন খিযির (আ) বললেন, হে মূসা! তোমার ও আমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এ চড়ুই পাখির ঠোঁটে সাগরের পানির চেয়েও কম।

খিযির (আ) নৌকাটির একখানা তক্তার দিকে গেলেন এবং টেনে খুলে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা বিনা পারিশ্রমিকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে এলো আর আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য তাদের নৌকা ছিদ্র করে দিলেন? তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না? মূসা বললেন, আমি ভুল করেছি বলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর আমার ব্যাপারে আপনি বেশি কঠোর হবেন না। মূসা (আ) এর প্রথম প্রতিবাদটা ভুলবশত হয়েছিলো।[১]

তারা আবার চললেন, দেখলেন একটি ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করেছে। তখন খিযির (আ) তার মাথার উপরের দিক নিজ হাতে ধরে তা শরীর থেকে ছিন্ন করে ফেললেন। এতে মূসা (আ) বললেন, আপনি কোনো জীব হত্যার বিনিময় ব্যতীত একটা নিরপরাধ জীবকে হত্যা করলেন? তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকতে পারবে না? ইবন উয়াইনা বলেন, খিযির (আ) এর এ কথার মধ্যে 'তোমাকে' শব্দ থাকায় এটা বেশি জোরাল হয়েছে।

তারা আবার চলতে চলতে এক গ্রামে পৌছুলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা দেখতে পেলেন যে, একটা দেয়াল খসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। খিযির (আ) নিজ হাতে সেটাকে সোজাসুজি খাড়া করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তো এর জন্য মজুরি নিতে পারতেন। তিনি বললেন, এবার তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ। নবী (সা) বললেন, আল্লাহ মূসাকে রহম করুক। আমাদের কতো ভালো লাগতো যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন। আর আল্লাহ আমাদের কাছে তাদের দুজনের আরো ব্যাপার বর্ণনা করতেন।[২]

শিক্ষার অসীম গুরুত্বের কারণেই মহানবী (সা) তাঁর প্রতিটি বাণী অন্যের নিকট পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের নিকট শিক্ষার চিরন্তন আবেদন পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি পৌছে দেয়ার এ কাজ যেন নিখুঁত ও নির্ভুল হয়, তার নিশ্চয়তাও বিধান করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমার পক্ষ হতে মানুষকে পৌছে দিতে থাক, যদিও তা একটি মাত্র আয়াতও হয়। ইসরাঈল জাতির নিকট হতে শোনা কথা বলতে পার, এতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।[৩]

অন্যত্র রয়েছে: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে এরপর তাকে যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে এরপর তা সঠিকভাবে অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক রয়েছে যারা নিজেরা জ্ঞানী নয় এবং এমন অনেক লোক রয়েছে যারা নিজেদের তুলনায় বেশি জ্ঞানী লোকের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে কোনো মুসলিমের অন্তর বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে না। আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করা, মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা এবং মুসলিমদের জামাআতকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দুআ তাদের পরবর্তী মুসলিমদেরকেও শামিল করে দেয়।[৪] অপর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোনো কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌছানো হয় সে ব্যক্তি শ্রোতার চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে।[৫]

---

[১] হযরত খিযির (আ)এর জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বাহ্নেই মূসা (আ)কে অবহিত করেছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে কিছু শেখার জন্যই তাঁকে খিযির (আ)এর নিকট গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহর এই অবহিতি ও আদেশের কারণে খিযির (আ)এর যে কোন কাজের ব্যাপারে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করাই মূসা (আ)এর কর্তব্য ছিল। তা না হলে খিযির (আ) যে কাজ করেছেন, এমনিতে সে কাজের প্রতিবাদ করা তাঁর জন্য অসঙ্গত ছিলো না। কারণ বাহ্যিক বিবেচনায় এটি ছিল উপকারীর অপকার করা এবং অন্যায়। মুসলিম বিনা চ্যালেঞ্জে কোনো অন্যায় কাজ হতে দিতে পারে না।

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ইলম

[৩] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ইলম

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মর্যাদা ও অবস্থানগত পার্থক্য তৈরিতে জ্ঞানই মূল বিবেচ্য বিষয়। অমুসলিম জ্ঞানীগণ যখন মুমিন জ্ঞানী হন তখন তারা মূর্খ মুমিনদের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদাবান হন এবং ইসলামের অনুকূলে তাদের পক্ষে অনেক বেশি অবদান রাখা সম্ভব হয়। হাদীসেও এ বিষয়টির স্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "সোনা রূপার খনির মত মানুষও খনি। যারা জাহিলিয়া যুগে উত্তম ছিলেন, ইসলামি যুগে তারাই উত্তম যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করেন।[১]

ইসলামে শিক্ষার অন্তর্হীন গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য মহানবী (সা) জ্ঞান শিক্ষাকে এমন এক বিনিয়োগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, মানুষের মৃত্যুর পরও যা তার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল বন্ধ হয় না। সাদকায়ে জারিয়া বা অবিরত দান, মানুষের উপকার হয় এমন জ্ঞান এবং এমন সুসন্তান যে ব্যক্তির জন্য দুআ করে।[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে: আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "মুমিনের ইন্তিকালের পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে কিছুর সওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে। এমন জ্ঞান যা সে অর্জন করেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে, নেক সন্তান–যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, কুর'আন–যাকে সে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছে, মসজিদ–যা সে নির্মাণ করেছে, মুসাফিরখানা–যা সে পথচারীদের জন্য নির্মাণ করে গেছে, খাল–কূপ–পুকুর যা সে খনন করেছে অথবা দান – যা সে সুস্থ্য ও জীবিত অবস্থায় নিজের অর্থ–সম্পদ হতে করেছে।[৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে কিংবা পরকালে শিক্ষা এক অনবদ্য অবলম্বন। এর মাধ্যমে পার্থিব মর্যাদা যেমন পাওয়া যায় তেমনি আখিরাতেও মুক্তির পথ সুগম হয়। মহানবী (সা) নানাভাবে মানুষের মর্যাদা ও স্বীকৃতির বাহন হিসেবে শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। যেমন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার একটি ছোট কষ্ট দূর করে দেবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিনে তার একটি বড় কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের একটি অভাব সহজ করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন, যতোক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের একটি পথ সহজ করে দেবেন। যখন কোনো একটি দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে যেকোনো একটি ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পর তার আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের উপর স্বস্তি ও শান্তি নাযিল হয়। রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট তাঁদের কথা উল্লেখ করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।[৪]

কিন্তু জ্ঞানার্জনে বা শিক্ষা বিস্তারে অথবা শিক্ষা গ্রহণে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যত যদি না থাকে তাহলে সে শিক্ষা বরং বিপদের কারণ বলে গণ্য হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "কিয়ামাতের দিন প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে নিজ নিআমতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: এ নিআমাতের বিনিময়ে দুনিয়ায় তুমি কী কাজ করেছো? সে বলবে: আপনার সন্তুষ্টির জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করনি। বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছো যেন তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেবেন। আর তারা তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করেছে, অন্যকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুর'আন পড়েছে। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে নিজ নিআমতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: এ

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিআমতের বিনিময়ে তুমি কী কাজ করেছো? সে বলবে: আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি এবং কুর'আন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্য জ্ঞান অর্জন করেছো যেন তোমাকে 'মহাজ্ঞানী' বলা হয়। এজন্য কুর'আন পড়েছো যেন 'ক্বারী' বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদেশে দেবেন। আর তারা তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি আল্লাহ যার জীবিকা প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং দান করেছিলেন সমস্ত রকমের ধন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে নিজ নিআমতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: এ নিআমতের বিনিময়ে তুমি কী কাজ করেছো? সে বলবে: এমন কোনো রাস্তা বাকী ছিলো না যাতে দান করলে আপনি খুশি হবেন আর আমি দান করিনি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো দান করেছিলে এজন্য যেন তোমাকে দানবীর বলা হয়। তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদেশে দেবেন। আর তারা তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।[১]

সুতরাং মুমিনদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহর আদেশ মেনে তাঁকে রাজি-খুশি করানোর নিয়্যতে। এবং এভাবে জ্ঞান অর্জন করাই ফরয। এ জন্যই অপাত্রে জ্ঞানদানকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। অপাত্রে জ্ঞান দানকারী যেন শূকরের গলায় হীরা, মুক্তা বা সোনার হার স্থাপনকারী।[২]

ইসলামে জ্ঞানকে বিবেচনা করা হয়েছে মুমিনের আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "দুইটি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না। উত্তম চরিত্র ও দীনের প্রকৃত জ্ঞান।[৩] এর মর্ম হলো মুমিন হতে হলে অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে। এ কারণেই ব্যক্তি যখন জ্ঞান অন্বেষণে বের হয় তখন সে আল্লাহকে অনুসন্ধানের পথে বের হয়েছে বলেই গণ্য করা হয়। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "জ্ঞান অন্বেষণে বের হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর পথেই থাকে, যতোক্ষণ না সে ফিরে আসে।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে: সাগবারা আজদী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে তার জন্য তা পূর্ববর্তী সগীরা গুনাহসমূহের কাফফারা।[৫]

বস্তুত জ্ঞানের বিষয় এতই বিস্তৃত যে, সত্যিকারের জ্ঞান সাধক জ্ঞান অন্বেষণ করে কখনোই তৃপ্তি লাভ করে না। সে যতো জানে, তারচেয়ে আরো বেশি জানতে চায়। মহারহস্যময় ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ছাড়া তার এই অতৃপ্তি কখনোই দূর হয় না। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "মুসলিম কখনো জ্ঞানের বিষয় শোনায় তৃপ্তি লাভ করে না, যতোক্ষণ না তার পরিণাম হয় জান্নাত।[৬] অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি আমরণ জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং এর পরিণতি তাকে জান্নাতে পৌছে দেয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে: আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন: "দুই পিপাসু ব্যক্তি আত্মতৃপ্তি লাভ করে না। জ্ঞানের পিপাসু, সে তা হতে কখনো তৃপ্তি লাভ করে না। দুনিয়ার পিপাসু, সেও দুনিয়ার ব্যাপারে কখনোই তৃপ্তি লাভ করে না।[৭]

449275

শিক্ষার অনন্য গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ইসলামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বয়ংক্রিয় কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে যারা জ্ঞান অর্জন করেন তাদেরকে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যেন অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করেন, মানুষকে শিক্ষা দান করেন এবং কোনোক্রমেই পার্থিব কোনো অসৎউদ্দেশ্য সাধনের জন্য জ্ঞান অর্জন না করেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার জানা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন রাখবে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।[৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে: হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি

---

[১] প্রাগুক্ত
[২] প্রাগুক্ত
[৩] প্রাগুক্ত
[৪] প্রাগুক্ত
[৫] প্রাগুক্ত
[৬] প্রাগুক্ত
[৭] প্রাগুক্ত
[৮] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানীদের সাথে তর্ক করার উদ্দেশ্যে বা মূর্খদের সাথে বিতর্ক করার লক্ষ্যে অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করেছে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[১] অন্যত্র আছে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব এমন জ্ঞান যদি কেউ দুনিয়ার সামগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করবে, কিয়ামাদের দিন সে বেহেশতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না।[২] অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। এমনকি বেহেশত থেকে এতটা দূরে রাখা হবে যে, সে বেহেশতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না।

জ্ঞানহীনতায় মন্দ পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সা) যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তা থেকেও ইসলামে শিক্ষার অন্তহীন গুরুত্বের বিষয়টি প্রমাণ হয়। জ্ঞানকে মহানবী (সা) কেবল জানার বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নিন্দা করেছেন। জানা এবং মানার সমন্বয় না হলে তাকে তিনি জ্ঞান বলেই স্বীকার করেননি। নানা বর্ণনায় জ্ঞানহীনতা এবং জ্ঞান প্রচারে ভূমিকা না রাখাকে তিনি ধ্বংস ও মন্দ পরিণতির কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) এফদিন কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন: আলিম কারা? তিনি বললেন: যারা জ্ঞান অনুসারে কাজ করে তারা। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন: আলিমদের অন্তর হতে জ্ঞানকে বের করে দেয় কে? তিনি জবাব দিলেন: লোভ।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা)কে সবচেয়ে মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন: মন্দ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। বরং ভালো লোক সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করো। নবী (সা) তিনবার এই কথা বললেন। এরপর বললেন: জেনে রাখ। সবচেয়ে মন্দ লোক হলো আলিমদের মধ্যে যারা মন্দ, তারা। এভাবে সবচেয়ে ভালো লোক হচ্ছে তারা যারা আলিমদের মধ্যে ভালো।[৪]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "কিয়ামাতের দিন মর্যাদার দিক হতে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মন্দ হবে সে ব্যক্তি যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।[৫]

উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেছেন, "আলিমদের পদস্খলন, মুনাফিকদের আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাদানুবাদ এবং গুমরাহ শাসকবৃন্দের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে দেবে।[৬]

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "শীঘ্রই মানুষের পক্ষে এমন এক যুগ আসবে যখন নাম ব্যতীত ইসলামের কিছুই বাকী থাকবে না, অক্ষর ব্যতীত কুর'আনেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ বাহ্যিকভাবে আবাদ হবে কিন্তু ভেতরে হবে হিদায়াতশূন্য। তাদের আলিমরা হবে আকাশের নিচে সবচেয়ে মন্দ লোক। তাদের নিকট হতেই দীন সংক্রান্ত ফিতনা প্রকাশ পাবে; অতঃপর সে ফিতনা তাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করবে।[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "তোমরা শিক্ষা অর্জন করো এবং লোকদেরকে শিক্ষা দাও। তোমরা ফারাইজ শেখো এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দাও। তোমরা কুর'আন শিক্ষা করো এবং লোকদেরকে শেখাও – কারণ আমি এমন এক ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত যাকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং জ্ঞানকে সহসাই উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর ফিতনা ও গোলযোগ সৃষ্টি হবে। এমনকি ফরয নিয়েও দুই ব্যক্তি মতবিরোধ করবে কিন্তু এমন কাউকেও রাস্তায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে তা মীমাংসা করে দিতে পারে।[৮]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে জ্ঞান দ্বারা কারো উপকার সাধিত হয় না তার উদাহরণ এমন এক ধন–ভাণ্ডারের যা হতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় না।[৯]

---

[১] প্রাগুক্ত
[২] প্রাগুক্ত
[৩] প্রাগুক্ত
[৪] প্রাগুক্ত
[৫] প্রাগুক্ত
[৬] প্রাগুক্ত
[৭] প্রাগুক্ত
[৮] প্রাগুক্ত
[৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত ফরয ইবাদত সম্পাদন, কল্যাণ লাভ, আল্লাহর সাহায্য লাভ, বিশেষ মর্যাদা লাভ, ক্ষমা ও জান্নাত লাভ, শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, তাকওয়া অর্জন, সফলের শুভাশীষ লাভ, আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং বৈষয়িক উন্নতি, নৈতিক পূর্ণতা, মানবিক গুণাবলির পূর্ণ বিকাশ, ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা, মুজাহিদের মর্যাদা, সত্যমিথ্যার পার্থক্য জানা, ইসলামকে সমুন্নত রাখা, নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারের কর্তব্য সম্পাদন, আল্লাহর আদেশ মানা, রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ মেনে চলা এবং পূর্ণাঙ্গ মুমিনের জীবন যাপনের জন্য শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। যে কারণে ইসলাম গ্রহণ করলে একজন মানুষের জন্য অনিবার্য হয়ে যায়, সে অবশ্যই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। যে শিক্ষা তাকে নৈতিক, বৈষয়িক, পার্থিব ও পারলৌকিক সকল দিক থেকে বিশেষভাবে সফল ও সমৃদ্ধ করবে।

বাংলাদেশে অশিক্ষার বর্তমান চিত্র

"আমাদের দেশের সাধারণ উচ্চশিক্ষা কতটুকু জরুরি এবং জরুরি হলে এই শিক্ষা কারা নেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। বিশ্ব যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে, দেশে দেশে চলছে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং সরকার যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না সেখানে সাধারণ শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হওয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু! শিক্ষার অধিকার সর্বজনীন – এই যুক্তিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকার সাধারণ শিক্ষায় যুবকদের উচ্চশিক্ষিত করছে অথচ চাকরির সংস্থান করতে পারছে না। ফলে প্রতিবছর বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচিত হতে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত বেকার তৈরির কারখানা হিসাবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এই পরিস্থিতিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়ার ওপর শাকের আঁটি। যে শিক্ষা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে না, যে শিক্ষায় কর্মসংস্থান হয় না, তার আবশ্যকতা কতটুকু তা আজ ভাবার সময় এসেছে।[১] সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিক একটি জাতীয় সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয়কে এভাবেই দেশের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। সাধারণ বিবেচনায় বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার যে ধারা বিদ্যমান রয়েছে আমরা অশিক্ষার পরিচয় দিতে যেয়ে দেখিয়েছি, তা মূলত অশিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যে শিক্ষা কাজে লাগে না, ব্যক্তির নিজের বা দেশের ভাগ্যোন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না, সে শিক্ষা ব্যর্থ এবং অপ্রয়োজনীয়। সাম্প্রতিক কালের কিছু গবেষণা ও নানা রকম হিসাব থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২০ বছরের জন্য প্রণীত 'উচ্চশিক্ষার জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা'য় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০০৭ সালের হিসাবে দেশের মোট ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি সরকারি এবং ৫৪টি বেসরকারি। মোট ৯ লাখ ৬০ হাজার ৬শ ৫৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লাখ ১৬ হাজার ৩শ ৯৭ জন (১২.১%), বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৮ হাজার ৬শ ৬৯জন (৯.২%) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় কলেজগুলোতে ৭ লাখ ৫৫ হাজার ৫শ ৮৮জন (৭৮.৭%)। শিক্ষার্থীদের ৩৫.৫ শতাংশ নারী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:১৭, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:১৬ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:১০।[২]

লরা জিন ভদ্র ও দীপাশিস ভদ্র তাদের গ্রন্থ 'Red and Green : A Bangladesh College' – এ রাজনীতি সংস্কৃতি ও শিক্ষায় মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতিমালা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন উচ্চশিক্ষায় সরকার প্রদত্ত বিপুলাঙ্কের ভর্তুকি মূলত অপচয়। এই ভর্তুকি প্রদান বাজারের সঙ্কেতের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়; শুধু তাই সাম্য প্রতিষ্ঠার মৌল নীতি থেকে সরে এসে এই ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে অসাম্যকে আরও বাড়ানো হচ্ছে। সুতরাং তাদের মতে, অবিলম্বে উচ্চশিক্ষা সংস্কারে হাত দেওয়া দরকার।[৩]

সনৎ কুমার সাহা তার 'Education and skill Building in Bangladesh' নিবন্ধে দক্ষতা বৃদ্ধিকেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার মন্ত্র হিসেবেশনাক্ত করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যা যাই বিতরণ করুক দক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষা কদাচিৎ দিয়ে থাকে। এরপরই প্রশ্ন এসে যায়, লক্ষতায় শিক্ষা যারা দেবেন, তারা কতটা দক্ষ।[৪]

---

[১] সাপ্তাহিক ২০০০, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩৯, সম্পাদকীয়

[২] আন্দালিব রাশদী, উচ্চশিক্ষায় ঘোড়া, সাপ্তাহিক ২০০০, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩৯, পৃ.৩২

[৩] লরা জিন ভদ্র ও দীপাশিস ভদ্র, Red and Green : A Bangladesh College, উদ্ধৃতি: আন্দালিব রাশদী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

[৪] সনৎ কুমার সাহা, Education and skill Building in Bangladesh, উদ্ধৃতি: আন্দালিব রাশদী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী[১] তাঁর 'Visions and Revisions : Higher Education in Bangladesh 1947-1992' গ্রন্থে চলমান উচ্চশিক্ষার কতগুলো অপচয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন:–

ক. সময় ও অর্থের অপচয়;

খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভর্তির সুযোগ কম থাকায় বিপুলাংশের মানবিক শাখায় ভর্তিজনিত অপচয়;

গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চাকরির বাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়াজনিত অপচয় এবং

ঘ. সেশন জ্যাম।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপচয়ের বাইরেও দক্ষতা হ্রাস ও গুণগত মান হ্রাসের চিত্র তুলে ধরেছেন। ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষা কাঠামোতে কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকার বিষয়টিও তার লেখায় উঠে এসেছে। রাজনীতির ছত্রছায়ায় ছাত্রনেতাদের ভয়াবহ দুর্নীতি এবং সন্ত্রস্ত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জীবন ও অঙ্গহানির নিত্যকার ঘটনারও তিনি উল্লেখ করেছেন।[২]

উচ্চশিক্ষায় রেট অব রিটার্ন কী? বিনিময় কী পাচ্ছি এটি একটি সাধারণ প্রশ্ন নতুবা বিনিয়োগ কেনো? গাজী মাহবুবুল আলম, মোঃ তাহের বিন খলিফা এবং মির্জা মোহাম্মদ শাহজামালের[৩] একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য গবেষণাপত্র দেশীয় তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার রেট অব রিটার্ন বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। নিচের ছকে বিষয়গুলোর বিন্যাস ও ধারণা ব্যক্ত করা হলো।

টেবিল ১: শিক্ষার্থী প্রতি সরকারি ব্যয়ের হিসাব[৪]

ক্রমিক	স্তর	একক প্রতি ভর্তুকি হিসেবে সরকারি ব্যয়	একক প্রতি মোট সরকারি ব্যয়
১	প্রাথমিক	৪৭০০ USD[৫]	৪৭০০ USD
২	মাধ্যমিক	৬৭০০ USD	১১৪০০ USD
৩	উচ্চমাধ্যমিক	৪৮০০ USD	১৬২০০ USD
৪	উচ্চশিক্ষা	১৭০০০ USD	৩৩২০০ USD

টেবিল ২: রেট অব রিটার্ন[৬]

ক্রমিক	স্তর	গড় অর্থনৈতিক রিটার্ন	গড় সামাজিক রিটার্ন
১	প্রাথমিক	৭.০	১৭.৫
২	মাধ্যমিক	৯.১৭	১৭.০
৩	উচ্চমাধ্যমিক	১৪.৬৯	১৩.৫
৪	উচ্চশিক্ষা	১১.৪৪	১৭.৩৭

টেবিল ৩: বেকারত্ব বাদে রেট অব রিটার্ন[৭]

[১] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, Visions and Revisions : Higher Education in Bangladesh 1947-1992, উদ্ধৃতি: আন্দালিব রাশদী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

[২] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, Visions and Revisions : Higher Education in Bangladesh 1947-1992, উদ্ধৃতি: আন্দালিব রাশদী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

[৩] গাজী মাহবুবুল আলম, মোঃ তাহের বিন খলিফা এবং মির্জা মোহাম্মদ শাহজামাল, উদ্ধৃতি: আন্দালিব রাশদী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

[৪] 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের আলোকে প্রস্তুত। পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫০-৫৯

[৫] United State's Dollar

[৬] ibid

[৭] ibid

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	স্তর	অর্থনৈতিক	সামাজিক	গড়
১	প্রাথমিক	৬.৭	১৭.৫	১২.১
২	মাধ্যমিক	৮.১	১৭.০	১২.৬
৩	উচ্চমাধ্যমিক	১২.২	১৮.৫	১৫.৪
৪	উচ্চশিক্ষা	৯.৪	১৩.৪	১৩.৫

টেবিল ৪: অবদান

ক্রমিক	স্তর	অবদান
১	প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবহার	১২.১
২	মাধমিক শিক্ষার ব্যবহার	১২.৬ – ১২.১ = ০.৫
৩	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবহার	১৫.৪ – ১২.৬ = ২.৮
৪	উচ্চশিক্ষা	১৩.৫ – ১৫.৪ = – ১.৯

উপরের তথ্য ও সূত্রগুলো বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, আমাদের উচ্চ শিক্ষার কোনো ব্যবহার নেই; বরং বিভিন্ন ধরনের ঋণাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারাই সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই অপ্রয়োজনীয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বেকার ও দুষ্কর্মকারী তৈরি করার আগে রাষ্ট্রকেই নির্ধারণ করতে হবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা ধারার আসলে কতজন প্রয়োজন। এর বেশি সৃষ্টি হলে সেই দায় রাষ্ট্রের কাঁধেই পড়ে। এই গবেষণার নমুন আকার ছোট হওয়ায় সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিলেও স্বীকার করতে হবে রেট অব রিটার্নের অঙ্ক না কষে কথিত উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাড়িয়ে লাভ নেই, ক্ষতিই। আর যে শিক্ষা দেশের এমনকি শিক্ষিত ব্যক্তির নিজেরও কোনো কাজে লাগে না বরং ক্ষতি করে সে শিক্ষা কোনোক্রমেই শিক্ষা হতে পারে না। সন্দেহাতীতভাবেই তা অশিক্ষা। সুতরাং বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার নামে যা চলছে তা আসলে অশিক্ষাই।

২০০২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৭৮৩৬৩, ২০০৬ সালে এটি ৮২০২০টিতে উন্নীত হয়েছে।[২] যদিও সাবেক রাষ্ট্রপতি লে. জে. হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ '৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে' বলে একটি শ্লোগান বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন কিন্তু বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার নয়। বাংলাদেশে সর্বমোট গ্রাম রয়েছে ৮৭৩১৯টি।[৩] প্রতি গ্রামে গড়ে প্রায় ১টি করে প্রাইমারি স্কুল। এছাড়াও রয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অগুণতি কিন্ডার গার্টেন, ইংরেজি ও আরবি মাধ্যমের নানা বিদ্যালয়। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন খুবই সামান্য। এডুকেশন ওয়াচ ২০০৮ প্রতিবেদন প্রকাশ। প্রাথমিক শিক্ষায় অর্জনের তুলনায় অপচয় হচ্ছে বেশি। "দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অর্জনের চেয়ে অপচয় হচ্ছে অনেক বেশি। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে অর্ধেক শিশু। ঝরে পরায় এই উচ্চহার শিক্ষার মানের অভাব, সম্পদের অপচয় এবং পুরো ব্যবস্থার অযোগ্যতাকে নির্দেশ করে। এডুকেশন ওয়াচ ২০০৮ প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও–য়ে এলজিইডি–আরডিইসি ভবন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা, অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে জরিপ ও গবেষণার ভিত্তিতে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিবেদনটি প্রস্তুত ও প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০০৫ সালের পর থেকে ভর্তির হারে স্থবির অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করা শিক্ষার্থীর কেবল প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের কথা, সেগুলোর কিছুটা উন্নতি হলেও এখন পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার অনেক নিচে রয়েছে। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া একটা বিরাট বাধা। এটা রোধ করতে সরকারকে আরও মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্ব বেশ ভালো কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থী ঝরে পরার মূল কারণ

[১] ibid

[২] ibid, p.459

[৩] মোঃ রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ.২১৮

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বই। প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীদের অনেকে বই কিনতে পারে না। এ কারণেই সরকার নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামি শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌঁছে যাবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, হাওর, পার্বত্য এলাকাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার জন্য সরকার বিশেষ মনোযোগ দেবে। আমরা সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কাছাকাছি মানের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ব্যাপার উঠে এসেছে। প্রথমত, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ঝরে পরার হার অনেক বেশি। তৃতীয়ত, বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল এখনো শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে সিলেটের মতো এলাকায় শিক্ষার হার নিচে যাওয়ার ব্যাপারটিও উঠে আসার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এসব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ। সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচের সভাপতি কাজি ফজলুর রহমান। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আসার বিষয়টি আনন্দের ব্যাপার হলেও এতে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কাজে লিঙ্গ সমতার বিষয়ে নজর দেয়া দরকার। প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা যেভাবেই দেয়া হোক না কেনো, সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা উচিত। প্রতিটি উপজেলার সব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা সমন্বয়ে অধিদপ্তরের পক্ষে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মূল ভূমিকা পালন করতে পারেন।[১]

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষিত বেকার তৈরি করছে এটা যেমন ঠিক তেমনি এটাও ঠিক যে, সময়োপযোগী সরকারি নীতিমালা এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে দেশে অনেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ শূন্য থেকে যাচ্ছে। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে এ চিত্র অত্যন্ত করুন। পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কেবল বরিশাল বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের ১৪৪৮টি এবং শিক্ষা কর্মকর্তার ৮২টি পদ শূন্য রয়েছে। রিপোর্টটিতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়: বরিশাল বিভাগের ছয় উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় নাজুক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিভাগের ছয় জেলায় শিক্ষকের এক হাজার ৪৪৮টি পদ শূন্য রয়েছে। একই সঙ্গে এই ছয় জেলায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ১৭টি এবং সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ৬৫টি পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষক সংকটের কারণে বিদ্যালয়ে পাঠদান এবং শিক্ষা কর্মকর্তার সংকটে বিদ্যালয় তদারক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।[২]

দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় বিপর্যয়ের আরেকটি চিত্র পাওয়া যায় ইউনিসেফ ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে। জরিপে দেখা যায়, দেশের ৯১ শতাংশ শিশুই স্কুলে শারীরিক শাস্তি ভোগ করে। দেশের মোট তিন হাজার ৮৪০টি পরিবারের ওপর এই জরিপ চালানো হয়। এতে শারীরিকভাবে সীমাবদ্ধ, দুর্যোগ এবং লিঙ্গ বিষয়ে শিশুদের মতামত নেয়া হয়েছে। ছেলে ও মেয়ে শিশুদের সমানভাগে ভাগ করে এতে প্রায় চারহাজার শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এদের বয়স ৯ থেকে ১৩ বছর এবং ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। এমনকি গৃহকর্তার সাক্ষাৎকারও এতে স্থান পায়। একই সঙ্গে এই জরিপের আওতায় ২০টি ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা হয়, ১০টি উপকরণ ও পথশিশুদের নিয়ে একটি বিশেষ জরিপও পরিচালনা করা হয়।[৩]

এ সকল জরিপ এবং নানা পরিসংখ্যান থেকে একান্তভাবে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটি হলো, বাংলাদেশের মানুষের জন্য প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষা বান্ধব পরিবেশের পরিবর্তে শিক্ষা বিরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। এখানে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে এলেও পারিপার্শিক কারণে সে আগ্রহ ও পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। ক্রমান্বয়ে সে বাধ্য হয়ে শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়।

---

[১] প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৩

[২] প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.৫

[৩] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল–৫: বাংলাদেশে শিক্ষার একটি সার্বিক চিত্র[১]

ক্রমিক	নির্দেশনা	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
১	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৮৩৬৩	৭৯৮৩৩	৮২৮৬৮	৮০৪০১	৮২০২০
২	প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতি গড় শিক্ষক	৪	৪	৪	৪	৪
৩	প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতি গড় শিক্ষার্থী	২৬৮	২১৯	২১৬	২০২	২০০
৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬৫৬২	১৭৩৮৬	১৮২৬৭	১৮৫০০	১৮৭০০
৫	মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতি গড় শিক্ষক	১৩	১২	১২	১৩	১৩
৬	মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতি গড় শিক্ষার্থী	৪৬৩	৪৬৭	৪১১	৪০০	৩৯৭
৭	সাধারণ কলেজ	২৬৩৪	২৭৯৪	২৮৯৯	৩১৫০	৩১৯৭
৮	সরকারি মেডিকেল কলেজ	১৪	১৪	১৪	১৪	১৫
৯	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	১২	১৪	১৪	২৭	২৭
১০	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	-	-	-	-	-
১১	বেসরকারি আইন মহাবিদ্যালয়	৫৯	৬৩	৬৩	৭০	৭১
১২	কৃষি মহাবিদ্যালয়	-	-	-	-	-
১৩	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড	৭	৭	৭	৭	৭
১৪	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	১৭	২১	২১	২৪	২৭
১৫	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	৪১	৫২	৫৩	৫৪	৫১
১৬	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১১	১১	১১	১৪	১৪
১৭	প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪
১৮	সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	২০	২০	৩৭	৩৭	৪২
১৯	সরকারি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪
২০	সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৩৯
২১	বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	-	-	-	-	-
২২	হোমিওপ্যাথিক কলেজ	২৯	৩০	৩০	৩০	৩০
২৩	আয়ুর্বেদিক কলেজ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৬
২৪	মেডিকেল এসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল	৮	৮	৮	৮	৮
২৫	সরকার অনুমোদিত মাদরাসা	৭৮২০	৮৪১০	৮৮১৯	৯২১৪	৯৩৬১
	ক) দাখিল	৫৫৩৬	৫৯৯৫	৬৩১৫	৬৬৮৫	৬৭৯৮
	খ) আলিম	১১০৫	১২২০	১৩২০	১৩১৫	১৩৪৫
	গ) ফাযিল	১০৩২	১০৩০	১০১২	১০৩৯	১০৪০
	ঘ) কামিল	১৪৭	১৬৫	১৭২	১৭৫	১৭৮
২৬	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৯২১৫২	১০৪৭৩৬	১১২৩২৭	১১৬৩৯৭	১৫৩২৪৯
	ক) ছাত্র	৬৮৯২৯	৭৮৯২৪	৮৪৩৭৪	৮৬৯২২	১১৬৬৮৭
	খ) ছাত্রী	২৩২২৩	২৫৮১২	২৭৯৫৩	২৯৪৭৫	৩৬৫৬২
২৭	শিক্ষক–শিক্ষার্থী অনুপাত					
	ক) প্রাথমিক	১ঃ৫৬	১ঃ৫৪	-	-	১ঃ৪৮
	খ) মাধ্যমিক	১ঃ৪৪	১ঃ৩৯	-	-	১ঃ৩১
	গ) উচ্চমাধ্যমিক	১ঃ২৩	১ঃ২০	-	-	১ঃ১৫
	ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়	১ঃ১৫	১ঃ১৭	-	-	১ঃ২৪
২৮	সাক্ষরতা (৭ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৪৮.৮	৪৯.১	৫০.০	৫২.১	৬১.৩
২৯	প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষরতা (১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব)	৪৯.৬	৫০.৩	৫১.৬	৫৩.৫	৫০.৫
৩০	ব্যয় (মিলিয়ন ও টাকায়)	৫৮৭৭	৬৫০৪	৬৭৫৮	৭১৩০	৯১০২২

[১] 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh, ibid, p.459

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অনেকগুলো শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালে কমিশন প্রতিবেদন জমা দিলেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর ওই প্রতিবেদন বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে। ১৯৭৯ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শিক্ষা উপদেষ্টা কাজী জাফরের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিটি গঠন করেন। ১৯৮৩ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনা কমিশন গঠন করেন আব্দুল মজীদ খানের নেতৃত্বে। ছাত্র বিক্ষোভের মুখে এ কমিশন বাতিল করা হয়। ১৯৮৬ সালে মফিজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের কারণে এ শিক্ষা কমিশনও বাতিল হয়ে যায়। ১৯৯৩ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার প্রাথমিক ও শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন করেন। বিজ্ঞান লেখক আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন এ টাস্কফোর্সের সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন জমা দেন। এটি বাস্তবায়নে সুপারিশ মূল্যায়ন ও অর্থায়নের জন্য ১৯৯৮ সালে ড. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়।

তারপরীয় জোট সরকারের নেতৃত্বে ২০০২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বারীর নেতৃত্বে শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। ২০০২ সালের ২১ অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৪ সালের মার্চে কমিশন প্রতিবেদন জমা প্রদান করে।[১] বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, এ যাবত গঠিত এ সকল শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন কখনোই আলোর মুখ দেখেনি। কমিটির কোনো সুপারিশ অপরিবর্তিত অবস্থায় বাস্তবায়ন হয়নি। বিশেষত এক সরকারের আমলে যে শিক্ষানীতি প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে পরবর্তী সরকার এসে আবশ্যকীয় কর্তব্য হিসেবে সে নীতি বদলে দিয়েছে। পূর্ববর্তী শিক্ষানীতির ভালো দিকগুলোও বিনাবিচারে বর্জন করা হয়েছে। শিক্ষানীতি সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সীমা অতিক্রম করতে না পারার কারণে বারবার এ দেশের শিক্ষানীতির মত একটি মৌলিক নীতি রাজনীতিবিদদের অন্যায় পদক্ষেপ ও বালখিল্যতার শিকার হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালে নতুন আরো একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তাব আকারে উথাপন করেছে। এটি পরিচিত হয়েছে শিক্ষানীতি ২০০৯ নামে।[২] এটিও যে সর্বজনীন এবং বিতর্কমুক্ত কোনো শিক্ষানীতি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। শিক্ষানীতিতে "সংবিধানে লিখিত 'গণমুখী' শব্দের পূর্বে 'সেক্যুলার' শব্দটি ব্যবহার করে কমিশন তাদের শিক্ষানীতিকে অকারণে বিতর্কিত করেছে। বিতর্কিত করেছে বলছি এ জন্য যে, একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেকুলার করার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে প্রাক-প্রাথমিক পর্বে শিশুদের মসজিদ, মন্দির এবং প্যাগোডায় নেবার প্রস্তাবও রয়েছে।[৩] রাজনৈতিক ক্ষমতায় হয়তো বর্তমান সরকার সর্বশেষ শিক্ষানীতির অনেকখানিই বাস্তবায়ন করে যাবে। কিন্তু এর চূড়ান্ত পরিণতিও যে অন্যান্য শিক্ষাকমিশনের চেয়ে আলাদা হবে না তা বিদগ্ধজনের মন্তব্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

বিচারপতি আবদুর রউফ বলেন, "সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আর চটি বইয়ের জ্ঞান নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যায় না। মানুষকে অমানুষ করার জন্য কোনো শিক্ষানীতির প্রয়োজন নেই।[৪]

কওমী ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, "কওমী মাদরাসাকে দূরে রেখে সরকার কখনই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারবে না। সরকারকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।[৫]

অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের ভাষ্য, "বর্তমান কমিটি শিক্ষানীতি করেছে কিন্তু নীতির বিষয়ে কিছুই বলেনি, তারা কেবল কাঠামোর কথা বলেছে। নীতি, মেধা, দর্শন সংক্রান্ত কোনো কথাই এখানে নেই।[৬]

---

[১] পাঠশেরী শিক্ষা সংবাদ, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বিশেষ ক্রোড়পত্র, নভেম্বর ২০০৯, পৃ.০২

[২] পাঠশেরী শিক্ষা সংবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.০২

[৩] এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি : কটি কথা, পাঠশেরী শিক্ষা সংবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.০৯

[৪] বিচারপতি আবদুর রউফ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ২০০৯

[৫] কওমী ওলামায়ে কেরাম, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ অক্টোবর, ২০০৯

[৬] অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, দৈনিক সমকাল, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

"এতদিন কলেজে যারা পড়াতেন, উচ্চমাধ্যমিককে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাদের অনেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক হয়ে যাবেন – সেটা স্বাভাবিকভাবেই সবাই মেনে নেবেন, সেটা চিন্তা করাও মুশকিল।"[১]

হাসানুল হক ইনু বলেন, "বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরির গ্যারান্টি ক্লজ না রেখে এবং তাদের চাকরি জাতীয়করণ না করে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করলে তাতে ভালো ফল আসবে না।"[২]

ড. তারেক শামসুর রেহমানের মতে, "প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষক–শিক্ষণে এর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এতে করে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মাঝে এক ধরনের বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। এর চাইতে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মাতৃভাষা শেখানো যেতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থায় পাঠদান নয়।"[৩]

ড. এম. এইচ. খান বলেন, "প্রায় ১০ ভাগ স্কুলগামী না হওয়ার এবং বিপুল সংখ্যক ঝরে পড়ার পেছনে যে আর্থ–সামাজিক কারণগুলো রয়েছে, তা বিবেচনায় নিয়েই সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।"[৪]

সবদিক মূল্যায়ন করলে বাংলাদেশে অশিক্ষার স্থায়ী দাপট লক্ষ্য করা যায় যাতে নিরক্ষর লোকজনের উপস্থিতি যেমন রয়েছে তেমনি শিক্ষিত লোকদের নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকদের মত আচরণও প্রবলভাবে বিদ্যমান।

বাংলাদেশের অশিক্ষা নিরসনে ইসলামি বিধানের ভূমিকা

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই অধিকার ভোগের সুযোগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের উপর অর্পিত রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭তে উল্লেখ করা হয়েছে,

ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক–বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ) রাষ্ট্র সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ) রাষ্ট্র আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৫]

সংবিধানে বাংলাদেশকে এ সকল স্পষ্ট ও প্রগতিশীল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনে লাগে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং সমাজের ঘাড়ে বিশাল বোঝা হয়ে অবস্থান করে এবং সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক তৈরি করে না – রাষ্ট্র যখন করদাতা ও জনগণের অর্থে সে শিক্ষার আয়োজন করে তার সবটাই অপচয়। এর জবাবদিহিও রাষ্ট্রেরই করার কথা। সাক্ষরতা অর্জনে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সাফল্য বেশ প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে দেশে শিক্ষিতের হার ছিলো ১৭.৬০% ভাগ। এরমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলো ৬৩.৫% ভাগ, প্রবেশিকা উত্তীর্ণ ২.৮% ভাগ এবং উচ্চ ও তদূর্ধ্ব মাত্র ১% ভাগ। তখন পল্লী এলাকায় অশিক্ষিতের হার ছিলো ৮৯%ভাগ।[৬] সে সময়ে পুরুষের স্বাক্ষরতার হার ছিলো ২৬% ভাগ আর মহিলাদের মাত্র ৮.৬%ভাগ।[৭] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে শিক্ষিতের হার ছিলো ২০.২%ভাগ। এরমধ্যে পুরুষের শতকরা হার ২৭.৬ ভাগ এবং মহিলাদের ১২.২ ভাগ।[৮]

---

[১] ফাহিমা খাতুন, দৈনিক সমকাল, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯

[২] হাসানুল হক ইনু, দৈনিক সমকাল, ২২ অক্টোবর ২০০৯

[৩] ড. তারেক শামসুর রেহমান, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ২০০৯

[৪] ড. এম এইচ খান, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ২০০৯

[৫] সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অনুচ্ছেদ ১৭

[৬] আ.স.ম নুরুল ইসলাম ও মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচী, বইপত্র, ঢাকা ২০০২, পৃ.২৭

[৭] Population Census 2001 ibid, p.71

[৮] Population Census 2001, ibid, p.71-73

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৯.৭% ভাগ লোককে স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হিসেবে দেখানো হয়, যার মধ্যে পুরুষের শিক্ষার হার ২৫.৫% ভাগ এবং মহিলাদের শিক্ষার হার ছিলো ১৩.২% ভাগ।[১] ১৯৯১ সালে জনসংখ্যার ২৪.৯% ভাগ লোক স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলো। এরমধ্যে পুরুষের শিক্ষার হার ছিলো ৩০%ভাগ আর মহিলাদের ১৯.৫% ভাগ।[২] ২০০১ সালে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ছিলো ৪২.৫% ভাগ।[৩] একই নীতিতে দেশে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে স্বাক্ষরতার হার ৬২.৬৬% ভাগ।[৪] চার দশকের প্রচেষ্টায় দেশে সাক্ষরতার ক্রমবর্ধমান এই হার অবশ্য প্রশংসিত হওয়ার মতই। তবে বিভিন্ন সময় সাফল্যের নজির হিসাবে যে সব কর্তাভজা পরিসংখ্যান তৈরি করা হয় তা নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন করা যেতেই পারে।[৫] পরিসংখ্যানগত ফাঁকির বিষয়টি আমলে না নিয়ে ৬২.৬৬% ভাগ লোককে সাক্ষর বিবেচনা করে অবশিষ্ট ৩৭.৩৪% লোককে কীভাবে সাক্ষর করা যায় যে বিষয়ে ইসলামি বিধানকে কাজে লাগানো এবং যাদেরকে শিক্ষিত বিবেচনা করা হচ্ছে তাদেরকে কীভাবে ইসলামি বিধানের আলোকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের বোঝার পরিবর্তে সম্পদে পরিণত করা যায় এ পর্যায়ে সেই কর্মকৌশল প্রস্তাবনা আকারে উপস্থাপন করা হবে।

১। ঈমানের দাবি পেশ করা: বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এ দেশের জনগণ সাধারণভাবে ধর্মভীরু। বুঝে বা না বুঝে এ দেশের লোক ইসলামের প্রতি গভীর মমতা পোষণকরেন। তাঁরা হয়তো নিয়মিত নামায আদায় করেন না, সুদ-ঘুষের লেনদেন করেন, মিথ্যা বলেন, মানুষের হক নষ্ট করেন, পণ্যে ভেজাল দেন, অন্যায় ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করেন, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন – তা সত্ত্বেও নিজেদেরকে অমুসলিম হিসেবে দেখতে বা দেখাতে পছন্দ করেন না। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, ঈমানের দাবি সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ঈমান ও ইসলাম বিরোধী কাজ করেও নিজেদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করতেই ভালোবাসেন। সত্যিকারার্থে তারা যদি বুঝতে পারতেন বা তাদের চৈতন্যে যদি এই বোধ ও চেতনা ঢুকিয়ে দেয়া যেতো যে, তারা যা করছে তা একান্তভাবে ইসলামবিরোধী এবং এসকল কাজ করে তারা মুসলিম থাকতে পারে না, তাহলে অধিকাংশই এগুলো থেকে বিরত থাকত। সেই শিক্ষা ও পরিবেশ বাংলাদেশে অদ্যাবধি তৈরি হয়নি। ইসলামি বিধান অনুসরণ করে সেই প্রেক্ষাপট খুব সহজেই তৈরি করা সম্ভব।

২। ইবাদাতের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা: বাংলাদেশের মুসলিমগণ আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ক্ষেত্রে আগ্রহী। ইবাদত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে অথবা ঈমানী চেতনায় সুদৃঢ় না হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে ইবাদতে অসীম অলসতা ও অনাগ্রহ দেখা গেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যায়। নানা স্তরের লোকদের বর্ণনা ও বিভিন্নমুখী মতাদর্শের কারণে অনেকেই আখিরাতে মুক্তির প্রথাসিদ্ধ পথের পরিবর্তে 'শর্টকার্ট ওয়ে' ব্যবহারে আগ্রহী হন এবং এরই অংশ হিসেবে শবে বরাত রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেন কিন্তু ফরয নামায বাদ পড়ে যায়। বস্তুত ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণেই বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তারা সঠিকভাবে যে বিষয়টিকে ইবাদত হিসেবে জানেন এবং যে ক্ষেত্রে বিষয়টি তাদের মনের মধ্যে সক্রিয় ক্রিয়া করে তেমন প্রত্যেকটি ইবাদত তারা নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালনের চেষ্টা করেন। উল্লিখিত ইবাদতগুলোর উদাহরণ থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ ইসলামে সুনির্দিষ্ট করে ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা বলতে কিছু নেই। ইসলামে ইবাদত হলো আল্লাহর হুকুম পালন করা। তিনি যা করতে বলেছেন, তা করা। যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। যেমন সাধারণভাবে মনে করা হয়, নামায আদায় করা ইবাদত। অথচ তা নয়। বরং ইবাদত হলো আল্লাহর আদেশ মেনে তিনি যেভাবে আদায় করতে বলেছেন ঠিক

---

[১] Population Census 2001, ibid, p.71-73

[২] Population Census 2001, ibid, p.71-73

[৩] Population Census 2001, ibid, p.71-73

[৪] অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮, পূর্বোক্ত, পৃ.১

[৫] আন্দালিব রাশদী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১

Dhaka University Institutional Repository

তেমনভাবে নামায আদায় করা। তিনি আদেশ করেননি বরং নিষেধ করেছেন বলে দিনের তিনটি বিশেষ সময়ে[১] নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। এসময়গুলোতে নামায আদায় না করাই ইবাদত। একইভাবে নামায আদায় করতে হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু তা না করে কেউ যদি লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করে তাহলে তা ইবাদত হবে না। বরং এমন নামায ব্যক্তির আখিরাতে ধ্বংস নিশ্চিত করবে। আল্লাহ বলেন: "ধ্বংস সেইসকল সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে।[২]

আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে তাঁর হুকুম না মেনে মানুষকে দেখানোর জন্য আদায় করা সালাত ইবাদত নয়। আবার আল্লাহর হুকুম মেনে যদি প্রতিবেশীকে নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্র-আসবাব ধার দেয়া হয় তাহলে সেটিও ইবাদত হতে পারে। এর তাৎপর্য হলো, মানুষ তার গোটা যে জীবনে যে কাজই করুক, তা যদি আল্লাহর হুকুম মেনে করা হয় তাহলে তা ইবাদত হবে। সে বিয়ে করুক, সন্তান প্রজননে অংশ নিক, সন্তানের জন্য স্ত্রীর জন্য পোশাক-গহনা ক্রয় করুক, তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করুক, চাকুরি করুক, মানুষের সাথে ভালো আচরণ করুক, মন্দ আচরণ করুক, ব্যবসায় করুক বা বিশ্রাম নিক – সব কাজই যদি আল্লাহর হুকুম মেনে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তাহলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশের সাধারণ ধর্মভীরু মুসলিমদের মনে যদি এই প্রেরণা সঠিকভাবে তৈরি করে দেয়া যায় তাহলে তারা আল্লাহর হুকুম মেনে সকল কাজ করার চেষ্টা করবেন। বিশেষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করাও যে একটি ইবাদত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত সে বিষয়টি যথার্থভাবে তাদেরকে বুঝানো সম্ভব হলে তারা আল্লাহকে রাজিখুশি করানো এবং আখিরাতে সফলতা লাভের মাধ্যম হিসেবেই লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করবেন।

৩। **কর্মমুখী এবং সময় ও প্রেক্ষাপট উপযোগী শিক্ষা চালু করা:** সাধারণভাবে একটি ভুল ধারণা বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রয়েছে। তারা মনে করেন, ইসলামি শিক্ষার অর্থই হলো কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, কালাম, তাফসীর, বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। ইসলামি শিক্ষার তাৎপর্য হলো ঈমান ও আমলের প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সকলেই সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবেন নির্দিষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বগণ, সাধারণ মানুষ যাদেরকে আলিম হিসেবে গণ্য করেন। অবশিষ্ট মুসলিমগণ আকীদা ও আমলের সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পর বিশেষভাবে এমন জ্ঞান অর্জন করবেন যা কর্মমুখী এবং বাস্তব চাহিদাপূর্ণ।

৪। **উপার্জনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করা:** বাংলাদেশকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে ইসলামের বিধানকে সক্রিয় করতে হলে বা ইসলামি বিধানের সহযোগিতা নিতে হলে বিশেষভাবে এদেশের সাধারণ মুসলিমের নিকট ইসলামের উপার্জন নীতিটি ব্যাখ্যা করতে হবে। ইসলামে নামায আদায় করা যেমন ফরয তেমনি কাজ করে উপার্জন করাও ফরয। কুর'আন মজীদে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন: "যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) উপার্জন করবে।[৩] আয়াতে যে নির্দেশে নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে সেই একই ভাব ও ভাষায় নামায শেষে কাজ করে জীবিকা উপার্জনের কথা বলা হয়েছে। কেউ যদি সত্যিকারের মুমিন হয় এবং মুমিন হিসেবে জীবনযাপন করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ইসলামি আইন মেনে নামায আদায়ের মত গুরুত্ব দিয়ে জীবিকা উপার্জনের কাজও করতে হবে। আর ভালোভাবে জীবিকা উপার্জন করতে হলে প্রয়োজন কর্মের সঠিক জ্ঞান। ইসলাম বিশেষভাবে কর্মের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে। বাংলাদেশের মুসলিমগণ যদি জানেন, ইসলামে জীবিকা উপার্জন ফরয কাজ, আল্লাহর আদেশ মেনে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজের ও পরিবারের জন্য জীবিকা উপার্জন করলে অসীম সওয়াবের

---

[১] সূর্যোদয়ের সময়, সূর্য ঠিক মধ্যগগণে অবস্থানের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ।

[২] আল-কুর'আন, সূরা মাউন: ১-৭

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল-কুর'আন, ৬২: ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী হওয়া যাবে এবং কর্মের সঠিক জ্ঞান ছাড়া কাঙ্ক্ষিত মানে জীবিকা উপার্জন সম্ভব নয় তাহলে তারা অবশ্যই কর্মের জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করবেন।

৫। **মসজিদকে ব্যবহার করা:** বাংলাদেশ একটি ধর্মভীরু মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ। হতে পারে এই সকল ধর্মভীরু লোক ইসলামের সকল বিধি মেনে চলে না। হতে পারে তাদের জীবনে প্রকৃত ইসলামের উপস্থিতি খুবই কম। কিন্তু এটা সত্য যে, নানা রকম অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ আল্লাহর ঘর হিসেবে মসজিদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। মসজিদ নির্মাণকে জান্নাত লাভের অন্যতম উসিলা বলে বিশ্বাস করেন। সে কারণে দেখা যায়, দেশের প্রায় প্রতি মহল্লায়-গ্রামে ন্যূনতম একটি মসজিদ অবশ্যই রয়েছে। দেশের রাজধানী ঢাকা বিশ্বের দরবারে 'মসজিদের শহর' হিসেবে বিশেষ খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছে। মসজিদের রয়েছে নিজস্ব ভবন। স্থানীয় অধিবাসীদের গড় জীবনযাত্রার মান এবং সবচেয়ে ভালো থাকার ঘরের চেয়েও মসজিদের নির্মাণ শৈলি, ব্যবহৃত উপাদান আধুনিক এবং উন্নত হয়ে থাকে। মসজিদের পরিবেশ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের উচ্চ ধারণা তৈরি হয়। এখানে মানুষ পবিত্রতা ছাড়া প্রবেশ করে না। অশ্লীল আচরণ ও কথাবার্তা থেকে মসজিদ সবসময়ই পবিত্র থাকে। অথচ এ সুরম্য, সুন্দর ও পবিত্র স্থাপনা বাংলাদেশে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সর্বোচ্চ ৫ ঘণ্টা ব্যবহৃত হয় মসজিদের স্থাপনা ও প্রতিবেশ। বাকী ১৯ ঘণ্টা অব্যবহারে অর্থহীন অপচয় হয় মুসলিম সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই স্থাপনাটি। অশিক্ষার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে মসজিদকে তাই বিশেষভাবে নানা উপায়ে ব্যবহার করা সম্ভব। মক্তব প্রতিষ্ঠা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র বা গণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে মসজিদকে ব্যবহার করা যায়। শিক্ষাবিস্তারে মসজিদের ভূমিকা সবচেয়ে বড় প্রমাণ মহানবী (সা)-এর নিজের কর্মতৎপরতা। তিনি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্যে মসজিদে নববীকে সাধারণ শিক্ষালয় ও আবাসিক গণশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। আহলে সুফ্ফা নামক একদল নিবেদিতপ্রাণ জ্ঞানসাধক সব সময় মসজিদেই অবস্থান করতো। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এই মসজিদে কিছু ভালো জিনিস শিখতে বা শিক্ষা দিতে আসে সে যেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ।[১] এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন ইমাম সাহেবগণ। তাঁরা খুতবায় নিরক্ষরতার পরিণতি ও পাপ যেমন তুলে ধরতে পারেন তেমনি সমাজের শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক মনোনীত করে নৈশ বিদ্যালয় ও মক্তব পরিচালনার কাজ করতে পারেন।

বস্তুত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সহজ, সরল, ধর্মভীরু। ধর্মীয়ভাবে তাদেরকে যদি শিক্ষার উপযোগিতা বুঝানো যায়, ধর্মীয় কারণে তাদের প্রতি যে শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যক তা প্রমাণ করা যায় এবং শিক্ষার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করা সম্ভব এটি যদি যৌক্তিকভাবে বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে অধিকাংশ মানুষ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, লোকেরা শিক্ষা বলতে যেন উচ্চশিক্ষা না বোঝে। কারণ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা নিতান্তই সময়, সম্পদ আর সম্ভাবনার অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবে এর কোনো উপযোগিতা এবং ব্যবহার নেই বলে সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় না। না জানার কারণে কেউ কেউ খানিকটা শ্রদ্ধা হয়তো প্রদর্শন করেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সব তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের পরিণতি দেখে শিক্ষায় আর কোনো আগ্রহই তাদের থাকে না। এ কারণে ইসলামি বিধানে মানুষের প্রাথমিক কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য যে পর্যায়ের শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে সকলের জন্য সে পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে ব্যক্তি যেমন শিক্ষায় আগ্রহ পাবে, তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থহীন বিপুল অর্থ ও সময় অপচয়ের অবৈজ্ঞানিক ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে আর এভাবেই গোটা দেশ অশিক্ষার অন্ধকার মুক্ত হবে।

---

[১] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ইলম

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বাংলাদেশের প্রধানতম সামাজিক সমস্যা। দুটো সমস্যা পারস্পারিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কে সম্পর্কিত। দরিদ্রতার কারণে বেকারত্ব কিংবা বেকারত্বের কারণে দরিদ্র। অন্তর্গত এই সম্পর্কের কারণে বিষয় দুটোকে একই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য আলোচনা স্বকীয়তা বজায় রেখেই সম্পন্ন করা হয়েছে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সমস্যা থেকে মুক্তির ইসলামি উপায় আলাদা আলাদাভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে।

৫.১ দারিদ্র্য

দারিদ্র্যের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নেই, আর নেই এর সর্বজনগ্রাহ্য কোনো নির্দেশক, যদিও দারিদ্র্যের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী ভীতিপ্রদ আবেদন রয়েছে।[১] অর্থনীতির দৃষ্টিতে আয়স্তরের ন্যূনতম সীমারেখাই দারিদ্র্য নির্দেশক। একজন মানুষের বেঁচে থাকা ও তার দৈনন্দিন স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম চালানোর জন্য যে ন্যূনতম ক্যালোরি গ্রহণ প্রয়োজন এবং সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম যে মাত্রা দরকার; এ দুয়ের ভিত্তিতে যে আয় আবশ্যকীয় নির্ণিত হয়, তাকে দারিদ্র্যসীমা আয় বলা যেতে পারে।[২] দারিদ্র্যকে কেউ কেউ বলেছেন সাংস্কৃতিক দৈন্যতা।[৩] দারিদ্র্যভুক্ত বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশ বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যার দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ।[৪] দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার সমন্বিত রূপ[৫] কিংবা স্বল্প আয় যা কি-না কেবল প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে অপ্রতুল।[৬]

দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি বা অপুষ্টির আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যায়।[৭] অনেকে দারিদ্র্যকে ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্যে দেখার চেষ্টা করেছেন।[৮] দারিদ্র্যকে অনেকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৯] দারিদ্র্য এমন এক অবস্থা যাতে প্রয়োজনসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না।[১০]

প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য ২১২২ ক্যালোরি খাদ্য, ৫৮ গ্রাম প্রোটিন ক্রয়ে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে ধরা হয় দারিদ্র্যসীমার নিচের জনগোষ্ঠী। আর ১৮০৫ ক্যালোরি খাদ্যও কোনোভাবে জোটাতে পারে না যে জনগোষ্ঠী তাদের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার চরম নিচে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জন্য এ মান নির্ধারণ করে দিয়েছে।[১১]

---

[১] ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশের দারিদ্র ঃ কিছু সমস্যা ও কিছু সুপারিশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৪শ সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ.১৫২

[২] ড. সেলিম জাহান, সাপ্তাহিক রোববার, ৮ম বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, পৃ. ৪৩

[৩] W. A. Friedlander & R. Z. Apte, Introduction to Social Welfare, Prentio Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1974, pp.281-82

[৪] J. L. Hanson, A Dictionary of Economics and Commerce, London 1975, p.308

[৫] Charles Booth, Labour and Life of the People in London, London 1902

[৬] Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, London 1941, p.225

[৭] P. D. Ojha, Configuration of Indian Society, Adam Publisher's and Distributors, Delhi 1995; V. M. Dandekar & N. Path, Poverty in India, Cosmo Publishing Co, Delhi 1994; Montek Ahluwalia, Rural Poverty and Agricultural Performance in India, Journal of Development Studies, New Delhi 1996

[৮] Desia, Rural Development of Rural Poor, Ahmadabad, 1991

[৯] Rose Michael, The Relief of Poverty, Macmillan, London 1989

[১০] Robert Chambers, Poverty in India : Concepts, Research and Reality, Concept Publishing Co, Delhi 1996

[১১] ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, পূর্বোক্ত, পৃ.৬১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করেছে পরিবারভিত্তিক খরচের তালিকা ও দারিদ্র্যের প্রকৃত ভোগের পরিমাণ থেকে এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্যসীমা আয় বের করেছে Food & Agriculture Organization (FAO) কর্তৃক সুপারিশকৃত ভোগ্যপণ্যের মানকে চলমান দামে মূল্যায়িত করে তার সঙ্গে এই মূল্যের ২৫ শতাংশ যোগ করে।[১]

তবে অর্থনীতিতে প্রথমতঃ দারিদ্র্য হলো একটা অবস্থা এবং এই দারিদ্র্যাবস্থায় একজন মানুষ তার ন্যূনতম শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্য এমনই এক নির্দেশক যা কোনো একটি সমাজের আয় বা সম্পদ বিতরণে উক্ত সমাজের কোনো ব্যক্তি বা কোনো একটি পরিবারের অবস্থানকে চিহ্নিত বা সূচিত করে।[২]

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, দারিদ্র্য হলো সমাজের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এমন একটি রূপ, পর্যায় বা স্তর যেখানে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার তার ন্যূনতম শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজনসমূহ পূরণে ব্যর্থ হয় এবং এই অবস্থাটি তার শারীরিক ও মানসিক কর্মদক্ষতা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, দারিদ্র্যকে কোনো একমুখী নির্দেশকের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। অর্থনীতিবিদগণ তাই দারিদ্র্য বিশ্লেষণে একটি নির্দেশকের পরিবর্তে বিশেষ কতগুলো নির্দেশকের আশ্রয় নিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ, পুষ্টিস্তর, বাসস্থানের মান ও ধরন, চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষার স্তর, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার স্তর প্রভৃতি।

ইসলামে দারিদ্র্যের ধারণা ও প্রকৃতি

ইসলামে দারিদ্র্য গ্রহণযোগ্য নয়। বরং দরিদ্র অবস্থায় পৃথিবীতে এলেও কেউ যেন দরিদ্র না থাকে সে বিষয়ে ইসলাম সর্বাত্মক কর্মসূচি ও নির্দেশনা প্রদান করেছে। মহানবী (সা) মুসলিম উম্মাহকে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট অভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার তাগিদ দিয়েছেন, ক্ষেত্র ও পাত্রভেদে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সমাজে যাতে দারিদ্র্য আসতে না পারে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণকে ইসলামি সরকারের ও মুসলিম জনগণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। এমন চেষ্টার পরও কোনো কারণে যদি দারিদ্র্য এসে যায় তাহলে তা যেন স্থায়িত্ব লাভ না করে বা বেশিদিন না টেকে সে চেষ্টা করার জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১। আয়-উপার্জন বৃদ্ধি: ইসলাম একান্তভাবে নামাযের মত গুরুত্ব দিয়ে আয়-উপার্জনের আদেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন, "যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) উপার্জন করবে।[৩]

মহানবী (সা) বলেছেন, "হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা আরও একটি ফরয।[৪] তিনি আরো বলেছেন, "ব্যক্তির জন্য নিজের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কোনো খাবার নেই।[৫]

যারা দারিদ্র্যের শিকার মহানবী (সা) তাদেরকে কর্মের ও শ্রমের মাধ্যমে নিজ অবস্থার উন্নয়নের তাগিদ দিয়েছেন। কর্মের ও শ্রমের ব্যাপারে মানুষের কঠোর শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "আমি তো মানুষকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।[৬]

২। ন্যায়ভিত্তিক আয় বণ্টন: একটি দেশে জনপ্রতি বার্ষিক আয় বিপুল পরিমাণ হলেও সে দেশে দারিদ্র্যাবস্থা বিরাজমান থাকতে পারে। এজন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেটি যে কাজ করে তার ভিত্তিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে অর্জিত আয়

---

[১] প্রতিমা পাল মজুমদার, নগর দারিদ্র্য : সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা, অরনী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২, পৃ.২৫

[২] মোঃ আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন ঃ নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি, ফোয়আন মহল, ঢাকা ২০০০, পৃ.১৪০

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল-কুর'আন, ৬২: ৯-১০

[৪] প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, আনোয়ারুল হাদিস, পূর্বোক্ত, পৃ.২০

[৫] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আত'য়িমা

[৬] لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ আল-কুর'আন, সূরা বালাদ: ৪

Dhaka University Institutional Repository

সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা জরুরী। উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ অবদান রাখার বিষয়টি স্মরণে রেখে শ্রম শক্তিকে ন্যূনতম মজুরি দেয়ার ধারণা এ থেকে পাওয়া যায়। পুঁজির প্রাপ্য নির্ধারণে ইসলামি অর্থনীতিতে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের নীতি অনুসৃত হয়। এক্ষেত্রে মূলধনের অনুপাতের ভিত্তিতে মুনাফা বণ্টিত হয়। এর ফলে ব্যাংকের মুদারাবা আমানতকারীদের কাছে সরাসরি মুনাফার অংশ মূলধনের পরিমাণ অনুসারে পৌঁছে যায়। মুনাফা বেশি হলে তারা বেশি পরিমাণে মুনাফা পায় আর কম হলে কম পায়। ফলে অর্জিত আয়ের বণ্টন সম হয়ে থাকে। উচ্চতর আয়ের প্রবৃদ্ধির সাথে আয় বণ্টনের সমতা দারিদ্র্য হ্রাস করে।[১]

৩। **জীবিকা অর্জনের সুযোগ অবারিত ও উন্মুক্ত রাখা:** জীবিকা অর্জনের সুযোগ না থাকার কারণে অনেকে দারিদ্র্যাবস্থায় নিপতিত হয়। এ জন্য ইসলামে জীবিকা উপার্জনের সুযোগের সমতা বিধানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জীবিকা অর্জনের সুযোগকে অবারিত ও উন্মুক্ত রাখাই ইসলামি অর্থনীতির শিক্ষা। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি অপরিহার্য নীতি হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিসত্তাসহ সমগ্র জনসংখ্যার জন্য একই ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা এবং তা অনুসরণ করা। যদি দেশের কোনো গোষ্ঠী সামঞ্জস্যহীনভাবে অনগ্রসর থাকে তাহলে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ধরনের সুযোগ সুবিধা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। ফলে দেশে দরিদ্রতা হ্রাস পাবে।[২]

৪। **মালিকানা নিয়ন্ত্রণ:** ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষ এসব সম্পদের আমানতদার, যিম্মাদার মাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তিনিই (মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ) যিনি তোমাদের (কল্যাণের) পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।[৩] সম্পদে তাই মানুষের মালিকানা সার্বভৌম নয় বরং নিয়ন্ত্রিত।

৫। **সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা:** ইসলাম সম্পদ অর্জন, ভোগ, ব্যয় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আরোপ করে তা মেনে চলার শিক্ষা দিয়েছে। বৈধ পন্থায় ইসলামি নীতির আওতায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে হবে এবং সমস্ত হারাম ও অবৈধ পন্থা এ ক্ষেত্রে পরিহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শোষণমূলক পন্থায় বঞ্চনা চালিয়ে বা অন্যকে ঠকিয়ে দারিদ্র্যে নিপতিত করে কেউ ধনী হতে পারবে না।[৪]

৬। **সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ নিষিদ্ধ:** ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, যা হালাল তা অর্জনের জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে তেমনি যা হারাম তা বর্জনের জন্যও সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে। এতে সম্পদ কোথাও কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না। বরং সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আবর্তিত হতে পারবে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে বিনাযুদ্ধে যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন তা আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, রাসূলের স্বজনগণের জন্য, ইয়াতীমের জন্য, মিসকিনের জন্য এবং অসহায় পথচারীদের জন্য; যাতে তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী অর্থ-সম্পদ কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।[৫]

দান না করে অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ জন্য মহান আল্লাহ অন্যায়ভাবে যারা অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে তাদের জন্য আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন। বলেছেন, "যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে আপনি ভয়ানক শাস্তির সংবাদ দিন।[৬]

---

[১] Dr. H. M. Sadek, Poverty Eradication : An Islamic Perspective, Thoughts on Islamic Economics, Vol.6, p.16

[২] Dr. H. M. Sadek, ibid, p.17

[৩] هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আল-কুর'আন, ২: ২৯

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] مَّا أَفَاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقَابِ আল-কুর'আন, সূরা হাশর: ৭

[৬] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ আল-কুর'আন, ৯: ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৭। হারাম উপার্জন নিষিদ্ধ: যে সকল কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং জনগণের একাংশ দারিদ্র্যে নিপতিত হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য ইসলাম যথাযথ বিধান ও নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম সহজভাবে নির্দেশনা দিয়েছে, হারাম পদ্ধতিতে উপার্জন লাভজনক হলেও কোনো মুমিন সে পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে না। কুর'আন মজীদ ও হাদীসে এ নিষিদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, "মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর শয়তানের অপবিত্র ও ঘৃণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা তা বর্জন করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।[১]

"মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। তোমরা যদি পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসায় করো, তা করা তোমাদের জন্য হালাল হবে।[২]

৮। সম্পদ হস্তান্তরের পদ্ধতি প্রবর্তন: দারিদ্র্য দূর করার জন্য ইসলাম কিছু সুনির্দিষ্ট মানুষের কাছে সম্পদ কুক্ষিগত থাকার সকল পথ বন্ধ করে দেয়। সম্পদ যেন সকলের মধ্যে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মাত্রায় অবশ্যই আবর্তিত হয় সে লক্ষ্যে ইসলাম সম্পদ হস্তান্তরের কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন,

ক) যাকাত: সমাজে ধন-সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ মুসলিম ধনীদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। মহানবী (সা) যাকাতের মাধ্যমে জনগণকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করণে ভূমিকা পালন করেছেন। যাকাত নিছক কোনো দান নয় যা প্রার্থী ও দরিদ্রকে দয়া করে দেয়া হয় বরং যাকাত হচ্ছে ধনীর সম্পদে আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্রদের হক বা অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং তাদের অর্থ-সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।[৩]

যাকাত আদায়ের বিষয়টি যাকাতদাতার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। এটি দেয়া আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিত্তবান বা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকগণ যাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে আসে, সেজন্য ইসলাম শুরু থেকেই উৎসাহিত করেছে। জনগণের মানসিকতাকে মহানবী (সা) সেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। মহানবী (সা) যাকাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন।

দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেই দারিদ্র্য দূর হয় না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে যখন এর সুফল ন্যায্যভাবে দরিদ্রদের হাতে পৌঁছে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা, কর্মসূচী ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। যাকাত এমনি ধরনের এক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। আল্লাহ পাক যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে কুর'আনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বলেছেন, "নিশ্চয় যাকাত নিঃস্বদের জন্য, অভাবগ্রস্তদের জন্য, যাকাতের কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য এবং নিঃস্ব পথচারীর জন্য এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।[৪]

উশর: দরিদ্র জনসাধারণের সাহায্যার্থে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ নির্ধারণ করা। ইসলামের পরিভাষায়, জমির ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা যে ধন-সম্পদ উপার্জন করো এবং যে ফল-ফসল

---

[১] আল-কুর'আন, ৫: ৯০ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[২] আল-কুর'আন, ৪: ২৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ـ

[৩] আল-কুর'আন, সূরা যারিয়াত: ১৯ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

[৪] আল-কুর'আন, ৯: ৬০ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dhaka University Institutional Repository

আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করি তার পবিত্র অংশ তোমরা দান করো। এগুলোর অপবিত্র অংশ দান করো না। কেননা চক্ষু বন্ধ করে গ্রহণ না করলে তোমরাও নিকৃষ্ট ফল-ফসলের দান গ্রহণ করবে না। জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল রকমের অভাবমুক্ত এবং সর্বপ্রশংসিত।[১]

জমির সবধরনের উৎপন্নের উপরই উশর ফরয। উশর আদায়ের কারণ হচ্ছে জমির ফসল লাভ। উশর আদায় করতে হবে প্রতিটি ফসল হতেই। অন্য কথায় যেসব জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হবে সে ফসলের প্রত্যেকটি হতেই নিসাব পরিমাণ ফসল হলে উশর আদায় করতে হবে। আদায়কৃত উশর দারিদ্র্য বিমোচনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সা)-এর সময় যাকাত প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ উশর আদায় করতেন। তবে কোনো কোনো সময় উশর আদায়ের জন্য পৃথক কর্মকর্তাও নিয়োগ করা হতো। এধরনের কর্মকর্তাকে 'সাহিবুল উশর' বলা হতো।[২]

কাফফারা: কোনো অবাঞ্ছিত কাজ বা পাপ কর্ম হয়ে গেলে সে পাপ স্খলনের জন্য যে কাজ করতে হয় তাকে কাফফারা বলে। পাপ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্ক না গড়েও কেউ পাপ করলে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্রদের দান করার জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে,[৩] যিহার করলে,[৪] শরঈ ওযর ছাড়া রমযানের রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায় করতে হয়। কাফফারা আর্থিকভাবে আদায় করা হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কাফফারার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট সম্পদ হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।

সাদাকাতুল ফিতর: পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদুল ফিতরের দিন বিত্তশালীদের উপর গরীব-দুঃখী দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন, "সাদাকাতুল ফিতর আদায় না করা পর্যন্ত রোযাদার ব্যক্তির রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে, আল্লাহর নিকট পৌছায় না।[৫] যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত কারণ যাকাতের তুলনায় ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত অনেকাংশে সহজ ও শিথিল। প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবার-পরিজন ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে দরিদ্র ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সাধারণ সাদাকাহ: যদি কোনো ধন-সম্পদ বিনা প্রতিদানে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাউকে প্রদান করা হয় তাকে সাদাকাতে নাফেলাহ বলে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের জন্য সাদাকাতকে মহানবী (সা) 'আমলে খায়ের' বা সৎকাজ বলে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে এ ধরনের সাদকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। একে ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬]

হিবা: যদি কোনো সম্পত্তি কোনো প্রতিদান গ্রহণ ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয় তাহলে তাকে হিবা বলে। হিবাদ দানের অন্যতম একটি প্রকার। হিবা জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি ভালো উপায়। মহানবী (সা) হিবার মাধ্যমে দান করা বৈধ বলে তা করতে উৎসাহিত করেছেন।[৭]

---

[১] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ আল-কুর'আন, ২: ২৬৭

[২] ড. ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)এর সরকার কাঠামো, পৃ.২৭৯, উদ্ধৃতি: মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত (প্রবন্ধ), দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ইফাবা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ.৩৩৮

[৩] প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফফারা আদায়ের বিধান বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- আল-কুর'আন, ৫: ৮৯

[৪] যিহারের কাফফারা আদায়ের বিধান বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন - আল-কুর'আন, সূরা মুজাদালাহ: ২-৪

[৫] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুস সাওম

[৬] দ্রষ্টব্য: আল-কুর'আন, ২: ১৬৭, ১৯৫, ২৫৪; সূরা যারিয়াত: ১৯; সূরা রূম: ৩৮

[৭] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হিবা

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফ: ওয়াক্ফ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রতিরোধ করা বা বিরত রাখা, অবরুদ্ধ রাখা বা আটক রাখা। ইসলামি শরীআ মতে, ওয়াক্ফ হলো এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সম্পদ ব্যবহার এবং হস্তান্তর থেকে বিরত থাকে যার দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি লাভবান হতে পারে অথবা যতোদিন টিকে থাকে ততদিন এ সম্পদ অন্যের উপকারার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কোনো সম্পত্তি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে ওয়াকফ বলে। সাধারণত ওয়াকফ দ্বারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কোনো লোক কর্তৃক তার যে কোনো সম্পত্তি ইসলামি আইন দ্বারা স্বীকৃত ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক অথবা দানের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করাকে বুঝায়। সাধারণত ওয়াকফ দ্বারা স্থায়ীভাবে দানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে বুঝায়।

হানাফী মতে, ওয়াকফ হলো যে কোনো সম্পদের মালিকানা ত্যাগ করে তা স্থায়ীভাবে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা এবং অন্যের কল্যাণে এ সম্পদ ব্যয় করা। অন্যভাবে বলা যায়, ওয়াক্ফ হচ্ছে অন্যের উপকারের জন্য স্থায়ীভাবে উৎসর্গীকৃত যে কোনো সম্পত্তি যার দ্বারা অর্জিত আয় তার নির্দেশিত ইসলামি শরীআধীন কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যয় করা হয়।[১]

মহানবী (সা) বলেছেন, "ভালো কাজে ওয়াকফ সম্পত্তির আয় নিয়োজিত করতে হবে এবং এ ওয়াক্ফ মোট সম্পত্তির তিনভাগের বেশি হবে না।[২] ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা যায়। ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণের ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে। সরকার এ সব সম্পত্তির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দারিদ্র্য দূরীকরণে এটি তাৎপর্যবহ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ওয়াসিয়াহ: মৃত্যুর সময় সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সাধারণভাবে স্বীয় সম্পদের একাংশ দান করে যাবার নাম ওয়াসিয়াহ।[৩] মহানবী (সা) সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে ওয়াসিয়াত করতে বলেছেন, এরচেয়ে বেশি দিয়ে নয়। অন্যকথায়, ওয়াসিয়াত সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ করা যাবে। এক তৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়াত করলে, অতিরিক্ত অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। ওয়াসিয়াত এমন একটি আমল যা দ্বারা বিত্তবানরা জীবনের শেষ মুহূর্তে সৎকাজ হিসেবে দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তকে আর্থিক উপকার করতে পারে।

মিনাহ: দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি পদ্ধতি হলো মিনা। এ পদ্ধতিতে উৎপাদনমুখী কোনো সম্পদ অভাবী দরিদ্র কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়। মহানবী (সা) স্বয়ং এই পদ্ধতির সূচনা করেন। মদীনার সামর্থবান সাহাবীগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকৃত মুহাজিরদেরকে এ পদ্ধতিতে সহায়তায় হাত প্রসারিত করেছিলেন। মহানবী (সা)এর হাদীস হতে নগদ অর্থ, ভারবাহী পশু, দুধেল পশু, কৃষি জমি, ফলের বাগান এবং বাড়ি – এই ছয় ধরনের মিনার কথা জানা যায়।[৪]

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে ইসলামি সমাজে সম্পদ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। যার ফলে দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদের মালিক হয়ে দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করে নিজেই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও প্রভাব

বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্য পীড়িত দেশ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৬-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ৪৭.৫ শতাংশ লোক আয়ের দিক থেকে দরিদ্র, এবং ৭৬.৯ শতাংশ লোক সামর্থগত দিক থেকে দরিদ্র।[৫] যদিও সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন তথ্যে দেখা যায় যে, দেশে দারিদ্র্য ক্রমহ্রাসমান, তথাপি এখনও দারিদ্র্যের উপস্থিতি সুবিস্তৃত ও

---

[১] আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ওয়াসিয়াহ

[৪] Dr. Ziauddin Ahmed, Islam, Poverty and Income Distribution, IFB, Dhaka 1991. p.44

[৫] সামর্থগত দিক থেকে দরিদ্র বলতে জনসংখ্যার সে অংশকে বুঝায় যারা ন্যূনতম মানবিক সামর্থ যেমন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন ও শিক্ষাগত দিক থেকে সামর্থ বঞ্চিত।

Dhaka University Institutional Repository

গভীর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা ব্যয় নির্ধারণ জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালোরি গ্রহণ পরিমাপে পল্লী জনগোষ্ঠীর ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালোরি গ্রহণ পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ চরম দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।[১] বর্তমান বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শহরে এই হার ২৮.৪% ভাগ এবং পল্লীতে ৪৩.৮ শতাংশ। বর্তমানে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে দেশের ২৫.১ শতাংশ লোক যাদের ১৪.৬ শতাংশ শহরে বাস করে আর পল্লী অঞ্চলে বাস করে ২৮.৬ শতাংশ লোক। বিভাগওয়ারি বিবেচনায় বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র সীমার নিচে লোক বাস করে বরিশালে। এর পরিমাণ ৫২ শতাংশ। মাথা গণনা পদ্ধতিতে বিভাগওয়ারি সবচেয়ে কম দরিদ্র সীমার নিচে লোক বাস করে ঢাকা বিভাগে। এ পরিমাণ শতকরা ৩২ ভাগ। বাকি অন্যান্য বিভাগগুলোর মধ্যে খুলনায় ৪৫.৭ শতাংশ, রাজশাহীতে ৫১.২ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৩৪ শতাংশ এবং সিলেটে ৩৩.৮ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর লোক হলো ভূমিহীন ব্যক্তিবর্গ।[২]

বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্য হলো এর দারিদ্র্য নির্মূলের স্থূল নিম্নগতি। ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশে দরিদ্র সীমার নিচে বাস করতো মোট জনসংখ্যার ৬২.৬ শতাংশ লোক যাদের ৬১.৯ শতাংশ পল্লীতে এবং ৬৭.৭ শতাংশ শহরে বাস করতো। এ সময় চরম দরিদ্র সীমার নিচে বাস করতো ৩৬.৮ শতাংশ লোক যাদের মধ্যে ৩৬.৭ শতাংশের বাস ছিলো পল্লীতে আর ৩৭.৪ শতাংশ বাস করতো শহরে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে জাতীয় দারিদ্রসীমার পরিমাণ হয় ৪৭.৫ শতাংশ লোক, যাদের মধ্যে পল্লী এলাকায় বাস করতো ৪৭.১ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ৪৯.৭ শতাংশ। এ সময় চরম দরিদ্র সীমার নিচে বাস করতো দেশের মোট জনসংখ্যার ২৫.১ শতাংশ লোক। যাদের মধ্যে শহর এলাকায় বাস করতো ২৭.৩ শতাংশ এবং পল্লী এলাকায় ২৪.৬ শতাংশ লোক।[৩] ২০০৯-১০ অর্থবছরেও দরিদ্রসীমার এই হারে (বিশেষত ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের পর তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ সময়ে ৪৭.১ শতাংশ থেকে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা মাত্র ৭.১ শতাংশ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ২০০৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা ৪০ শতাংশ, যার মধ্যে শহরে রয়েছে ২৮.৪ শতাংশ ও পল্লীতে ৪৩.৮ শতাংশ। অন্যদিকে জাতীয়ভাবে দারিদ্র্যের নিম্নসীমা হলো ২৫ শতাংশ, যার মধ্যে শহরে রয়েছে ১৪.৬ শতাংশ এবং পল্লীতে ২৮.৬ শতাংশ।[৪]

বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রবণতা ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় প্রায় ২২.৬ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও এর সিংহভাগই হয়েছে ১৯৯৫-৯৬ এর আগে। এ সময়ের মধ্যে ১৫.৫ শতাংশ লোককে দারিদ্র্য সীমা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হলেও পরবর্তী দশবছরে তা হয়েছে মাত্র ৭.১ শতাংশ। সে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশের দারিদ্র্য প্রবণতা কিছুটা হ্রাস পেলেও বরাবরই এটি একটি দারিদ্র্য পীড়িত দেশ।[৫]

ইউ.এন.ডি.পি প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্টে ১৭২টি দেশের মধ্যে ২০০১ সালে বাংলাদেশ ১৩৭তম, ২০০২ সালে ১৪৫তম, ২০০৩ সালে ১৩৯তম, ২০০৪ সালে ১৩৮তম, ২০০৫ সালে ১৩৯তম এবং ২০০৬ সালে ১৩৭তম হয়েছিলো।[৬] সর্বোচ্চ মাথাপিছু জিডিপির দেশ লুক্সেমবার্গে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি ৬৩,৬০৯ মার্কিন ডলার সেখানে বাংলাদেশের জিডিপি মাত্র ৫২০ মার্কিন ডলার।[৭] বস্তুত বিশ্বের কোনো দেশ এত বড় জনসমষ্টি, এত অপ্রতুল সম্পদ নিয়ে এত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে এমন তীব্র

---

[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানার ব্যয় নির্ধারণ জরিপ, ১৯৯৫-৯৬

[২] মোঃ রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯-৮০

[৩] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল. পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৪

[৪] মোঃ রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯

[৫] ড. এমাজ উদ্দিন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৩

[৬] মোঃ রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১৬

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৭ ও ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়নি।[১] ইউনিসেফের গবেষণা তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের ৩০ শতাংশ শিশু চরম দারিদ্র্যের শিকার। এদের ৪৫ শতাংশ আবার নিরঙ্কুশ দরিদ্র। গবেষণায় বলা হয়, দেশে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত মোট শিশুর সংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লাখ। অনূর্ধ্ব ৪ বছর বয়সী ৫৮ শতাংশের বেশি শিশু দৈনিক ১ মার্কিন ডলারের কম আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। এ ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুদের অবস্থা নিতান্তই অনিশ্চিত। এ থেকে বোঝা যায়, বয়স বাড়ার পাশাপাশি শিশু বঞ্চনার তীব্রতাও বাড়ে। গবেষণায় আবাসন, পয়োনিষ্কাশন, পানি, তথ্য, খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য – এ ৭টি নির্দেশকের আলোকে শিশু বঞ্চনা পরিমাপ করা হয়েছে। নির্দেশনায় দেখানো হয়েছে, প্রায় ৬৪ শতাংশ শিশু পয়োনিষ্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ৪১ শতাংশ শিশু আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ৮ শতাংশ শিশু শিক্ষা ও পয়োনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে চরম বঞ্চনার মধ্যে দিন কাটায়। ১৬ শতাংশ শিশু স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নির্দেশনাগুলোর মধ্যে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশু অর্থাৎ প্রায় ৫২ শতাংশ তথ্যের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। টেলিভিশন, বেতার, কম্পিউটারসহ কোনো যোগাযোগ মাধ্যমেই তাদের কোনো প্রবেশের সুযোগ নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ৫ বছরের কম বয়সী অর্ধেক শিশু খর্বকায় ও ৪০ শতাংশ শিশু কম ওজনের। প্রায় ১৫ শতাংশ শিশু শীর্ণতায় ভুগছে। শহরের চেয়ে গ্রামের শিশুরা অনেক বেশি খর্বকায় ও কম ওজনের। পুষ্টির দিক দিয়েও পিছিয়ে আছে গ্রামের শিশুরা। গবেষণায় বলা হয়, শিক্ষিত মায়ের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত কম দারিদ্র্যের শিকার হয়। গবেষণায় সুপারিশে পরিস্থিতি পরিবর্তনে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিশুর সুরক্ষা, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়।[২]

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পুষ্টিবিজ্ঞানী ও গবেষকগণ বলেছেন, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ শিশু মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অপুষ্টি দূর করা জরুরি। পৃথিবীর যে ৩৬টি দেশে অপুষ্টি বেশি এর মধ্যে বাংলাদেশও আছে। .....বিশ্বের ১৭ কোটি ৮০ লাখ শিশু খর্বাকৃতির, এর অর্থ প্রতি ২টি শিশুর একটি খর্বাকৃতির। ২৯ কোটি ১০ লাখ শিশু রক্তশূন্যতায় ভুগছে।[৩]

বাংলাদেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। মাত্র ১২ বছরের ব্যবধানে দেশে ভূমিহীন পরিবারের বৃদ্ধির হার ৫.৪৪ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে যেখানে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিলো দেশের মোট খানার ১০.১৮ শতাংশ, সেখানে ২০০৮ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৬২ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে গ্রামীণ এলাকার চেয়ে শহর এলাকায় ভূমিহীনের সংখ্যা বেশি বেড়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে ভূমিহীনের সংখ্যা না বাড়ার দিক থেকে (প্রায় অপরিবর্তিত) শীর্ষে রয়েছে বরিশাল বিভাগ।[৪]

বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে ইসলামি বিধানের ভূমিকা

ইসলাম দারিদ্র্য দূর করার জন্য সম্পদ হস্তান্তরের যে সকল নির্দেশনা দান করেছে বাংলাদেশে সেগুলোর মধ্যে যদি কেবল যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা যায় এবং যাকাতলব্ধ অর্থ ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে ব্যয় করা সম্ভব হয় তাহলে বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামো বহাল থাকা সত্ত্বেও এ দেশ দারিদ্র্য মুক্ত হতে পারে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যাকাত নিঃস্বদের জন্য, অভাবগ্রস্তদের জন্য, যাকাতের কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য এবং নিঃস্ব পথচারীর জন্য এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।[৫]

ইসলামে তাই এ আট শ্রেণীর লোককেই যাকাতের দাবিদার হিসেবে গণ্য করা হয়। এর বাইরে যাকাত দেয়া যায় না।

---

[১] ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৯

[২] হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)-এর গবেষণা প্রতিবেদন রিপোর্ট, প্রথম আলো, ২৬ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.৩

[৩] প্রথম আলো, ০৬ অক্টোবর ২০০৬, পৃ.৩

[৪] নয়া দিগন্ত, ২৪ জুন ২০০৯, পৃ.৬

[৫] إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল-কুর'আন, সূরা তওবা : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে এ যাবৎ বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নানা ধরণের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দারিদ্র্য দূর হয়নি এবং চরম দারিদ্র্যের দিকেই গতি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ইনডিপেনডেন্ট রিউভ অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ১৯৯৪-৯৫ শীর্ষক সেমিনারে বলা হয়েছে - "১৯৮৫ সালে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিলো ৪৩.৯% । এক দশকের মাথায় সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯.২% । অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশী লোক বাস করছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। সেই সঙ্গে চরম দারিদ্র্যের পরিমাণ ২১.৫% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০%-এ উন্নীত হয়েছে। তাই সরকারকে আজ প্রকৃতই কল্যাণমুখী এবং দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।[১]

যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়িত ও ব্যবহৃত হয়, যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির এবং ক্ষেত্রবিশেষে নওমুসলিম। কিন্তু বাংলাদেশে আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক যাকাত আদায় করা হয় না এবং তা বিলি-বন্টনের ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খুলাফা-ই-রাশিদা ও তাঁদের পরবর্তী যুগের বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্য ৮টি দফতর ছিলো। মহানবী (সা) ও খুলাফা ই রাশিদার সময়ে যাকাতের অর্থসামগ্রী ও গবাদি পশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য আট শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিলো। এরা হলো সায়ী বা গবাদী পশুর যাকাত সংগ্রাহক, কাতিব বা করণিক, কাসাম বা বন্টনকারী, আশির বা যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী, আরিফ বা যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী, হাসিব বা হিসাবরক্ষক, হাফিয বা যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক এবং কায়াল বা যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওজনকারী।[২]

রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিলো যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বন্টনের জন্য।

যাকাতের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। কেননা, যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের একটি স্থায়ী পদ্ধতি, কোনো সাময়িক পদ্ধতি নয়। যাকাতের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করে ফেলার জন্য ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ দ্ব্যর্থহীন মত প্রকাশ করেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি যাতে দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থের মুখাপেক্ষী না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রয়োগের জন্যও ফকীহগণ তাগিদ দিয়েছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন যে, "ফকীর ও মিসকিনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তারা তাদের অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়।[৩] ইমাম শাফিঈ (র) এ মত সমর্থন করেন।[৪] তাঁর সমর্থক ফকীহগণ শিল্প ব্যববসায়ে নিয়োজিত প্রার্থিতগণকে তাদের স্ব-স্ব কাজে (তুটির শিল্প, কৃষিকাজ, দোকান, দরজির কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি) স্বনির্ভর হওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ যাকাতের অর্থ প্রদানের কথা বলেছেন। ইমাম মালিক, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্য ফকীহ (র) গণের মত হলো যে, প্রার্থী ফকীর-মিসকিনকে তার নিজেরসহ পরিবার পরিজনের এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় যাকাত দিতে হবে।

হযরত ওমর বলেন, "যখন তোমরা ফকীর-মিসকীনকে কিছু দিবে তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে। মোটের ওপর, যাকাত অভাবী মানুষকে স্বনির্ভর এবং দ্বিতীয়বার যাকাত প্রার্থী না হওয়ার অবস্থায় আনয়ন করতে চায়। সর্বনিম্ন এক বছর সচ্ছলভাবে চলার পর ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ব্যক্তিই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে ধনীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হলো

---

[১] শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি:নির্বাচিত প্রবন্ধ, পৃ:১৭০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ:৪১

[৩] ইমাম নববী, পূর্বোক্ত, পৃ.৪২৩

[৪] ড. মাহমুদ আহমাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, পৃ: ৩

Dhaka University Institutional Repository

নিজের পকেট থেকে অর্থ বের করে দিলেই শুধু দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হয় না। অভাবগ্রস্তদের খুঁজে বের করে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে সাদাকাহ ও যাকাতের অর্থ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও ধনীদের পালন করতে হয়।

যাকাতের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে না দেয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যকে শুধু অপছন্দই করে না, বরং তা নির্মূল করার কথাও বলে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দুর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর ফলে শুধু অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণই হবে না, বরং সমাজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যও হ্রাস পাবে।

যাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কারণ সমাজে গরীব, অসহায়, দুঃস্থ ও বেকার লোকদের হাতে অর্থ বা ক্রয় ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু যাকাত বন্টন করে তাদের হাতে পৌঁছালে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং তারা পূর্বের চেয়ে বেশি পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদাও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্যে বিনিয়োগ বাড়ানো হবে এবং উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাবে। ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনকারীদের লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। যাকাত এভাবেই ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে চাহিদা, উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করে থাকে। এই উৎপাদনকারীরাই যাকাত দেয়, যা আবার বর্ধিত মুনাফা হয়ে তাদের হাতেই ফিরে আসে। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন, "মানুষের নিকট থেকে সুদ আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর নিকট সেই সুদ সম্পদ বাড়ায় না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক তাতেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যারা যাকাত আদায় করে তারাই সমৃদ্ধিশালী।[১]

উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও যাকাত পুঁজি তথা নগদ অর্থকে অলসভাবে ধরে রাখার পথে বাঁধা হিসেবে কাজ করে। সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখলে বছর বছর যাকাত দিতে দিতেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে যাবতীয় সম্পদ এমনভাবে বিনিয়োগ করা হয় যাতে কমপক্ষে যাকাতের হারের সমাহারে আয় বাড়ানো সম্ভব হয়; অন্যথায় আসল থেকে যাকাত দিতে হবে। ফলে অর্থনীতিতে পূর্ণ বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়। বেকার লোকদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আসে, চাহিদা বাড়ে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এভাবেই যাকাত একদিকে ভোগ অন্যদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে থাকে।

সমাজ হতে দারিদ্র্য নির্মূল করা যাকাতের আরেক লক্ষ্য। দারিদ্র্য মানবতার প্রধান শত্রু। যে কোনো দেশ ও সমাজের জন্য এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনা অনুভূতির সৃষ্টি হয় দারিদ্র্যের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্র্যের জন্য। এ সমস্যার প্রতিবিধান করার জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে ইসলামের সেই সোনালী যুগ থেকেই।

বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাত আদায় ও ব্যয় করার ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া অনেক বিত্তশালী মুসলমানই যাকাত দেন না। দিলেও তা বন্টন করা হয় বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিতভাবে। ফলে তা দ্বারা সমাজের তেমন উল্লেখযোগ্য উপকার সাধিত হয় না। দারিদ্র্য সমস্যার স্থায়ী কোনো সুরাহাও হয় না।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা দরিদ্র জনগণের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই সরকারি সাহায্য, না হয় বিদেশী অনুদান। বস্তুতঃপক্ষে এ দেশে এখন বহু এনজিও বিদেশি অনুদান নিয়েই দরিদ্র জনগণ বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধরণের মধ্যে কাজ করে চলেছে। তারা প্রধানতঃ সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক বুদ্ধিজীবী ও সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি হতাশা প্রকাশ করে থাকেন যে, তাদের হাতে নগদ অর্থ নেই বলেই দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যাচ্ছে না। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ দেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত বিধানের মাধ্যমে আহরণ করা যায় এবং তা যদি সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করা যায় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অভাবী লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা অবশ্যই সম্ভব হবে।

---

[১] وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ সূরা রূম : ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক সাদাকাহ ও ঐচ্ছিক দানের ব্যবহার

সমাজে দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কেবল যাকাতই একমাত্র ব্যবস্থা নয়, এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার সাদাকাহও এ তহবিলকে শক্তিশালী করতে পারে। এ সবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ঈদুল ফিতরের সময়ে ফিতরা প্রদান এবং ঈদুল আযহার কুরবানীর পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান। উপরন্তু, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের তার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, অসহায় পথিক কিংবা হঠাৎ বিপদগ্রস্ত লোকের যথাসম্ভব সাহায্য করাও কর্তব্য।

ইসলামী শরীআহ অনুসারে ঈদুল ফিতরের দিন যে মুসলমানের ঘরে যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকবে তাকে তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করে দিতে হয়। ফিতরার এ অর্থ পুরোপুরি দরিদ্রদের হক। ফিতরার পরিমাণ সাধারণত ১.৭০ কেজি গম বা তার বাজার মূল্য ধরা হয়। তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুপাতে ঐ পরিমাণ গম বা তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার বিধান রয়েছে। এভাবে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যে বিপুল পরিমাণ ফিতরা দেয়া হয় তা দরিদ্র জনগণও পেলেও পরিকল্পিতভাবে এ অর্থ ব্যবহারের অভাবে এতে দরিদ্রের যে কল্যাণ ও মঙ্গল অর্জিত হতে পারে তা আদৌ হয় না।

অনুরূপভাবে ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবানীকৃত পশুর চামড়া বা তার মূল্য গরীব দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সাধারণত কুরবানীদাতা নিজ উদ্যোগেই এ অর্থ নিজস্ব পছন্দ মত দরিদ্রদের মাঝে বিলি-বন্টন করে দেন। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু সমাজসেবী সংগঠন ও মাদরাসাসমূহের লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনা কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই সম্ভাব্য কুরবানীদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কুরবানীর পুরো চামড়া অথবা বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশবিশেষ সংগ্রহ করেছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো এককালীন বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হচ্ছে এবং তাদের প্রয়োজনের কিছুটা হলেও পূরণ হচ্ছে। তবে বেশীর ভাগ চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া অভাবী জনগণের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়। এতে সাময়িকভাবে তাদের চাহিদার কিছুটা পূরণ হলেও তাদের অভাব, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব রয়ে যায় স্থায়ীভাবেই। অথচ এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করে সেই অনুসারে এ অর্থ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যবহার করলে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য দূর হয়ে যেতে পারতো।

বাংলাদেশে কুরবানীর চামড়া বিক্রি থেকে কত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা অতি অল্প। এক্ষেত্রে যথরওয়ারী হিসেব দেয়া সম্ভব না হলেও একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, এ দেশে গড়ে প্রতি বছর উৎপাদিত গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ পিস। এর মধ্যে বিদেশ হতে আসা গরুর চামড়াও রয়েছে। যারা চামড়া ব্যবসার সাথে জড়িত, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও আধা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ট্যানারী ও ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করে থাকে, তাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, "তাদের বার্ষিক সংগৃহীত চামড়ার মধ্যে কমপক্ষে ২০% চামড়া সংগৃহীত হয় শুধুমাত্র ঈদুল আযহার দিনে। তাদের মতে, এ দিনে সংগৃহীত গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়ার অনুপাত দাঁড়ায় সাধারণত ৩ ঃ ২। এ হিসেব অনুসারে এ দিনে প্রাপ্ত ৩০ লক্ষ পিস চামড়ার মধ্যে গরুর চামড়ার অনুপাত দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ পিস এবং ছাগল-ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ লক্ষ পিস।

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ দেশে পরিবারের সংখ্যা দুই কোটিরও বেশী। এর মধ্যে যদি অনন্তঃপক্ষে ১৫% পরিবার ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করে তাহলে ৩০ লক্ষ পশু কুরবানী হওয়ার কথা। গরুর কাঁচা চামড়ার দাম আকার নির্বিশেষে প্রতিটি গড়ে ৬০০ টাকা এবং ছাগলের চামড়ার দাম প্রতিটি গড়ে ৭৫ টাকা ধরলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০ কোটি টাকা। বাস্তবে এর পরিমাণ যে আরও বেশি হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই দরিদ্রের হক এ বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারেই তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আল্লাহ নির্দেশিত ও দরিদ্র জনগণের জন্য অনায়াসে প্রাপ্ত এই বিপুল অর্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ব্যয়িত হওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।[১]

---

[১] দ্রষ্টব্যঃ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতিঃনির্বাচিত প্রবন্ধ, পৃঃ১৭০-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত আদায় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা

ভাগ্যবিড়ম্বিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং অর্থনৈতিক কার্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দেশের শাসক তথা সরকারেরই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা, দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং প্রবৃদ্ধির কাম্য হার অর্জনের লক্ষ্য কেবলমাত্র সরকারের কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত সরকারি নীতিমালা ও কর্মসূচী - যা দ্বারা এমন সুযোগ সৃষ্টি করা যায় যাতে জনগণ নিজেদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সম্পদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে পারে।

সমাজের প্রতি নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রতিটি সরকার তথা রাষ্ট্রের নৈতিক ও আবশ্যিক দায়িত্ব। দারিদ্র্য বিমোচন ও জনসাধারণের জীবন-যাপনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিপুল। প্রত্যেক নাগরিকই যেন বৈধ উপায়ে উপার্জন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি সব ধরণের অবৈধ কর্মকাণ্ড সমাজ থেকে উচ্ছেদও সরকারের অন্যতম পবিত্র ও আবশ্যিক দায়িত্ব। কারণ, অবৈধ রাস্তাপথেই সমাজের অকল্যাণ ও সর্বনাশ প্রবেশ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, "আল্লাহ্ যাকে মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শাসক বানিয়েছেন এবং সেই শাসক তাদের দারিদ্র্য মোচন ও প্রয়োজন পূরণের প্রতি উদাসীন রইলেন তাহলে আল্লাহও তার দারিদ্র্য ও প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন রইবেন।[১]

তিনি আরও বলেছেন, "যার কোনো সহায় নেই, শাসকই তার সহায়।[২] রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসুল (সা) কে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, "তাদের মাল থেকে যাকাত আদায় করো।[৩]

প্রখ্যাত ফকীহ্ ও ইসলামী শাস্ত্রবেত্তাগণ এক বাক্যে বলেছেন যে, জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষতঃ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ শাসকের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তারা এমনভাবে পালন করবেন যেন তাদেরকে এ ব্যাপারে আর কারও কাছে প্রার্থী হতে না হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে, "জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চিয়তা বিধানের জন্য রাষ্ট্র উৎপাদন, বণ্টন, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং পূর্ব কর্মসূচির আঞ্জাম দেবে।[৪] এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইসহাক আল-শাতিবী বলেন, "আল্লাহর আইন পাঁচটি বিষয়ের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দেয়। ধর্ম, জীবন, সন্তান, সম্পদ ও যুক্তি। এই নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই।[৫]

ইমাম গাযালীর মতে, "ইসলামী শরীআহ প্রতিটি মুসলমানের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয় এবং তা সংরক্ষণে নিশ্চয়তা দেয়। এর একটি হচ্ছে প্রত্যেকের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা - যার মধ্যে রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং এমন অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় যা সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত।[৬]

অতএব, কুর'আন, সুন্নাহ ও মনীষীদের মতামত থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের এবং সমাজে আয় বৈষম্য হ্রাসের জন্যে গৃহীত কর্মসূচীতে সরকারের অংশগ্রহণ শুধু প্রয়োজনই নয়, বরং অপরিহার্য। সরকারের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কোনো কর্মসূচীই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয় না। কারণ, একমাত্র সরকারই একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, বিধি ও নীতিমালা তৈরী এবং জনগণের অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা রাখেন। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তার ক্ষমতা ও আয়তন যতো বড়ই হোক না কেনো, কোনোক্রমেই এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর পদক্ষেপ ও ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ নয়। তাদের গৃহীত কর্মসূচী কখনই সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হয় না।।

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত

[২] প্রাগুক্ত

[৩] আল-কুর'আন, সূরা তওবা : ১৩৩

[৪] উদ্ধৃতি: Dr. Shadab Kabir, Politics & State : Islamic View, London, 2005, p.34

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] আল-গাযালি, ইহইয়াউল উলূম আল-দীন, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে এ যাবৎ বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নানা ধরণের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য দূর হয়নি বরং দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে।

৮৭% মুসলিম অধ্যুষিত দরিদ্র এই বাংলাদেশে ইসলামী বিধি-বিধান কায়েম বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে না হলেও দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে, দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণের স্বার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অন্ততঃ ইসলামের এই একটি বিধান কায়েম করতে পারেন। কিন্তু সরকার তা না করে দেশের ধনীদের কাছ থেকে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও তা শরীআহ অনুযায়ী ব্যবহারের জন্য 'যাকাত বোর্ড বাংলাদেশ' নামে নামমাত্র একটি সংস্থা গঠন করেছেন যা ১৯৮২ সালের ৫নং অধ্যাদেশ বলে ঘোষণা করা হয়। এই অধ্যাদেশের ৩(ক) ধারায় যা উল্লেখ আছে তা হুবহু উদ্ধৃত হলো, There shall be extablished a fund to be called the zakat fund which shall consist of voluntary payment of zakat by the Muslims.[১]

অধ্যাদেশে মুসলিম জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থ নিয়ে যাকাত তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনের সর্বত্র যাকাতকে আবশ্যিক (ফরয) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খুলাফা-ই-রাশিদার আমলে যেখানে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা ছিলো, সেখানে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যাকাতের দর্শন কুর'আনের আদেশের পরিপন্থী বলেই মনে হয়। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় দু'হাজার কোটি টাকা যাকাত হিসেবে আদায় হতে পারে। অর্থনীতিবিদগণের মতে, বাংলাদেশে বছরে এক হাজার আটশত কোটি টাকা হলেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। অথচ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যাকাতের মত এমন একটি সম্ভাবনাময় খাত থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের 'যাকাত ফান্ড'-এ অতি সামান্য পরিমাণ যাকাতই জমা হয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে ঈমানের প্রকৃত চেতনায় যাকাতের এ বিপুল সম্পদ আদায় এবং ব্যবহার করা সম্ভব হলে বাংলাদেশকে সহসাই দারিদ্রতামুক্ত সচ্ছল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য সম্প্রতি আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার বলেছেন, 'দুর্নীতি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে।'[২] তবে স্পীকার সাহেব বলতে পারেননি যা তা হলো, দুর্নীতি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশে সে ব্যবস্থা ইসলাম হলেই সবদিক থেকে তা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাসুদ এ খান তাঁর এক পরিপত্রে বলেছেন, শুধু ঋণ দিয়ে নয়, শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব।[৩] কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি, বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষিত বেকার তৈরি করে দারিদ্র্যের হার আরো বৃদ্ধি করে চলেছে। এ জন্য ইসলাম সম্মত ও স্বীকৃতি এবং নির্দেশিত কর্মমুখী শিক্ষাই হতে পারে সমাধান। সুতরাং যে কোনো বিবেচনাতেই বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে ইসলামের আদর্শের আলোকে কেবল যাকাতের বিধানটিও যদি যথাযথভাবে কার্যকর করা যায়, তাহলেও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠবে।

---

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ১৯৮৩, ধারা ৩ (ক), শিরোনাম: যাকাত বোর্ড বাংলাদেশ গঠন প্রসঙ্গে

[২] প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.২৩

[৩] মাসুদ এ খান, শুধু ঋণ নয় শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইত্তেফাক, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ বেকারত্ব

যখন কোনো দেশে কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতানুসারে কাজ পায় না, তখন এই অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।[১] অথবা বেকারত্ব হলো একজন ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত অবসর যিনি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে চান কিন্তু কাজ পান না।[২] কিংবা বেকারত্ব হলো কর্মক্ষম মানুষের কর্মহীনতাজনিত এমন একটি অসহনীয় অবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও জৈবিক দিকসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে জীবনযাত্রার মানরক্ষা ও উন্নয়নকে ব্যাহত করে।[৩]

বেকারত্ব বলতে সাধারণ বিবেচনায় তাই কর্মহীনতাকে বুঝানো হলেও এ ধারণা বেকারত্বের প্রকৃত স্বরূপ বোঝানোর জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা শিশু, বৃদ্ধ কিংবা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোনো কর্মে নিযুক্ত না থাকলেও তাদেরকে বেকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তাই বেকার হলো যে সমস্ত লোক কোনো কাজ করে না, যারা কাজ করতে সক্ষম এবং যারা কাজ করতে চায়। মূলত যাদের মধ্যে এই তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তারাই বেকার হিসেবে বিবেচিত হবে।[৪]

সুতরাং একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার আওতাভুক্ত ব্যক্তির কর্মের ইচ্ছা, উপযুক্ত সামর্থ ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যদি সে উপার্জনমূলক কর্মের সংস্থান করতে ব্যর্থ হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে বেকার এবং ব্যক্তির এ অবস্থাকে বেকারত্ব বলা যাবে।

বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতি

বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি জটিল সমস্যা। এর স্বরূপ-প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময় তেমন এর প্রভাবও বহুমাত্রিক। এতে পূর্ণ বেকারত্বের চেয়ে অর্ধবেকারত্ব, শহরে বেকারত্বের চেয়ে গ্রামীণ বেকারত্ব এবং পুরুষ বেকারত্বের চেয়ে নারী বেকারত্বই বেশি। ২০০৫-০৬ সালের শ্রম-জরিপ অনুসারে বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব পরিস্থিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

টেবিল -১: ১০ বছর ও তদুর্দ্ধ বেকার জনসংখ্যা[৫]

অঞ্চল	উভয় লিঙ্গের বেকারত্ব		পুরুষ		মহিলা	
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	হার (%)	সংখ্যা (মিলিয়ন)	হার (%)	সংখ্যা (মিলিয়ন)	হার (%)
বাংলাদেশ	১৪১৭	২.৫	৯৩১	২.৭	৪৮৬	২.৩
শহর	৪৫৫	৪.৫	৩২৪	৪.৪	১৩১	৪.৬
গ্রাম	৯৬২	২.১	৬০৭	২.২	৩৫৫	১.৯

---

[১] এ. সি. পিগুর, উদ্ধৃতঃ প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী খান, সালাহ উদ্দীন ও মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থনীতি, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা ২০০১, পৃ.৮০

[২] 'Unemployment is involuntary idleness of person willing to work at prevailing rate of pay but unable to find it' – Everyman's Dictionary of Economics উদ্ধৃতঃ প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী খান ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৮০

[৩] "A realistic analysis of tends in employment in Bangladesh is handicapped, by the lack of uniform definition in regard to unemployment ..... In Bangladesh, official Censuses and Surveys define a person as unemployed if he/she is out of work (involuntary) during the reference period and is looking for work." – ESCAP, Country Monograph, Series No.8, 'Population of Bangladesh, 1985, p.178

[৪] Dale Yoder and Herbert G. Heneman, Labor Economics and Industrial Relations, Cincinnati, 1959, p.339

[৫] বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস), বিবিএস, ২০০৫-০৬

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল -২: ১০ বছর ও তদুর্দ্ধ বেকার জনসংখ্যা[১]

শ্রেণী	বাংলাদেশ			শহর			গ্রাম		
	উভয়লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	উভয়লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা	উভয়লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা
নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গ	৫৪.৫	৩৩.৭	২০.৮	৯.৭	৭.০	২.৭	৪৪.৮	২৬.৭	১৮.১
নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ	১৮.৯	৪.২	১৪.৭	১.৯	০.৭	১.২	১৭.০	৩.৫	১৩.৫
আংশিক নিয়োগ হার	৩৪.৬	১২.৪	৭০.৭	১৯.৬	১০.০	৪৪.৪	৩৭.৯	১৩.১	৭৪.৬

২০০৫-০৬ সালে বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তি (১০ বছর এবং তার উপরে) ছিলো ৬৬ মিলিয়ন (পুরুষ ৪০.৭ মিলিয়ন, মহিলা ২৫.৩ মিলিয়ন; গ্রামে ৫০.৮ মিলিয়ন, শহরে ১৫.২ মিলিয়ন)। জনসংখ্যার আকার, দক্ষতা, কর্মকৌশল, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রভৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে বেকারত্বের হার তেমন তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় না। যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো, জাতীয় ও গ্রামীণ পর্যায়ে জাতীয় শ্রমশক্তির অর্ধেকেরও বেশি অর্ধবেকার। আরো তাৎপর্যপূর্ণ যে, অর্ধবেকারত্বের মধ্যে জাতীয় ও গ্রামীণ উভয় পর্যায়ে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের হার অনেক বেশি।

শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশে শিক্ষিত জনশক্তি ছিলো ২৪.৭ মিলিয়ন, শিক্ষিত বেকারত্বের হার প্রায় ৪.৪%।[২] ২০০৫-০৬ সালে এসে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৯.৬৪ মিলিয়ন ও ৫.২%।[৩] প্রায় দু দশক আগের হিসাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির কৃষি শ্রমিক শতকরা ৭৪ ভাগ।[৪] এ শ্রমিকের মধ্যে বেকার ছিলো শতকরা ৩৬ ভাগ।[৫] এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের প্রায় ১ লাখ ৬৬ হাজার শিশু শ্রমিক ১৯৮৪ সালে নতুন কর্মপ্রার্থী হিসাবে বেকারত্বের তালিকায় নাম লেখায়।[৬] ২০০৫-০৬ সালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরোধে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পরও উক্ত বয়সের প্রায় ৫ লাখ শিশু শ্রমিক নতুন কর্মপ্রার্থী হিসেবে বেকারত্বের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়।[৭] বেকারত্বের এমন অবস্থা মোকাবেলায় কার্যকর কোনো পন্থা না থাকায় ক্রমশ তা আরো জটিল প্রকৃতির রূপ ধারণ করেছে। দেড়যুগ আগে বিশ্বব্যাংক ২০০০ সাল নাগাদ ১ কোটি ৩০ লাখ নয়া কর্মসংস্থানের অভাবের যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো[৮] ২০১০ সালে এসে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটিতে।[৯]

আমাদের দেশে জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। জন জীবনে দারিদ্র্যের এ অসহনীয় অবস্থা বেকারত্ব ও নির্ভরশীলতাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। বেকারত্ব শুধু দারিদ্র্যই সৃষ্টি করেনি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও

---

[১] বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস), বিবিএস, ২০০৫-০৬

[২] পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), ঢাকা ১৯৯৮, পৃ.১৯৯৮

[৩] বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস), বিবিএস, ২০০৫-০৬

[৪] Ahmed, Employment in Bangladesh, in E.K.G. Robinson & K. Griffin (eds), The Economic Development of Bangladesh within a Socialist Framework, The Macmillan Press Ltd, London 1974.

[৫] মোঃ রেজাউল করিম, বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবার কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ.১১

[৬] সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ১ম বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

[৭] বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস), বিবিএস, ২০০৫-০৬

[৮] উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, ১ শ্রাবণ ১৩৯২

[৯] প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

মনস্তাত্ত্বিকভাবেও আমাদেরকে এক অনিশ্চিত পথে নিয়ে যাচ্ছে। অপরাধ প্রবণতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, ভিক্ষাবৃত্তি, সাংস্কৃতিক দৈন্য, যুব অসন্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, দুশ্চিন্তা ও মানসিক পীড়ন, হতাশা ও হীনমন্যতা, আত্মবিশ্বাস লোপ ইত্যাদি সমস্যার পেছনে বেকারত্ব জড়িত। এসব সমস্যা সমাজকে একদিকে যেমন দুর্বিসহ করে তুলেছে অন্যদিকে তেমনি ব্যাহত করছে সুখ-সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিকে। বেকারত্বের ভয়াবহ চিত্র অনুধাবন করে তাই স্বাধীনতাত্তোরকালে ফাল্যান্ড ও পারকিন্স বলেছিলেন, "(বাংলাদেশে) কর্মসংস্থান সৃষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০০০ সালের মধ্যে প্রায় ২ কোটি মানুষ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বেকার হয়ে পড়বে। এ ধরনের পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সমাজের সূত্রবদ্ধতা অক্ষত রাখা যাবে না, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে ভেঙ্গে পড়বে এবং এ অবস্থায় খুবই সম্ভব বিপ্লব সংঘটিত হবে।[১]

বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ

বাংলাদেশে বেকারত্ব সৃষ্টির নেপথ্যে কী কী কারণ বিদ্যমান থাকতে পারে তা বেকারত্বের শ্রেণী বিন্যাস থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। এগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু অনুসঙ্গ বেকারত্বকে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যায় পরিণত করেছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করছি।

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার: বাংলাদেশে যে হারে প্রতি অর্থবছরে নতুন শ্রমশক্তি শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে সে হারে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। শ্রমশক্তি বৃদ্ধির উচ্চহার আর কর্মসুযোগ সৃষ্টির নিম্নহারে বিদ্যমান বৈষম্য বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুসারে বাংলাদেশে প্রতিবছর ন্যূনতম ৭৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হওয়া প্রয়োজন। বাস্তবে ১০-১৫ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না।[২]

২। কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা: কোনো সমাজ অধিক উৎপাদনকর্ম ও শিল্পায়নে অগ্রসর থাকলে সে সমাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে এ রকম সীমিত সুযোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে না বলে বেকারত্ব দেখা দেয়। বাংলাদেশে উদ্বৃত্ত শ্রমকে আমরা উৎপাদনমূলক কাজে লাগাতে পারছি না বলে বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে। শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে এরূপ উদ্বৃত্ত বেকারত্ব কমানো সম্ভব হতো।[৩]

৩। অনুন্নত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা: আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর আর কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আধুনিক নয়। এরূপ কৃষিতে যতজন লোকের কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ আছে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য আমাদের শ্রমশক্তি তারচেয়ে অনেকগুণ বেশি। ফলে শ্রম উদ্বৃত্ত হয়ে বেকারত্ব সৃষ্টি করছে।[৪]

৫। শিল্পের সঠিক বিকাশ না ঘটা: বাংলাদেশে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি এমন বলা যাবে না। শিল্পের বিকাশ ঘটেছে ঠিকই তবে তা অপরিকল্পিত এবং ভুল পরিকল্পনাভিত্তিক। কারণ বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশ হওয়ায় এ দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকশিত হলেই তা দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারতো। এতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পের উৎপাদনও নিশ্চিত করতে পারতো। কিন্তু এ দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প তেমনভাবে বিকশিত হয়নি। ফলে নগন্য সংখ্যক লোক কৃষিবর্জিত শিল্পে শ্রম দিতে সক্ষম হচ্ছে। কৃষির শ্রম বছরের অধিকাংশ সময় অব্যবহৃতই থেকে যাচ্ছে।

৬। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা: বাংলাদেশে বেকার সমস্যা তৈরির অন্যতম দায় এ দেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার। এ শিক্ষা ব্যবস্থা কেরানী তৈরি করে, আমলা তৈরি করে। কিন্তু আধুনিক কৃষক তৈরি করে না। ফলে কৃষকের ছেলে আমলা বা কেরানী

---

[১] Just Fairland & J. R. Perkins, Bangladesh – The Test Case of Development, University Press Ltd, Dhaka, 1983, p.147

[২] হাসানাইন খুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে কৃষি থেকে দূরে সরে যায়। কেরানী হওয়ার প্রতিযোগিতা করে, আমলা হওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করে। কিন্তু কৃষিকে এগিয়ে নিতে কোনো অবদান রাখতে পারে না। এমনকি দেশে ভুল পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এইসব তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা কোনো অবদান রাখতে পারছে না। ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক শিক্ষার্থীকে এ দেশে ব্যাংকে চাকরি করতে দেখা যাচ্ছে, প্রকৌশলীকে আগ্রহী হতে দেখা যাচ্ছে পুলিশের চাকরিতে![১]

৯। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** ঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বাংলাদেশে বেকারত্ব তৈরির আরেকটি প্রভাবশালী কারণ। নদীভাঙনে কৃষিজমি নষ্ট হয়, বন্যায় ফসল ও বিস্তীর্ণ এলাকা নিমজ্জিত হয়, ঝড়, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় কর্মপরিবেশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট করে। ফলে বেকারত্ব বাড়তে থাকে।

১৩। **উৎপাদনমূলক শ্রমবিমুখতা:** যে সমাজে শ্রমের উপযুক্ত মজুরি নেই বা শ্রমের গুণগত উৎকর্ষের উপর পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় না সে সমাজে শ্রমের উপর জনগণের আস্থা থাকে না। অর্থাৎ যে সমাজে জীবন নির্বাহে উৎপাদনমূলক কাজের বদলে অনুৎপাদনমূলক কাজের গুরুত্ব বেশি সে সমাজে শ্রমের মর্যাদা লোপ পায়। তাছাড়া অলসতা এবং শিক্ষিত ও ধনীদের মাঝে কায়িক শ্রমদানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব আমাদের সমাজে শ্রমবিমুখতা সৃষ্টি করে। আর এ শ্রমবিমুখতা আনে বেকারত্ব।

বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়

সমাজবিজ্ঞানী-অর্থনীতিবিদগণ বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের নানা উপায় নির্দেশ করেছেন। যেমন,

১। **কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা:** কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, অনাবাদী জায়গা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন কর্মসুযোগ তৈরি করা সম্ভব হলে বেকারত্ব কমানো সম্ভব হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্প গড়ে তুলতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। উদ্যোক্তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দান এবং সম্ভাব্য বৈষয়িক-কারিগরী সাহায্য দানের মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা যায়। দেশের ব্যাংকসমূহ, শিল্প সহায়তাদান সংস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[২]

৩। **সুষ্ঠু জনশক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ:** সুষ্ঠু জনশক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে বেকারত্বের কবল থেকে যথাসম্ভব মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যায়। একটি দেশে কোনো সময়ে কী ধরনের কত পরিমাণ শ্রমশক্তি প্রয়োজন এবং দেশের শ্রমশক্তি যোগানদাতা সংস্থাগুলো কী পরিমাণ শ্রমশক্তি যোগান দিতে সক্ষম তার উপরই নির্ভর করে জনশক্তি পরিকল্পনা। বাংলাদেশে বর্তমানে এ ধরনের সুষ্ঠু জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। আর তাতেই কর্মসংস্থানের চাহিদাকে যোগান দিয়ে পূরণ করা যাবে এবং জাতীয় চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে জনশক্তি গড়ে বেকারত্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা রোধ করা যাবে।[৩]

৪। **কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন:** দেশে যান্ত্রিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করা সম্ভব হলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ফসল উৎপাদনের জন্য ঋতুচক্রের উপর নির্ভর না করে একই জমিতে একাধিকবার ফসল উৎপাদন করা গেলে মৌসুমী বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব তেমন প্রবল আকার ধারণ করতে পারবে না। কৃষি ব্যবস্থায় এক জমিতে উন্নত দেশগুলো যেখানে বছরে সর্বোচ্চ ৬ বার পর্যন্ত ফসল ফলায় সেখানে ঋতু নির্ভরতার কারণে আমাদের দেশে সাধারণত ২ বার এবং সর্বোচ্চ ৩ বার ফসল ফলানো হয়।[৪]

---

[১] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮২

[২] ড. মাহবুব হোসেন, বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা ১৯৮৬

[৩] F. Harrison & C.A. Myers, Education, Manpower and Economic Growth, McGraw Hill Inc, New York 1964, p.189

[৪] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৫। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার: বেকার, কেরানী ও আমলা তৈরির এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল বদলে দিতে হবে। বাংলাদেশে দেখা যায়, যারা মাধ্যমিক পাস করে তারা কোনো না কোনোভাবে প্রাইভেট বা অন্য কোনো মাধ্যমে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে নেয়। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে উচ্চতর শিক্ষায় এত সহজে ডিগ্রি নেয়ার যেমন সুযোগ নেই তেমনি এভাবে অর্থহীন ডিগ্রি নিয়ে নিজেকে এবং দেশকে ভারাক্রান্ত করার নজির কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বাংলাদেশে তাই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে কর্মী তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বাংলাদেশকে বেকারত্বের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত করছে। জনগণের নিম্ন আয়ের লোকেরা অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। তারা পরিকল্পিত পরিবার গঠনের ব্যাপারে একেবারেই অসচেতন। ফলে তারা কম বয়সে ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে, প্রজনন ক্ষমতায় পক্কতা আসার আগে থেকেই সন্তান জন্ম দেয়ার কাজ করছে। যে কারণে নিম্ন আয়ের লোকদের মধ্যে জনবিস্ফোরণ ঘটেছে এবং এ পর্যায়ের লোকেরাই বাংলাদেশের জন্য বেকারত্বকে দুর্বহ বোঝা করে রেখেছে। অন্যদিকে এ দেশে যারা শিক্ষিত-সজ্জন এবং যাদের সত্যিকারের সামর্থ আছে তারা সচেতন হওয়ার কারণে উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করছে, সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রেও বয়সের উপযুক্ততার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। তারা সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে পারিপার্শিকতা, যোগ্যতা ও সুযোগের বিষয়টি একান্তভাবে চিন্তা করছে। ফলে দেশের শিক্ষিত-সজ্জনদের মধ্যে ভবিষ্যৎ মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, যাদের আসলে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ ছিলো। এমনকি এ স্তরের লোকদের সন্তান বেশি হলেও তারা শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার আশংকা ছিলো না। অথচ তাদের সন্তান থাকছে সীমিত আর যাদের সীমিত রাখা প্রয়োজন তারা তা মোটেই মানছে না। ফলে জনসংখ্যায় অসম ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে। যা দেশকে আরো সমস্যায় ভারাক্রান্ত করছে। এ অবস্থা থেকে নিজেদেরকে; দেশকে রক্ষা করতে হলে আবশ্যিকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তা অবশ্যই নিম্ন আয়ের ও নিম্ন জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ লোকদের মধ্য থেকেই শুরু করতে হবে।

৭। স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ: নিজের শক্তি-সামর্থকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার মানসিকতা আজ বেকার যুবকদের মাঝে গড়ে তুলতে হবে। নারী সমাজের বেকার অংশকেও এভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি বৈষয়িক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে তদারকি ঋণ প্রদান, বিসিকের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ ও স্বনির্ভর কর্মসূচীর আওতায় সাহায্য দানে সচেষ্ট হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকের 'বিকল্প পদ্ধতি, গ্রামীণ ব্যাংকের 'ক্ষুদ্রঋণ, গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচীর 'ঘূণীয়মান তহবিল ঋণ, ইসলামি ব্যাংকের 'আদর্শ গ্রাম প্রকল্প ইত্যাদি[১] আরো জোরদার ও সম্প্রসারিত করলে সুফল আশা করা যায়। কর্মসংস্থান ব্যাংক নামে সরকারের যে ব্যাংকটি রয়েছে সেটিকে এ ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় করা আবশ্যক।

৯। বিদেশে শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা: পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশে বিশেষত বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে দক্ষ শ্রমিকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। সরকারিভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে এ সকল দেশে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হলে বেকারত্ব সমস্যার অনেকখানি মিটে যাবে।

১২। কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তন: দেশে-বিদেশে শিল্প-কারখানা-ব্যবসায়-কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্তমানের কর্মসংস্থানের দুরবস্থাতেও দক্ষ শ্রমিকের অনেক অভাব। পোশাক শিল্পে অদক্ষ 'হেলপারের অভাব না হলেও দক্ষ কাটিং মাস্টারের এক রকম আকাল চলে। কেবল পোশাক শিল্পই নয় বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে একইভাবে দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে। দক্ষতা না থাকায় বাংলাদেশের শ্রমিকরা মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের শ্রমবাজারে পিছিয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ হারাচ্ছে বিদেশে শ্রমিক নিয়োগের সম্ভাবনা। এ অবস্থা প্রতিরোধের জন্য দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি বদলে ফেলে একান্তভাবে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

আবশ্যক। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অদক্ষ শিক্ষিত বেকারের পরিবর্তে দক্ষ শ্রমিক বের হবে। যাদের কাজের জন্য সরকারকে মোটেই ভাবিত হতে হবে না।[১]

১৪। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশে কৃষিতে প্রযুক্তির সম্পৃক্ততা তৈরির সাথে সাথে উৎপাদিত কাঁচামাল সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে কৃষিতে আরো উৎপাদন বাড়বে। শিল্পে চাহিদা তৈরি হবে। সাথে সাথে বাড়বে নতুন নতুন কর্মসুযোগ, যা বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান করে দেবে।

বেকারত্ব নির্মূলে ইসলামের বিধান এবং বাংলাদেশে এর কার্যকারিতা

ইসলামে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মত মানুষের জন্য জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে হালাল যে কোনো কাজ করাকে ফরয করা হয়েছে। কোনো মুসলিম তাই কর্ম থাকে না, থাকতে পারে না। কোনো কাজকে ছোট বা তুচ্ছ ভেবে মৌসুমী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব মেনে নেয়া কোনো মুসলিমের পক্ষে সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ–জীবিকা উপার্জন করবে এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করবে – তাহলে তোমরা সফল হবে।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্নভাবে হালাল জীবিকা উপার্জনের আবশ্যকতা এবং হারাম জীবিকা উপার্জনের পরিণতি প্রসঙ্গে তাৎপর্যবহ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। বলা হয়েছে,

ক) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "হালাল উপার্জন করা ফরযের পরে ফরয। অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয।[৩]

খ) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "হারাম সম্পদ দিয়ে তৈরি মাংস (শরীর) বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং হারাম সম্পদে তৈরি প্রতি টুকরো মাংসের জন্যে নরকই যথোপযুক্ত আবাস।[৪]

বেকারত্বকে ইসলামে অগ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মানুষ যেন কাজ করে এবং মানুষের যেন কোনো না কোনোভাবে কাজে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ তৈরি হয় সে জন্য ইসলাম নানা বিধি ব্যবস্থাপনা প্রদান করেছে। একটি মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামের এ সকল বিধি–ব্যবস্থা কার্যকর করলে বাংলাদেশও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

ক) শ্রমের প্রতি উৎসাহ দান

বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলাম শ্রমের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এ কাজে নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "শ্রমজীবির উপার্জনই উৎকৃষ্টতর, যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।[৫] একবার রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ধরনের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর? তিনি বলেছেন, "নিজের শ্রমলব্ধ

---

[১] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৪

[২] فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল–কুর'আন, ৬২: ১০

[৩] عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة বায়হাকী, মুআসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, হিজরি ১৪০১, শুআবুল ঈমান

[৪] عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولى بـ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৫] ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন কর্তৃক উদ্ধৃত, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ইফাবা ঢাকা ১৯৮০, পৃ.১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন।[১] শ্রমজনিত কারণে প্রাপ্ত ক্লান্তি মহানবী (সা) আল্লাহর ক্ষমা লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, "যে ব্যক্তি শ্রমজনিত কারণে ক্লান্ত সন্ধ্যা যাপন করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে।[২]

নবী-রাসূলগণের শ্রমের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মহানবী (সা) তাঁর অনুসারীদের শ্রমে উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তারচেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে মেষ চরিয়েছেন। চাচার সাথে বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়া গমন করেছেন। রাসূলের প্রতিজন সাহাবী নিজের কাজের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের এ ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাদেশের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যদি কোনো কাজকেই ছোট করে না দেখে তাহলে এ দেশেও কারো কাজের অভাব হবে না।

খ) ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ

কুর'আন-হাদীসে দান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অসহায়-দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মুসলিম ধনীদের সম্পদে দুঃস্থ ও বঞ্চিতদের 'হক' থাকার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তা সবই বিপদগ্রস্ত মানুষকে, কোনো কারণে অসহায়ত্ব বরণে বাধ্য বনী আদমকে রক্ষার জন্য। তা না হলে যারা কর্মের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম সর্বোতভাবে উচ্ছেদ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পেশাদার ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম ঘৃণা করে এবং এ জাতীয় ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিকভাবে নিন্দনীয় বিষয় বলে ঘোষণা করে। ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ ক্ষেত্রেও ইসলাম তাত্ত্বিক ঘোষণার পাশাপাশি ভিক্ষুকের হাতকে শ্রমিকের হাতে পরিণত করার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা করে, অথচ ভিক্ষা করা থেকে মুক্ত থাকার মত সম্পদ বা শক্তি-সামর্থ তাদের রয়েছে, তারা যখন কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সন্মুখে উপস্থিত হবে তখন তাদের মুখমণ্ডল একেবারে মাংসহীন ও বীভৎস হয়ে যাবে।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই বলতেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি। তোমাদের একজনের রশি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া, কাঠ আহরণ করা, তা পিঠের উপর রেখে বহন করে আনা এবং বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা অপরের নিকট থেকে ভিক্ষা চাওয়া থেকে উত্তম। বিশেষত এই অবস্থায় যে, সেই অপর ব্যক্তি তাকে ভিক্ষা দেবে কি, দেবে না তার নিশ্চয়তা বলে কিছুই নেই।[৫] রাসূলুল্লাহ (সা)এর এই শিক্ষার কারণেই হযরত উমর (রা) যখন কোনো উপার্জনে সক্ষম কোনো বেকার পুরুষ দেখতেন, বলতেন, "মুসলিম সমাজের গলগ্রহ ও অন্য লোকের উপর নির্ভরশীল হয়ো না।[৬]

দান গ্রহণের হাতকে ইসলামে কখনই উত্তম বলে গণ্য করা হয়নি। বরং ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অভিনিবেশ সহকারে সচ্ছল জীবন চাইলে আল্লাহ তাকে সে জীবনই দান করেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হযরত হাকিম বিন হাজ্জাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন: "উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। আর যারা তোমাদের আয়ত্তাধীন– তাদের থেকে দান আরম্ভ করো। সম্পদের প্রাচুর্য থেকে যে দান করা হয় তা হচ্ছে উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছ

---

[১] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুত তিজারাত

[২] ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন কর্তৃক উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৬

[৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল বুয়ূ

[৪] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুয যাকাত

[৫] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুয যাকাত

[৬] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম উদ্বৃত, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ.৫৮

Dhaka University Institutional Repository

থেকে কিছু চাওয়া থেকে নিষ্কৃতি চায়, আল্লাহ তাকে নিষ্কৃতি দেন। আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন।[১]

ইসলাম মূলত ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণ্য পেশা হিসেবে অভিহিত করে পাশাপাশি ভিক্ষুকের হাতকে শ্রমিকের হাতে পরিণত করার বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেছে। বাংলাদেশেও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত মুসলিমদের মধ্যে এই শিক্ষা ও সচেতনতার বিস্তার ঘটানো সম্ভব হলো বিশেষত ইসলামের শিক্ষার আলোকে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করা সম্ভব হলে তারা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে এবং ছোট হোক বা বড় হোক যে কোনো কাজ করার মাধ্যমে সম্মানজনক জীবনযাপনের চেষ্টা করবে। এতে করে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির একটি বিপুল অংশ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবে।

গ) বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম শতভাগ কর্মমুখী ধর্ম। এতে মানুষকে স্বাভাবিক সংসার জীবন যাপন করতে হয়। বৈষয়িক প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করতে হয় এবং আল্লাহর নির্দেশে এ সকল কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমেই তাঁর নৈকট্য অর্জনের যোগ্য হতে হয়। ইসলামে আল্লাহর ইবাদত করা বা তাঁকে পাওয়ার সাধনার জন্য সংসার ত্যাগের কোনো নির্দেশনা নেই, নির্দেশও নেই। বরং ইসলামে বেকারত্ব প্রতিরোধে বৈরাগ্যবাদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।[২] বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে জীবিকা নির্বাহের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)এর আগমণ পূর্ববর্তী যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা বৈরাগ্যকে তাদের সাধনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলো, যা ছিলো বেকারত্ব তৈরির অন্যতম নিয়ামক। অথচ এ নীতি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য বৈরাগ্য প্রথাকে আবশ্যক করে নিয়েছিলো। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা যে বৈরাগ্যবাদ দেখিয়েছে তার বিধান আল্লাহ তা'আলা দেননি। তারাই এটা প্রবর্তন করেছিলো। এরপর এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।[৩] ইসলামের নির্দেশনা মেনে তারা যদি তথাকথিত এই বাউলিয়ানা ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনধারায় প্রত্যাবর্তন করে এবং যে কোনো কাজকে তুচ্ছ না ভেবে হালালভাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করে তাহলে বাংলাদেশের বেকারত্বের অভিশাপ খানিকটা হলেও লাঘব হবে।

ঘ) মূলধনের যোগান দান ও বিনিয়োগের পথ নির্দেশ

বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বেকার লোকদের ছোট-খাট ব্যবসায় বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার ধারণাটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অর্থনীতিবিদগণের গবেষণায় সর্বাধিক বাস্তব সম্মত উপায়। কারণ সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে যতোই কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করা হোক, কোনোক্রমেই তা দেশের সকল বেকারের কাজ নিশ্চিত করবে না। এ জন্য বেকারদেরকে স্ব-অর্থায়নের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। স্ব-কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করতে হবে। এটা সম্ভব হলেই বাংলাদেশে বেকারত্বের সমস্যা নির্মূল হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, বেকারদের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সম্পৃক্ত হয়ে বেকারত্ব দূর করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন হবে ক্ষুদ্র আকারের মূলধনের। বেকার সেই মূলধন কোথা থেকে পাবে বা কে তাকে মূলধনের ব্যবস্থা করে দেবে?

বাংলাদেশে কর্মসংস্থান ব্যাংক রয়েছে, গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে, ব্রাক-আশা-প্রশিকার মত অসংখ্য নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (এনজিও) রয়েছে – এরা আপামর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজও করছে অন্তত আমাদের তাই মনে হয় এবং পত্র-পত্রিকায় তেমন প্রতিবেদন ও সংবাদই ছাপা হয়। বিশেষত বেকার ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে অবদান রাখার

---

[১] عن حاكم ابن حزام رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقة ما كان من ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله - (متفق عليه)

[২] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল মানাসিক

[৩] আল-কুর'আন, সূরা হাদীদঃ ২৭ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যখন পুরস্কৃত হয় তখন আর আমাদের সন্দেহ করার উপায় থাকে না। বাস্তবতা হলো, এ সকল প্রতিষ্ঠান জাতির ভাগ্যোন্নয়নের কথা বলে প্রথমত নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিচ্ছে। কারণ তারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে ঠিকই তবে তাতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মশোষণ হচ্ছে, শ্রমশক্তি নিংড়ে নিয়ে নিজেরা বিত্তবৈভবের অধিকারী হচ্ছে। যারা পিছনে ছিলো, তারা পিছনেই থেকে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণ নিয়ে বা প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সুবিধা নিয়ে কাজ করেছে এমন একজন মানুষও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়েছে, এমন খবর কিন্তু পত্রিকায় ছাপা হয় না বা গবেষণায় প্রমাণ হয় না। সে কারণেই দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রতিঘন্টায় নতুন নতুন লোক কর্মবাজারে প্রবেশ করছে কিন্তু কাজের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না।

এমন প্রেক্ষাপটে এই সকল কর্মহীন বেকার লোকদের মূলধন গড়ে দেওয়ার কাজটি সুচারু রূপে সম্পন্ন হতে পারে ইসলামের যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, সাদাকাহ, মানত, ওয়াকফ এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক দানের যে বিধান রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে। প্রধানত যাকাত দরিদ্র বেকারদের মূলধন গড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঙ) বেকারদের কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশ

বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহের পর সে মূলধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বেকারদের জন্য কী কী কর্মসংস্থান করা যায় সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো বক্তব্য ইসলামে নেই, থাকার কথাও নয়। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে রয়েছে। সেগুলোর আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হলে কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। যেমন,

কৃষিকাজ করা: মানুষের খাদ্যদ্রব্যের পুরোটা এবং বাসস্থান ও পোশাক চাহিদার অনেকখানি কৃষির মাধ্যমে পূরণ হয়। ইসলাম তাই মানুষকে কৃষিকাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "উৎপন্ন করেছি আঙুর, সবজি, যায়তুন, খেজুর, অনেক গাছগাছালিতে ভরা বাগান, আরো উৎপন্ন করেছি নানা রকম ফল এবং ঘাস, তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর ভোগের জন্য এগুলো উৎপন্ন করেছি।[১] নবী (সা)ও বলেছেন, "যে মুসলিম কৃষিকাজ করবে, ফসল ফলাবে, বৃক্ষরোপণ করবে এবং কোনো পাখি, মানুষ কিংবা জন্তু সেখান থেকে কিছু খাবে, তা তার পক্ষ থেকে সাদকা বলে গণ্য হবে।[২]

ব্যবসা-বাণিজ্য করা: বেকারত্ব দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবজির ছোটো দোকান করে কিংবা ফল ফেরি করে বিক্রি করেও একটি পরিবার পরিচালনা করা অসম্ভব নয়। এতে তারা খেয়ে-পরে কারো কাছে হাত না পেতে জীবন যাপন করতে পারবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ইসলাম বরাবরই অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। তবে তোমরা যদি পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসায় করো, তা করা তোমাদের জন্য হালাল হবে।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবেন।[৪] তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা কাপড়ের ব্যবসায় করো। কারণ কাপড়ের ব্যবসায়ী মানুষকে সব সময় সুখী এবং স্বচ্ছল দেখতে চায়। জীবিকায় ১০ ভাগের ৯ ভাগই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে।[৫]

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা: পরিবহন, জাহায নির্মাণ, খনিজ, চামড়া, পোশাক, মৎস, পশু, পোল্ট্রি ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলার নির্দেশনা কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকে লাভ করা যায়।

পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কুর'আন মজীদে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়।[৬]

---

[১] وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ আল-কুর'আন, সূরা আবাসা: ২৮-৩২

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল মুযারা'আত

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ আল-কুর'আন, ৪: ২৯

[৪] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল বুয়ূ

[৫] প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ

[৬] দ্রষ্টব্য: আল-কুর'আন, ২: ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের আরোহন ও সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আল্লাহ (তোমাদের জন্য) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন।[১] এগুলো তোমাদের ভার বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায় যেখানে অভাবনীয় কষ্ট করা ছাড়া তোমরা কখনোই পৌঁছতে পারতে না।[২]

আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ) জাহায নির্মাণ করেছিলেন।[৩] বাংলাদেশের মত নদীমাতৃক দেশে জাহায নির্মাণ কারখানায় বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাতলব্ধ সম্পদে সমবায় অথবা সমবায় উদ্যোগে বেকারগণ নিজেরাই জাহায নির্মাণে উদ্যোগী হয়ে নিজেদের বেকারত্বের অবসান করতে পারেন।

৫। খনিজ শিল্প গড়ে তোলা: আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিভিন্ন আবশ্যকীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য খনিজ সম্পদ দান করেছেন। কুর'আন মজীদের খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তা প্রমাণ হয়। বলা হয়েছে: "আমি মানুষের বহুবিধ কল্যাণের জন্য প্রচণ্ড শক্তিধর লোহা সৃষ্টি করেছি।[৪]

হযরত যুলকারনায়ন কর্তৃক লৌহ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আমার কাছে লোহার পাতগুলো নিয়ে এস। (তারা লোহার পাত নিয়ে এল) এমনকি লোহার পাতে দু পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা ভরে গেল। তখন তিনি (যুলকারনায়ন) বললেন: তোমরা এগুলো আগুনে গরম করতে থাক।' যখন লোহাগুলো আগুনের মত গরম হলো, তিনি বললেন: তোমরা এখন গলিত তামা নিয়ে এস। আমি গলিত তামা গরম লোহাগুলোর উপর ঢেলে দেব।' (এভাবে তিনি একটি অত্যন্ত মজবুত দেয়াল তৈরি করলেন।)[৫]

আয়াত দুটোতে খনিজভিত্তিক শিল্প তৈরির যে নির্দেশনা রয়েছে সে অনুসারে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কিংবা সমন্বিত উদ্যোগে খনিজ শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে একদিকে যেমন অনেক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে অন্যদিকে তেমনি বেকারদের জন্য তৈরি হবে কাজের নতুন নতুন সম্ভাবনা।

৭। চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠা: মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনে হালাল পশু জবেহ করে তার গোশত ভক্ষণ করে। এ সকল পশুর চামড়াও মানুষের কাজে লাগে। ব্যবহার্য পোশাক, ব্যাগ, জুতো থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছুই তৈরি হয় চামড়া দিয়ে। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত এবং বিশেষ করে কুরবানীর সময় বিপুল চামড়ার আমদানি হয়। বেকারগণ চামড়াভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে পারেন। রাষ্ট্রও এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান হতে পারে।

৯। বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা: পোশাক পরিধান করা এবং শালীনতা রক্ষা করা মুসলিমদের জন্য ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও তোমাদেরকে শোভন করার জন্য পোশাক দিয়েছি, আর তাকওয়ার পোশাক হলো উত্তম পোশাক। আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটা অন্যতম, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৬] স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তাই বস্ত্র তৈরির কাজ করলে অধিক লাভবান হতে পারবে। বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প ইতোমধ্যেই অনেক বিকশিত হয়েছে। দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার উপযোগী করে একে আরো স্বনির্ভর করা সম্ভব হলে এবং বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আরো দক্ষ করা সম্ভব হলে এ শিল্পে বাংলাদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বি স্থানে পৌঁছতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা কাপড়ের ব্যবসায় করো। কারণ কাপড়ের ব্যবসায়ী মানুষকে সব সময় সুখী এবং স্বচ্ছল দেখতে চায়।[৭]

---

[১] আল-কুর'আন, সূরা নাহল: ৮

[২] আল-কুর'আন, সূরা নাহল: ৭

[৩] আল্লাহ বলেন, "নূহ নৌকা তৈরি করতে লাগলেন। (আল-কুর'আন, সূরা হুদ: ৩৮) তিনি নৌকা নির্মাণের পর নূহ (আ) এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, নূহ (মুমিনদেরকে) বললেন: "তোমরা এ নৌকায় আরোহন কর। আল্লাহর নামে এ নৌকার চলুক এবং থেমে থাকুক। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরমকরুণাময়। (আল-কুর'আন, সূরা হুদ: ৪১)

[৪] وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ আল-কুর'আন, সূরা হাদীদ: ২৫

[৫] آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا আল-কুর'আন, সূরা কাহাফ: ৯৬

[৬] يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ কুর'আন, সূরা আরাফ: ২৬

[৭] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল বুয়ূ

Dhaka University Institutional Repository

১১। জীবজন্তু ও মৎস শিকার: মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে জীবজন্তু শিকার অন্যতম। আদিম যুগে এটি মানুষের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিলো। কালের বিবর্তনে পরিবর্তন এসেছে অনেক কিছুতেই কিন্তু এখনও মানুষকে আগের মতই জীবনধারণের প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। এ চাহিদা পূরণ এবং জীবনের অন্যান্য অনুসঙ্গ পূরণের জন্য বাংলাদেশের বেকারগণ সরকার অনুমোদিত এলাকায় অনুমোদিক জীবনজন্তু ও মৎস শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। এজন্য সরকার জলমহাল বা এ জাতীয় সরকারি এলাকা বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে বেকারদের অগ্রাধিকার দিলে এ সমস্যার অনেকখানি সমাধান আশা করা যায়। কুর'আন মজীদে জীবজন্তু ও মৎস শিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ সাগরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমরা সেখান থেকে তাজা মাছ খেতে পার।[১]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, "সাগরে শিকার করা ও তা ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে; তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারের জন্য।[২]

১২। পশুপালন শিল্প গড়ে তোলা: বাংলাদেশের বেকার সমস্যা নিরসনে পশুপালন অত্যন্ত উপযোগী একটি প্রকল্প হতে পারে। যাকাতের বা অন্যান্য দান সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র পুঁজি খাটিয়ে একজন বেকার পশুপালনসূত্রে সহজেই কাজ পেতে পারে। গরু মোটাতাজাকরণ বা দুগ্ধখামার প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্প প্রাথমিক পর্যায়ে এককভাবেই নেয়া সম্ভব। সমবায়ের ভিত্তিতে করলে তা আরো অনেক কর্মসংস্থানের উৎস হতে পারে। পশু পালনের ফলে দেশের দুগ্ধ, গোশত ও চামড়ার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে বিদেশ থেকে গুঁড়া দুধ আমদানিতে যে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয় তার সাশ্রয় করা সম্ভব। ইসলাম পশু পালনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ অসংখ্য চতুস্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য প্রাণীগুলোর মধ্যে শীত প্রতিরোধের উপকরণ এবং বহুবিধ উপকার রয়েছে। তাছাড়া পশুগুলো থেকে তোমরা খাদ্যও গ্রহণ করে থাক।[৩]

তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ পশুর মধ্যে কতগুলোকে বোঝাবহনকারী এবং কতগুলোকে ছোট ছোট করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছেন তা খাও ও শয়তানের পথ অনুসরণ করো না।[৪]

১৩। হাঁস-মুরগি ও পাখিপালন শিল্প প্রতিষ্ঠা: পশু পালনের মত হাঁস-মুরগি ও পাখিপালনও বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, যার মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা যায়। বাংলাদেশে পোল্ট্রি ফার্ম একটি বিকাশমান শিল্প। ক্ষুদ্র আকারে যে কোনো বেকার নিজের বাড়িতে সীমিত পরিসরে এর কার্যক্রম শুরু করতে পারে। হাঁস-মুরগির ডিম এবং গোশতের চাহিদা দেশের বাজারে যা রয়েছে তা পূরণ করার সামর্থ বর্তমানে ফার্মগুলোর নেই। এ ক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগ, আরো উদ্যোগ দেশের আমিষের চাহিদা পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি কোয়েল পাখির মত পাখির ফার্মও করা যায়। সকল ক্ষেত্রেই প্রকল্পগুলো বেকারদের অত্যন্ত উপযোগী এবং দেশের জন্য ভীষণ উপকারী।

১৪। মৌমাছি ও গুটিপোকা পালন: মৌমাছি ও গুটিপোকা পালন করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের বেকারদের। মৌমাছি থেকে মধু ও মোম এবং গুটি পোকা থেকে রেশম পাওয়া যায়। রেশমি পোশাকের চাহিদা দেশে-বিদেশে প্রচুর এবং মধু অত্যন্ত উপকারি দ্রব্য হিসেবেই দেশে-বিদেশে সমানভাবে সমাদৃত। ক্ষুদ্রাকারে মৌমাছি চাষ বা গুটি পোকা পালন অত্যন্ত লাভজনক এবং অবশ্যই তা বেকারত্ব বিনাশী।

১৫। চারণভূমি চাষাবাদের আওতায় আনা: বাংলাদেশে এখনও অনেক অনাবাদী জমি রয়েছে। অনেক এলাকা এখনো চাষের অধীনে আনা সম্ভব হয়নি। সরকার বা ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্র পুঁজি দিয়ে বেকারদের সাহায্য করলে তারা এ সকল অনাবাদী জমি

---

[১] আল-কুর'আন, সূরা নাহল: ১৪ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

[২] আল-কুর'আন, ৫: ৯৬ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

[৩] আল-কুর'আন, সূরা নাহল: ৫ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

[৪] আল-কুর'আন, সূরা আনআম: ১৪২ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

Dhaka University Institutional Repository

কম ট্যাক্সে কিংবা বিনা ট্যাক্সে বন্দোবস্ত নিয়ে চাষাবাদ উপযোগী করে তুলতে পারে। এতে দেশজ উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি বেকাররাও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পাবে।

চ) নারীদের কর্মসংস্থান

ইসলাম পুরুষের জন্য কাজের সুযোগ রেখেছে, নারীকেও বেকার থাকতে বলেনি। কুর'আন মজীদের এক ঘোষণায় এর মীমাংসা করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য আর নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[১] তাই নারী কাজ করবে, পুরুষও কাজ করবে। তবে নারীর কাজ তার প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। তাকে দিয়ে এমন কাজ করানো যাবে না যাতে তাকে বেআব্রু হতে হয় এবং তার নারীত্বের অবমাননা হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে যয়নব ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন এবং দান করতেন।[২] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ মহিলাদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৩]

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো, একজন পুরুষ কাজ পেলে একটি পরিবার যেভাবে দাঁড়িয়ে যায়, একজন নারী কাজ পেলে সেভাবে দাঁড়ায় না। তাছাড়া মূল্যবোধ ও দেশজ ঐতিহ্য অনুসারে বাংলাদেশের কোনো নারীই কোনো বেকার ছেলেকে বিয়ে করেন না, কিন্তু বেকার নারীকে বিয়ে করতে কর্মী পুরুষের কখনই আপত্তি থাকে না। কর্মী পুরুষ বেকার নারীকে বিয়ে করলে সংসার তৈরি হয়। পরিবারের সকলকে নিয়ে কর্মী পুরুষ যেভাবেই হোক জীবন যাপন করতে পারে। নারী তা পারে না। বরং নারী চাকুরিজীবি হওয়ার পর উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তাকে অবিবাহিত থাকতে হয়। দীর্ঘ অপেক্ষা অনেক সময় তাদেরকে বিপথগামী করে তোলে। সে কারণে বাংলাদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে মূল্যবোধগত পরিবর্তন সাধিত না হলে পুরুষকে বাদ দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীকে চাকরি দেয়া বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ইসলামি বিধান অনুসারে স্বামী স্ত্রীর, সন্তান মাতা-পিতার দায়িত্ব পালনে বাধ্য; এটি তার জন্য ফরয কাজ। কিন্তু স্ত্রীর জন্য এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সে কারণে বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগে প্রত্যেক পুরুষের কর্ম নিশ্চিত করা হবে। এরপর তাদের সহযোগী হিসেবে নারীরা প্রয়োজনীয় অবদান রাখবেন। কাজের ক্ষেত্রে নারীকে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলে নারীরা তাদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন না।

বস্তুত বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দেশ হলেও এটা নিতান্তই আদমশুমারির পরিসংখ্যান। তা না হলে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারী কোনো মানুষই বেকার থাকতে পারে না, কর্মহীন থাকতে পারে না। ইসলামের শিক্ষা মেনে নিয়ে বাংলাদেশ যদি বেকারত্ব দূর করার এ কার্যক্রম গ্রহণ করে তাহলে অচিরেই দেশ থেকে বেকারত্ব নির্মূল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস, যা নিশ্চিত করবে সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ এবং উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী।

---

[১] لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ আল-কুর'আন, ৪: ৩২

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা

[৩] প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরিল কুর'আন

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারী নির্যাতন

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে নারী নির্যাতন অন্যতম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এ দেশে নারী পরিবারে ও সমাজে নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতনের অস্তিত্ব শুরু থেকেই ছিলো। দৈহিক দিক থেকে নারীরা পুরুষদের অপেক্ষা দুর্বল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় পুরুষ সমাজ নারী সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারের এবং নানাভাবে তাদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে আসছিলো। মাতৃজাতির প্রতি অবজ্ঞা এবং তাদের সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ম রক্ষার মতই বাংলাদেশে ঘটত। তবে তখন একে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। অতি সম্প্রতি নারী নির্যাতনকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। মানবাধিকার খর্ব, বৈষম্য, দমন, অসহায়তা ইত্যাদি বাংলাদেশের নারীদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এর মতই নারী জীবনের অনিবার্য অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে অমানবিক, লোমহর্ষক, ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত নানা রকম নির্যাতন। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের এ হার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সূত্রে নারী নির্যাতনের যে সকল সংবাদ জানা যায় তা আতঙ্কিত হওয়ার মত এবং পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার নারী নির্যাতনে নানা বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শেষে প্রচলিত আইনে নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ দমন অসম্ভব হওয়ায় স্বতন্ত্র নারী নির্যাতন আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮৪ সালের নারী নির্যাতন নিবর্তকমূলক আইন (শাস্তিযোগ্য) ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সংশোধিত অর্ডিন্যান্স), ১৯৮৫ সালের সংশোধিত মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৯২ সালের সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ, ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং ২০০৯ সালের যৌন হয়রানি রোধক হাইকোর্টের রায় বাংলাদেশের নারী নির্যাতন হ্রাসে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ সকল বিশেষ আইনের সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত নারী অধিকার রক্ষা ও নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক আইন। কিন্তু নারী নির্যাতনের বিভীষিকা আগের মতই বাংলাদেশের নারীসমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এমনি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী নির্যাতন নিয়সনে দেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো বহাল থাকা অবস্থায় ইসলামি আইনের প্রয়োগ নতুনভাবে মূল্যায়নের দাবি রাখে। কারণ আইয়ামে জাহিলিয়া যুগে নারী জাতি যখন বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারচেয়ে বহুগুণ বেশি ভয়ঙ্কর ও অমানবিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিলো তখন ইসলামি মূল্যবোধ ও আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্যাতন থেকে কেবল রক্ষাই করা হয়নি বরং অধিষ্ঠিত করা হয়েছিলো সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে। পৃথিবীর সকল সন্তানের জান্নাত ছিলো নারীর পায়ের নিচ, সব স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ছিলো নারীর স্বীকৃতি, পৃথিবীর সব পিতার সন্তান কামনার শীর্ষে ছিলো নারী। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মে নারী পরিণত হয়েছিলো আভিজাত্য ও মর্যাদায় ভাস্বর এক অনন্য চরিত্র। বর্তমান বিশ্বে নারী মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশও যুক্ত হয়েছে এ ধারায়। সকল ক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রেখে বাংলাদেশে নারী আইন প্রণীত হয়েছে। একজন পুরুষ স্নাতক উত্তীর্ণ না হলে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদনও করতে পারে না। কিন্তু মাধ্যমিক উত্তীর্ণ নারী আবেদন করতে পারে। পুরুষের লেখাপড়া কোনো স্তরেই একক্ভাবে অবৈতনিক নয়। কিন্তু নারীর শিক্ষা দ্বাদশ পর্যন্ত অবৈতনিক। নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশে নানা রকম উপবৃত্তি চালু রয়েছে। নারীকে দেয়া হচ্ছে লেখাপড়ার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের সুবিধা। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং সকল ক্ষেত্রেই নারীরা সাধারণভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দেশের সরকারি দল ও বিরোধী দলের নেত্রী দুজনই নারী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন একেবারেই কমেনি। ইসলামি রাষ্ট্র হলে এমনিতেই এ অবস্থা বদলে যেতো। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামো বহাল রেখে ইসলামের বিধানের আলোকে কীভাবে নারীকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করা যায় এ পর্যায়ে সে কর্মকৌশল নির্ণয় করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতনের পরিচয়

"কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর যখন অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হুমকি বা বল প্রয়োগ করে তাকে নির্যাতন বলে।[১] জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রণীত সকল সংবিধান, দেশে-বিদেশে নারী মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় সকল গোষ্ঠী ও আন্দোলনে নারী নির্যাতন বুঝাতে সাধারণভাবে Violence against Women পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে।[২] সহজভাবে বললে, ".... all forms of cruelty and repression on women of all ages.[৩] এভাবেও বলা যায়, "These forms of violence frequently occur in private in the home and police and other criminal justice agencies have been reluctant to define such violence as criminal or to respond to such family matter."[৪]

অন্যভাবে বললে, "নারী নির্যাতন – তা যে ধরনেরই হোক না কেনো – কোনো বিক্ষিপ্ত বিষয় নয় এবং যৌনতা সম্পর্কিতও নয়। এই নির্যাতনের একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক উদ্দেশ্য আছে এবং তা হচ্ছে নারীর জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা।[৫]

১৯৯৫ সালে বেজিং-এ নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে বলা হয়, "any action of gender violence that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion of arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or private life.[৬]

২০০২ সালে ঢাকায় আয়োজিত 'Sub-Regional Expert Group Meeting on Eliminating Violence Against Women' শীর্ষক সম্মেলনে বলা হয়, নারী নির্যাতন শুধু কোনো ব্যক্তির উপর আক্রমণাত্মক বিশেষ কিছু নয় বরং নারীর বিরুদ্ধে মানসিক অথবা শারীরিক অথবা স্বাধীনভাবে চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ। কিংবা "ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নারীরা যখন অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক বঞ্চনার সম্মুখীন হয় এবং শারীরিক, যৌন ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরিস্থিতিকে নারী নির্যাতন বলে।[৭]

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে, নারী নির্যাতন হলো শারীরিক, মানসিক, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক এবং মানবাধিকার লংঘনমূলক ব্যবস্থা।[৮]

---

[১] প্যাসিফিক এশিয়ান উইমেনস ফোরামের নারী নির্যাতন বিষয়ক আলোচনায় প্রদত্ত নিপীড়ন বা ভায়োলেন্সের সংজ্ঞা। ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্বৃত, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩১

[২] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৬; ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩০; জাতীসংঘ প্রণীত সকল বিধি-উপবিধিতে শব্দটির সাধারণ ব্যবহার থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়।

[৩] Dr. Mohammad Abdur Rob and Mostaq Mohammad, Violence against city women, The Independent, 10 September 1999, Dhaka

[৪] Edllar, Quoted by Abdul Halim, The Enforcement of Human Rights, Dhaka 1995, p.50

[৫] সি. বালচ, "দুর্বিসহ স্থিতাবস্থা : নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা, উদ্বৃত: ইউনিসেফ, বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৬০

[৬] Quoted by Syed Mehdi Momin, Violence against women and children : searching for causes, Weekend Independent, 12 February 1999, Dhaka p.4

[৭] "Violence against women is not just an assault against an individual but against women's personhood, mental or physical integrity or over freedom of movement on account of their gender. Violence against women is well-defined as any act of gender based violence that results or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. Jyoti Talukder, Violence Against Women in Nepal, Country Report CWCD, Nepal, 1997, p.1

[৮] "Gender violence is a violence against women that results in physical, mental, sexual coercion of human rights. - United Nation, The Worlds Women Trends and Statistics, 1995

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন এমন একটি লিঙ্গীয় অপরাধমূলক কাজ যার ফলে নারীর লিঙ্গীয় অথবা মানসিক ক্ষতি হয় অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া এ ধরনের দুষ্কর্ম ঘটানোর হুমকি দেয়া, নানা রকম জোর-জবরদস্তি করা চলাচলের বিঘ্ন ঘটানো নির্যাতনের সংজ্ঞায় পড়ে। এ অপরাধমূলক কর্ম যেখানেই সম্পন্ন হোক না কেনো (যেমন গৃহাভ্যন্তরে অথবা প্রকাশ্য রাজপথে) তা নারী নির্যাতন হিসেবেই গণ্য হবে। এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন যেমন যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, নারীর পাচার ও লিঙ্গীয় শোষণ, স্ত্রীকে মারধোর করা, নারী ও কন্যা শিশু ধর্ষণ ও শারীরিক অত্যাচার, যৌন হয়রানী করা ও পতিতা বৃত্তিতে নিয়োজিত করা ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, জাতিসংঘ ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্ব জুড়ে সব দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের এ বিষয় নিয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করেছে। প্রতিবছর এ বিষয়ের উপর আলোচনা, বিতর্ক ও সুপারিশ চলছে। ২০ বছর পর ১৯৯৪ সালে পৃথিবীর সব দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা সকলে একমত হয়ে একটি অবশ্য পালনীয় দলিল তৈরি করেছেন। এটি হলো বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন। এই দলিলের বিশ্লেষণ ও ঘোষণাটি নিম্নরূপ: "নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান অসম ক্ষমতা সম্পর্কের একটি বহিঃপ্রকাশ, যা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। নারীর পরিপূর্ণ অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।[১]

বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোনো কাজ অথবা আচরণকে বুঝায় যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও এ ধরনের কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালিভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণকেও বুঝায়।[২]

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। নারীগণ ত্রিবিধভাবে শোষিত ক) তারা মানুষ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক শোষিত, খ) তারা গৃহবধূ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক শোষিত এবং গ) তারা বেতনভুক্ত হিসেবে শোষিত।[৩]

নারীর প্রতি নির্যাতনে ভীতিকর মাত্রা যোগ করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আর একই সাথে প্রশাসনের বিরূপ আচরণ। ১৯৯৩ সালে পুলিশ কর্তৃক শিশু তানিয়া ধর্ষণ, ১৯৯৫ সালে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা, ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে রাউজান থানা পুলিশের দ্বারা গার্মেন্টস কর্মী সীমা চৌধুরীর ধর্ষণ ও হত্যা এ ভীতিকর নির্যাতনেরই ধারা বিশেষ।[৪]

নারী নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Status of Women প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Violence against women is alarmingly on the increase. The Bangladesh Bureau of Statistics, in a special report in 1993 revealed that death due to unnatural causes (suicides, murder, burn, snake bite, accident and drowning) in almost three times higher for women that pregnancy related causes.[৫]

নারী নির্যাতন স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি হলো আঘাত করা বা অপব্যবহার, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিক চাপ, মানসিক নিপীড়ন, অপহরণ, বউ পেটানো, যৌন নিপীড়ন বা অপব্যবহার, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, বিদেশে পাচার, অন্যায়ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং ধর্ষণ করতে গিয়ে জখম বা মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[৬]

---

[১] জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন-বেইজিং, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ.৩২

[২] বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্ধৃত, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩২

[৩] বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ.৩

[৪] সম্মিলিত নারী সমাজ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ৮ মার্চ ১৯৯৭, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্ধৃত, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৩

[৫] Government of Bangladesh, Planning Commission, 1998 Fifth Five Year Plan 1997-2002, Ministry of Planning, p.IX, 1-5

[৬] Syed Mehdi Momin, Violence against women and children : searching for causes, Weekend Independent, 12 February 1999, Dhaka p.4

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারণ

নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশে যে সমাজ কাঠামো ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তা অনেকাংশে নারী নির্যাতনের অনুকূল। এর সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিকতা, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে নারীর দুর্বল অবস্থান, মানবিক শিক্ষার অভাব, পরিবার কর্তার ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, দারিদ্র্য, যৌতুক প্রত্যাশা এবং সাংস্কৃতিক দৈন্যদশার মত সামাজিক বিষয়াদি একটি জটিল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এ দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। নানাভাবে এ কারণগুলো বিশ্লেষণ করা যায়।

সমাজতাত্ত্বিক কারণ: সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নারী অধঃস্তনতাকে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজে এতে পিতৃতান্ত্রিকতা নারীকে গৃহাভিমুখী করে এবং তার সামাজিক অবস্থান লিঙ্গভিত্তিক হীনমন্যতা, অসমতা ও অধঃস্তন অবস্থায় ফেলে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে বলে দাবি করা হয়। এ ধরনের সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশে নারী নানা কারণে নির্যাতিত হতে পারে, যেমন: রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎমুখী অবস্থান, লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর প্রান্তিক অবস্থান ও সমাজ-সৃষ্ট নারী, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর কম সম্পৃক্ততা ও নারীর দরিদ্রতা, নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন, শারীরিক গঠন কাঠামো ও দুর্বলতা, উৎপাদনশীল ভূমিকার চেয়ে অনুৎপাদনশীল ভূমিকাকে প্রাধান্য দেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অবমূল্যায়ন এবং ধর্মের বিকৃত প্রয়োগ ও অপব্যবহার।[১]

মনস্তাত্ত্বিক কারণ: নারী নির্যাতনে জড়িতদের ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, তাদের ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, মানসিক অসুস্থ্যতা ও বিকৃতি, ব্যক্তিত্বের ত্রুটিপূর্ণ ধরন-কাঠামো এবং দুর্বল নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নারী নির্যাতন সমস্যা সৃষ্টি ও বিস্তারে ক্রিয়াশীল হয়। জীবন অভিজ্ঞতায় নারীর প্রতি সহিংসতা হলো এক ধরনের শিক্ষণমূলক আচরণ। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে শূন্যতার যে ত্রুটি থাকে কিংবা ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়ের যে অবস্থা হয় এর ফল হলো নারী ও শিশু নির্যাতন। তিনি বিভিন্ন সমীক্ষায় নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে মুখ্য যেসব কারণগুলো খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ ও মানবীয় বিকাশে ত্রুটিপূর্ণ অভিজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব, মানবাধিকার ও মর্যাদাসহ শারীরিক শাস্তি বিষয়ে অজ্ঞতা, দুর্বল পারিবারিক সামঞ্জস্য স্থাপন, সামাজিক দূরদৃষ্টির অভাব, মানসিক অসুস্থতা এবং দুর্বল নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ।[২]

অর্থনৈতিক কারণ: বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানহীনতা, দারিদ্র্য, কম মজুরী ও বিত্তহীনতার সাথে অনেক গবেষক নারী নির্যাতনের সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন।[৩] এরূপ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও দৈন্যদশায় নারীদের অধিক উপার্জনমূলক শ্রমদানে নিয়োজিত করতে, পিত্রালয় থেকে যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থ বা ব্যবহার্য সামগ্রি আনতে এবং দারিদ্র্য সমস্যায় মানবীয় চাহিদা অবদমিত করতে নারী নির্যাতন হয়। অন্যদিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে ভোগবাদী মানসিকতার প্রভাবেও অনেকে বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কিংবা অতি বৈষয়িক প্রাপ্তির উন্মাদনায় নারী নির্যাতন করে।

শিক্ষা ও নৈতিক কারণ: সমাজে শিক্ষা ও নৈতিকতার অবনতি ঘটলে মানুষের মধ্যে নানা রকম বিচ্যুত আচরণ জন্ম নেয় ও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে জীবনগঠনমুখী ও মানবতামুখী শিক্ষার বর্তমান সঙ্কট নারী নির্যাতনের হারকে বাড়িয়ে তুলছে। অন্যদিকে ধর্মীয় আদর্শগত বাধ্যবাধকতা ও নৈতিকতায় মানব আচরণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় মানুষের মধ্যে নারী নির্যাতনমূলক দায়িত্বজ্ঞানহীন বর্বরোচিত আচরণ দানা বেধে উঠছে। বস্তুত শিক্ষার সঙ্কট ও নৈতিকতায় অবনতি সমাজের ভিত্তিমূলকেই কাঁপিয়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে মানবীয় বিচারবোধ গড়ে উঠে না বলে বর্বরতা-পাশবিকতায় মানুষ নিজেকে জড়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।[৪]

---

[১] নূর কামরুল নাহার, নারী নির্যাতন : মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি, দৈনিক যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০০১, পৃ.১০

[২] Syed Mehdi Momin, ibid p.12

[৩] Abdul Halim, The Enforcement of Human Rights, Dhaka 1995, p.3

[৪] S. Halima, Violence against women in Bangladesh, Dhaka 2000, p.12

Dhaka University Institutional Repository

নারী স্বাধীনতার ধারণাগত সঙ্কট: উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ব্যাপকতর করার গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ার মধ্যে নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতি-অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা মজবুতকরণের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে জোরদার হয়েছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্যধারার উগ্রতায় কোনো কোনো মহিলা নারী স্বাধীনতাকে নারীবাদী বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে ব্যাপক ও বেপরোয়াভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করছে। এতে একটা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে যা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের রূপান্তর মাত্র, যা কি-না নারীর সাথে পুরুষকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চায়। এর পরিণতিতে শারীরিক শক্তি ও সামাজিক কর্তৃত্বগত ক্ষমতায় অনেক পুরুষ নারীর প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে ও নির্যাতনমূলক আচরণ করে বসে।[১]

যৌতুক প্রথা: সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে যৌতুক প্রথাকে চিহ্নিত করা যায়। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিবাহ হচ্ছে যৌতুকের মাধ্যমে। যৌতুকের দাবি পূরণকে কেন্দ্র করে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা যেমন নির্যাতিত হচ্ছে তেমনি উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতেও যৌতুকের পরিমাণের উপর স্বামীর পরিবারে মেয়েদের সম্মান ও মর্যাদা নির্ভর করছে। গ্রামের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌতুক প্রথা। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে মানসিক ও দৈহিকভাবে নির্যাতন চালানোর ফলে মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যা এবং হত্যার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২]

শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব: নৃতাত্ত্বিকভাবে এটা স্বীকৃত সত্য যে, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে সঞ্চারিত হয়। নারীদের মাধ্যমে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তাদেরকে মূল দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রাচীন যুগে নারীরা তাদের মা ও নারীদের কাছ থেকে তাদের কাজের শিক্ষা লাভ করতো, যা ছিলো মূল্যবান। কিন্তু বিস্তৃত পারিবারিক লালন-পালনসহ কৃষিভিত্তিক সমাজের রূপান্তর এবং শিল্পায়িত সমাজের বিকাশের ফলে নারীরা এসব প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে নারীরা বেকার এবং পুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। যা নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও নির্যাতনের মানসিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।[৩] বাংলাদেশে এ কারণটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তব। এখানে নারীরা শিক্ষা লাভের যে সুযোগ লাভ করে তা গতানুগতিক। অনেক সময় একটি ভালো বিয়ে হওয়ার প্রত্যাশায় নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তারা কর্মগত কোনো দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী হয় না। ফলে পুরুষের কাছে নির্যাতিত হলেও নিজেদের অসহায়ত্ব ও অদক্ষতা বিবেচনা করে তার পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

পুরুষ নির্ভরতা: বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং শারীরিকভাবেও পুরুষের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করে। নিজেরা উৎপাদন ও উপার্জনে যুক্ত কম থাকে বলে পুরুষের অর্থে তাকে জীবন চালাতে হয়। একই কারণে পরিবারে ও সমাজে সে পুরুষের পরিচয় ও প্রভাব ব্যবহার করে। কায়িক শ্রমের কোনো কাজ সে নিজে করে না। শারীরিক কমনীয়তার দোহাই দিয়ে সে কাজ পুরুষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। এতে সকল ক্ষেত্রে সে একান্তভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যে কারণে পুরুষ নারীর উপর নির্যাতন করার সুযোগ পায়।[৪]

ধর্মীয় বিধান অনুশীলনের অভাব: তত্ত্বগতভাবে অধিকাংশ ধর্ম নারীকে যথাযথ সম্মান দেয়ার কথা না বললেও বাংলাদেশে প্রচলিত ও আচরিত প্রধান ধর্ম ইসলামে আদর্শিকভাবেই নারীকে বিপুল মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য অনিন্দ্য সুন্দর এবং বাস্তবসম্মত নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের এ সকল ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখে না। যারা রাখেন তারাও সঠিকভাবে তা অনুশীলন করেন না। ফলে প্রায়ই ধর্মের নামে এখানে নারীকে অপমানকর নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যার সাথে অন্তত ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।[৫]

---

[১] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৪

[২] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৩

[৩] মজিবুর রহমান খান, বাঙালি নারী বাংলার নারী, ঢাকা ২০০৯, পৃ.২৩

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৫] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতি

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন কথাটি বিশেষ প্রচলিত এবং আলোচিত কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। বিশেষ করে নির্যাতনের প্রকৃতি যখন বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতনের ঘটনাগুলো অধিকাংশ যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ ঘটনায় কেন্দ্রীভূত। প্রতিবছর বৃটেনে ধর্ষণের শিকার হয় ৩ লক্ষ নারী।[১] যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে অবাধ যৌন স্বাধীনতার মধ্যেও ধর্ষণ ও নারী মর্যাদা হানিকর যৌন বিষয়ক কেলেংকারি অনেক সময় বিশ্বজুড়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে প্রতি ছয় মিনিটে একটি ধর্ষণের রেকর্ড হতে দেখা যায়।[২]

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নারায়নগঞ্জ থেকে তরুণীদের ভারতে পাচার[৩] মানবাধিকার ও জেন্ডার বিষয়ে আঞ্চলিক সেমিনার ॥ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নারীরা[৪] সার্কভুক্ত দেশের নারীশিশু সহিংসতা পর্যবেক্ষণের জন্য ২০০৪ সালে গড়ে ওঠা সংগঠন 'সার্ক অটোনোমাস উইমেন অ্যাডভোকেসি গ্রুপের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৪টি স্থায়ী যৌনপল্লীতে প্রায় ১৫ হাজার যৌনকর্মী রয়েছে। তাদের ৮৩.৪ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। এসব মেয়েরা যৌনপল্লীতে বিক্রি হওয়ার আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫]

বিয়ের পিঁড়িতে বসা হলো না মনি আক্তারের। তার আগেই তাকে লাশ হয়ে যেতে হলো।[৬] স্বামীর অত্যাচারের আত্মহত্যা করেছেন স্ত্রী।[৭] যেখানে ১৮ বছরের আগে বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় সেখানে দেশে কিশোরী মাতৃত্বের হার ৩৩ শতাংশ।[৮] ৬৬ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার।[৯] এখানে নারীদের বিয়ের গড় বয়স ১৫.৩ বছর। এই অল্প বয়সে বিয়ে করা নারীদের সন্তান ধারণের প্রবণতাও বেশি। এগুলো দেশের জনসংখ্যা সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

যৌতুকের জন্য নভেম্বরে মৃত্যু হয়েছে ৩১ নারীর। অপরদিকে যৌতুকের কারণে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, ইভটিজিং এবং পারিবারিক সহিংসতার কারণে এক মাসে আত্মহত্যা করেছে ১৫ নারী ও ৩ জন পুরুষ। এছাড়া ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৯ নারী ও শিশু। এরমধ্যে ৩৪ নারী ও ১৫ মেয়ে শিশু। ৩৪ জন নারীর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ২১ জন, গনধর্ষণের শিকার হয়েছে ২জন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১১ নারীকে। ১৫ মেয়ে শিশুর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১জন, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১জন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩ শিশুকে। এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ৮ জন। এর মধ্যে নিহত হয়েছে ১ জন। গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬ জন এর মধ্যে ৫ জন আহত ও ১ জন নিহত।[১০]

নারীর অমর্যাদা ও নির্যাতনের ধারায় তাকে নানা প্রলোভনে ব্যভিচারে নিয়োগ করা হচ্ছে, সাথে সাথে তা গোপন ভিডিওতে ধারণ করে বাজারযাত করা হচ্ছে।[১১] কন্যা সন্তান জন্মের অপরাধে এই ২০১০ সালেও স্ত্রীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়।[১২]

---

[১] আকরাম হোসেন চৌধুরী, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বর্তমান চিত্র, আজকের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০০, পৃ.৫

[২] The Bangladesh Observer, 27 April 1995

[৩] প্রথম আলো, ১১ আগস্ট ২০০৯, পৃ.৪

[৪] প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.২৪

[৫] প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.২৩

[৬] প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৭

[৭] প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৭

[৮] জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট) মিলনায়তন, ৯ জুলাই ২০০৯ (সূত্রঃ প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০০৯, পৃ.৩)

[৯] প্রথম আলো ১৪ আগস্ট ২০০৯, পৃ.২৪-২৩

[১০] প্রথম আলো ৬ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৫

[১১] প্রথম আলো ১৩ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১০

[১২] প্রথম আলো ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ , পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে যাতনার বিষয় হলো, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার ৯৫ শতাংশ নিম্ন আদালতেই খারিজ হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে প্রাথমিক তথ্যবিবরণী (এফআইআর) দুর্বল, তদন্তে অবহেলা এবং সাজানো মামলাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আইনজীবিরা। ..... ঢাকার সিএমএম আদালতে ২০০৯ সালে নারী নির্যাতনের ১৩১১টি মামলার মধ্যে ২২৮টি ধর্ষণের আর বাকি ১২২৯টি মামলা যৌতুক, প্রতারণা ও আত্মহত্যায় প্ররোচিত করাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সংক্রান্ত। ঢাকার বাইরের চিত্রও একই রকম। রাজশাহীতে ২০০৯ সালে মোট ৫২০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এরমধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ২১টিতে। অর্থাৎ এখানেও ৯৬ শতাংশ মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।[১]

গ্রাম্য সালিসের নামে বাংলাদেশে নারীর প্রতি অবিচার করা হয় হর-হামেশা।[২] দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিকাগণ পর্যন্ত তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার হাতে নিগৃহীত হন। সম্প্রতি শিক্ষিকাদের সঙ্গে এক কর্মকর্তার অশালীন আচরণ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।[৩]

বাসে নারী যাত্রীরা প্রতিদিন হয়রানী শিকার হচ্ছেন।[৪] আগুনে পুড়িয়ে হত্যার মত বীভৎস ঘটনাও নারীর ক্ষেত্রে ঘটছে।[৫]

নারীকে সামাজিকভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য হাইকোর্ট যৌন হয়রানী রোধে যে রায় প্রদান করেছে, বিশেষভাবে লংঘন করা হচ্ছে সে রায়। কোন প্রতিষ্ঠানই এ রায় মেনে নেয়ার আগ্রহ দেখায়নি।[৬]

সমাজে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রকাশ এসিড নিক্ষেপ। সর্বশেষ ২৮ অক্টোবর এসিড সন্ত্রাসের শিকার হলেন কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার কমলাপুরের শিলা ও নিলুফার। বিয়ের এক দিন আগে দুর্বৃত্তের ছোড়া এসিড অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে শিলার স্বপ্ন। শিলার (২০) সঙ্গে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন তার বড় বোন নিলুফারও (২৫)।[৭]

বাংলাদেশে পথে-ঘাটে নারীকে নানাভাবে উত্যক্ত করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া এতটাই ভয়াবহ যে, উত্যক্তকৃত নারীকে প্রায়ই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। বখাটেদের উৎপাতে নিজের জীবন বাঁচাতে পানিতে পড়ে মারা গেছে তৃষা। নারায়নগঞ্জের চারুকলার ছাত্রী সিমি এবং খুলনার রুমি উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করেছেন। বখাটেদের উৎপাতে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের একটি অংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য হয়। অনেক অসহায় অভিভাবক মেয়েদের বাল্যবিবাহের মাধ্যমে উৎপাত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে নেন।[৮]

সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাব, দেশের প্রায় ৩৩ শতাংশ গর্ভধারণ অপরিকল্পিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণের কারণে অনেকে গর্ভপাত ঘটান। অধিকাংশ সময় সেই গর্ভপাত হয় অনিরাপদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, বাংলাদেশে ১৪ শতাংশ মাতৃ মৃত্যুর কারণ অনিরাপদ গর্ভপাত। অপরিকল্পিত এই গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের পুরো ঝক্কি পোহাতে হয় নারীকে।[৯]

বাংলাদেশে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে ব্যভিচারের অভিযোগে নারীকে নিগৃহীত করা হয়।[১০] স্বামীর নির্যাতনে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুবরণ করছেন অনেক নারী।[১] ধর্ষক পশুদের হাতে অমানবিকভাবে নিগৃহীত হন নারীরা। এ ক্ষেত্রে মানবিকতা, শালীনতা, সভ্যতার চরম সীমা অতিক্রম করে এই সব পশুরা।[২]

---

[১] প্রথম আলো ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ.২৪ ও ২১

[২] প্রথম আলো ১৮ জুন ২০০৯, পৃ.১০

[৩] প্রথম আলো ১৩ আগস্ট ২০০৯, পৃ.৫

[৪] প্রথম আলো ৩১ জুলাই ২০০৯, পৃ.১২

[৫] অগ্নিদগ্ধ ফাতেমা ঃ আর কত পৈশাচিকতা? প্রথম আলো ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১২

[৬] প্রথম আলো-বিএনডব্লিউএলএর গোলটেবিল বৈঠক ঃ যৌন হয়রানী রোধে মানা হচ্ছে না হাইকোর্টের রায় প্রথম আলো ১৯ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.২০

[৭] এসিড সন্ত্রাসে আক্রান্ত দুই বোন ঃ অপরাধীর গ্রেপ্তার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১০

[৮] নারীকে উত্যক্ত করা ঃ সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া রেহাই মিলবে না প্রথম আলো ২৩ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১২

[৯] ৩৩ শতাংশ গর্ভধারণ অপরিকল্পিত ঃ গর্ভপাতের দায় শুধুই নারীর প্রথম আলো ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.৩

[১০] দোররা মারা কবে বন্ধ হবে প্রথম আলো ২২ জুন ২০০৯, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ নারীদের প্রতি নির্যাতনের সবচেয়ে আদিমতম এবং সর্বাধিক অমানবিক রূপ। এসিড নিক্ষেপে একজন নারীর যদি চেহারায় বিকৃতি ঘটে তবে ধর্ষণের ফলে তার জীবনের সকল কামনা-বাসনার মৃত্যু ঘটে।[১]

নারীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন, প্রহার বা গায়ে হাত তোলা আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে, বস্তি ও নিম্নবিত্ত পরিবারে সাধারণত হয়ে থাকে এবং এর প্রধান শিকার হচ্ছেন স্ত্রীরা। "It is one of the under reported type because in this country patriarchal norms about unequal gender relations in the family prevail. A husband's right to absence his wife is recognized by family and society.[৪]

বাংলাদেশে নিজ ঘরেও নারী নির্যাতিত হন। ঘরের নির্যাতনের একটি দিক হলো, এর সংঘটনকারী হচ্ছে পরিবারের ঘনিষ্ঠ পুরুষ ব্যক্তি। পরিবার নামক তথাকথিত নিরাপত্তার আশ্রয়ে এই ধরনের নির্যাতন নারীদের প্রতি সংঘটিত হয় বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অজানা থেকে যায়। জাতিসংঘ এই নির্যাতন সম্পর্কে বলেছে, "Violence in the family manifests itself in physical, instrumental, often repetitive, which is inter related with the exercise of mental torture, neglect of basic needs and sexual molestation.[৫]

বাংলাদেশে নির্যাতিত নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নির্যাতনের বিষয় গোপন রাখেন। পারিবারিক শান্তি, সন্তানের ভবিষ্যত, নিজের সম্মান ইত্যাদি নানা কারণে মুখ বুজে ভয়ঙ্কর সব নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করেন। এদেশে যতো নারী নির্যাতিত হন, তার খুব ছোট অংশই কেবল প্রকাশিত হয়; তাও প্রকাশিত হয় তখন যখন প্রকাশ না করে আর কোনো উপায় থাকে না। দেশে নারীরা এসব নির্যাতনের শিকার হয়ে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বসবাস করছে, যা একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের এই দেশে ইসলামি আইন ও বিধান কার্যকর করে বর্তমান সমাজ কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে কীভাবে নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, কীভাবে বন্ধ করা যায় ভয়ঙ্কর নিপীড়ন – এ পর্যায়ে সে কর্মকৌশল অনুসন্ধান করা হবে। এ জন্য প্রথমে জানা প্রয়োজন ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে কী মানসিকতা পোষণ করা হয়।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

রাসূলুল্লাহ (স) এর আবির্ভাবের আগে আরবে নারী জন্ম তখন এতটাই কলঙ্কজনক ছিলো যে, মাতাপিতা কন্যা শিশু জন্মের সাথে সাথে তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলতো। কুরআন মজীদে এর ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, "আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোনো অপরাধে সে হত্যাকৃত হয়েছিলো।"[৬] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার লজ্জার কারণে সে নিজের সম্প্রদায়ের নিকট হতে সে সংবাদ গোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না কি মাটিতে পুঁতে ফেলবে! সাবধান, তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতো নিকৃষ্ট![৭] পিতা বা

---

[১] সৌমিত্র মানব, আন্তর্জাতিক নারী দিবসেই নির্যাতনে পুত্রবধূ সোমার মৃত্যু, সাপ্তাহিক ২০০০, ১২ মার্চ ২০১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪৪, পৃ.৪৪

[২] খিলগাঁও বিউটিফিকা ॥ সব ধর্ষককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুন প্রথম আলো, ২২ মার্চ ২০১০, পৃ.১২

[৩] বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, নারী নির্যাতন দিবস সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ.৫

[৪] Women for Women, A Research and Study Group, 1997, Regional Overview on Violence Against Women: A Working Paper for Expert Group Meeting, Dhaka, p.3

[৫] United Nations Leaf-let Published on the Year of the Family 1993, p.3

[৬] وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ আল-কুর'আন, সূরা তাকভীর: ৮-৯

[৭] وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ আল-কুর'আন, সূরা নাহল: ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর সম্পদে নারীর কোনো অধিকার ছিলো না। সকল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিতা নারীকে প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করা হতো পণ্য দ্রব্যের মতো। তদানীন্তন কালের খৃষ্টান, ইয়াহুদী, হিন্দু ও অগ্নিপূজারীদের সমাজব্যবস্থায় নারী সামান্যতম ইজ্জত এবং অধিকারও পাচ্ছিলো না। ইসলাম নারীকে কেমন অধিকার বা মর্যাদা দিয়েছে, তা বুঝাবার জন্য অজ্ঞতার যুগে বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থা জানা প্রয়োজন। গ্রিক সভ্যতায় নারীরা ছিলো অত্যন্ত তুচ্ছ। সপ্তদশ শতকে রোমে অনুষ্ঠিত 'Council of Wise' এর সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীহ হয়েছিলো যে, 'Woman has no soul' বা নারীর কোনো আত্মা নেই। বিশ্বে চীন দেশেই নারীর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলো। চীনের ধর্ম গ্রন্থে নারীকে "Waters of woe" (দুঃখের প্রস্রবন) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। খৃষ্টীয় রোমান সভ্যতায়ও নারীদের অলক্ষী, অপয়া মনে করা হতো। ইহুদী ধর্ম মতে নারীর উপর সৃষ্টি কর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে এবং নারী সকল পাপের মূল উৎস। হিন্দু সমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদের ভাষায়, "নারীরা বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন।[১]

Professor Indra তার Status of Women গ্রন্থে বলেছেন, 'নারীর মতো এতো পাপ-পঙ্কিলময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্বলিত আগুনের মতো। সে ক্ষুরের ধারালো দিক, এর সবকিছুই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।'[২]

সমকালীন হিন্দু সমাজে পুত্র সন্তানকে কল্যাণের প্রতীক মনে করা হতো। আর এ কারণেই পুত্র সন্তান জন্মালে পরিবারে আনন্দের সীমা থাকতো না। কিন্তু প্রসবকৃত সন্তান কন্যা হলে বিষাদের ছায়া নেমে আসতো। এ কারণেই তারা প্রার্থনা করতো, 'হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান করো, আমাদের পুত্র সন্তান দাও।'[৩] বৌদ্ধ ধর্ম মতে, নারী হচ্ছে মোহের বাস্তব রূপ এবং মানবাত্মার নির্বাণ লাভের সবচেয়ে বড়ো বাধা।[৪] মানুষের জন্য প্রলোভনের যতোগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়েছে যা মানুষের মনকে অন্ধ করে দেয়।[৫] পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা নির্ণয় করা যেমন অসম্ভব, নারীর চরিত্র হলো তেমনি নিবিড় – যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর, তার নিকট মিথ্যা সত্যের মতো এবং সত্য মিথ্যার সমান।[৬]

বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুসারে এর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৯%) হলো নারী।[৭] তা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অধিকাংশ নারী বসবাস করছে দারিদ্রসীমার নিচে। আর্থিক কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত রাখা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরি, নিরাপত্তা, সম্পদের অধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নেতৃত্বসহ সকল ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রেও নারী বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী বৈষম্য, নির্যাতন, নারী অধঃস্তন প্রভৃতি চিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে ঘরে ঘরে নারীর অসম্মান, অমর্যাদা, পৈশাচিক নির্যাতন একটি রুটিন ওয়ার্কে পরিণত

---

[১] দ্রষ্টব্য: সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, নারী নির্যাতনের রকমফের, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা অক্টোবর ২০০২, পৃ.১১-৬৪

[২] 'There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body.' Professor Indra, Status of Women উদ্বৃত: সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩

[৩] The birth of a girl grants if else-where, here grant a boy. উদ্বৃত: সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩

[৪] দ্রষ্টব্য: সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১১-৬৪

[৫] 'Women are of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world – Westmark, উদ্বৃত: সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪

[৬] 'Unfathomably deep, like a fish's course in the water, in the character of women, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie. - Bettany, World's Religions, উদ্বৃত: সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪

[৭] UNICEF, Progress of the Nations, New York, 2003, p.2

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এফবিআইয়ের ক্রাইম রিপোর্টের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, প্রতিবছর ১৫ হাজার আমিরিকান মহিলা তাদের স্বামী, পূর্বস্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের পৈশাচিক নির্যাতনে প্রাণ হারায়। দেশটিতে অপমৃত্যুর শিকার নারীদের ৩৪%ভাগ নিহত হয় স্বামীদের নির্যাতনে। নির্যাতিত নারীদের ১০% অন্তঃসত্তা অবস্থায় এ নির্মম অবস্থার শিকার হয়। প্রতি দুই মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষণের শিকার হয়।[১]

বর্তমানে ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গর্ভপাতকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ সকল দেশের অনেক সম্পতিই Ultrasound Pregnancy Scanner (UPS) এর সাহায্যে গর্ভবর্তী অবস্থায় ভ্রূণের পরিচয় জেনে নিচ্ছে এবং মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে গর্ভপাতের ঘটনা ঘটাচ্ছে, সহজ কথায় ভ্রূণ হত্যা করছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ প্রচারণা জনপ্রিয় শ্লোগানে রূপ নিয়েছে। সেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যৌতুক ও নারী নির্যাতনের নির্মমতা থেকে ভবিষ্যত মেয়ে সন্তানকে রেহাই দেয়ার জন্য UPS এর সাহায্যে পরিচয় জেনে কন্যা ভ্রূণকে আগেই হত্যা করছে। এ জন্য এসকল অঞ্চলের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে, Pay 500 rupees and save 50000![২]

বস্তুত আধুনিক সভ্যতা নারীকে প্রাচীনকালের নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে উদ্ধার করে নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির নামে নতুন এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের নামে নারীর লজ্জা, ইজ্জত, আবরু ও নৈতিক পবিত্রতার মহামূল্যবান সম্পদ প্রকাশ্য বাজারে ভোগ্য পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে। নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে মানুষের পর্যায় থেকে পণ্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। সর্বত্র অলঙ্কার ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে নারী। যৌতুক, এসিড সন্ত্রাস, স্বামী ও তার পরিবারের নির্যাতন, ছেলে বন্ধুদের হাতে নিগৃহীত হওয়া এবং কর্মস্থলে যৌননিপীড়নের শিকার নারীর সংখ্যা উন্নত-অনুন্নত সকল দেশেই আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। নারী দেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে বাজারজাত করা হচ্ছে বিভিন্ন পণ্য। সবমিলিয়ে নারী হিসেবে তো নয়ই এমনকি মানুষ হিসেবেও নারীকে কোনো মর্যাদা দেয় নি বর্তমান সভ্যতা।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

নারীর উপর আরোপিত সকল অব্যবস্থা এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে ইসলাম সবার আগে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষনা করে। নারীকে মানুষের মর্যাদায় এবং পুরুষের সমান অধিকার দিয়ে ইসলাম তাকে সম্মানিত করে। "ইসলামের বিপ্লব মানবতাকে রক্ষা করেছে। মানবিক উন্নয়নে ইতিহাসের আবশ্যক উপাদান ছিলো ইসলাম।[৩] জীবনের সকল দিক ও বিভাগে প্রাপ্য প্রকৃত মর্যাদা ও যথাযথ অধিকার দিয়ে ইসলাম নারী জন্মকে স্বার্থক ও মর্যাদাকর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রসঙ্গে যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সে প্রেক্ষিতে যদি বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে ইসলাম নারীকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে তা আলোচনা করলেই ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

১। মানুষ হিসেবে নারী: সৃষ্টিগত মানবিক সত্ত্বা হিসেবে ইসলাম নারীতে-পুরুষে কোনো তফাৎ করে নি। কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি সে ব্যক্তি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন হতে ছড়িয়ে দেন অসংখ্য নর ও নারী।[৪]

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।[১]

---

[১] বার্ষিক প্রতিবেদন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা ২০০৯, পৃ.২৫

[২] UNICEF, Progress of the Nations ibid, p.203

[3] "The revolt of Islam saved humanity. Islam was a necessary product of history an instrument of human progress. - M.N. Roy, The Historical role of Islam, London 1943, p.123

[৪] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً আল-কুর'আন, ৪: ১

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতের সাধারণ ঘোষণায় আল্লাহ সৃষ্টি হিসেবে নর-নারীর মধ্যে কোনো বিভেদ প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং এক ও অভিন্ন ঘোষণায় তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সর্বোপরি উৎসগত বিবেচনায় তাদেরকে অভিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। যা থেকে প্রমাণ হয়, মানুষ হিসেবে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না।

২। **নারী পুরুষে সাম্য:** নারী পুরুষের মর্যাদায় সমতা ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, "মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ ভালো কাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।[২] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: "এরপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের কর্মনিষ্ঠ পুরুষ বা নারীর কাজ বিফল করি না, তোমরা পরস্পর সমান।[৩]

তাদের অধিকারের সরল সাম্য ঘোষণা করে মহান আল্লাহ বলেছেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ আর নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[৪] ইসলাম ছাড়া অধিকার ও মর্যাদায় নারী পুরুষের এমন সমতার কথা কেউ চিন্তাও করেনি।

৩। **কন্যা হিসেবে নারী:** ইসলাম পূর্ব যুগের সকল সভ্যতায় কন্যা সন্তান ছিলো অমঙ্গল ও দুঃখের বাহন। কোনো ব্যক্তিই স্বাভাবিক অবস্থায় কন্যা সন্তান কামনা করতো না। তারা একে অপমানকর বিষয় বিবেচনা করতো। আর ইসলাম পুত্র সন্তানের উপর কন্যা সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। মাতাপিতার কাছে কন্যার অধিকতর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি তার একটি কন্যাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সুন্দরভাবে লালন করেছে, শিক্ষিত করেছে এবং সৎপাত্রে পাত্রস্থ করেছে, কিয়ামতে সে আর আমি একত্রে থাকবো।[৫] কন্যা সন্তানকে ঘৃণা ও জীবন্ত হত্যা করার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে ইসলামে নারী জন্মকে মর্যাদাকর বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। ইসলাম ছাড়া কন্যা হিসেবে নারীকে এমন মর্যাদা আর কেউ দেয় নি। নবী (সা) ঘোষণা করেছেন, 'প্রথম সন্তান যাদের মেয়ে তারা হলো ভাগ্যবান মাতাপিতা।'[৬]

ইসলাম কখনোই কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তান থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মূল্যায়ন করেনি। বরং সন্তান হিসেবে তাদেরকে সমান আদরে লালন-পালন করাকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান বা বোন আছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায় নি এবং পুত্র সন্তানকে তার কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয় নি, সে জান্নাতী।[৭]

৪। **স্ত্রী হিসেবে নারী:** স্ত্রী হিসেবে নারীকে ইসলাম স্বামীর সমান মর্যাদা দিয়েছে। এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি সমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে অবশ্য পালনীয় কিছু কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। স্বামীর এ কর্তব্যগুলো হলো স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রীর এ অধিকার ও মর্যাদা নারীকে পরিবারে ও সমাজে পুরুষের সমগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিষিক্ত করে। এখানে সংক্ষেপে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মোহরানা আদায় করা: ইসলামি বিবাহরীতিতে মোহরানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত ও আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার। যে জন্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম কর্তব্য হলো মোহরানা আদায় করে দেয়া। স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা ও নিজের সামর্থ অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করবেন এবং স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আদায় করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর স্ত্রীদের মোহরানা স্বেচ্ছায় ও খুশি মনে দিয়ে দাও। তবে তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানার অংশবিশেষ তোমাদের জন্যে ছেড়ে দেয় তা

---

[১] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا আল-কুর'আন, ৪৯: ১৩

[২] مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আল-কুর'আন, সূরা নাহল: ৯৭

[৩] فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى আল-কুর'আন, ৩: ১৯৫

[৪] لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ আল-কুর'আন, ৪:৩২

[৫] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

Dhaka University Institutional Repository

হলে তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।[১] কিন্তু স্বামীর মোহরানা আদায়ের তীব্র ইচ্ছা থাকতে হবে। মোহরানা আদায়ের ইচ্ছা ছাড়া কেবল সামাজিকতা রক্ষার করার জন্য যদি মোহরানা ধার্য করা হয় তাহলে বিয়ে ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে।

সাধ্যমতো ব্যয় নির্বাহ করা: বিয়ে করার পর স্ত্রীর সব খরচ ও প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থ সরবরাহ করা স্বামীর কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে স্বামী নিজের সাধ্য ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদায় সমন্বয় করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "ধনী ব্যক্তি তার সম্পদ অনুসারে ব্যয় করবে। যাকে আল্লাহ সীমিত জীবিকা দিয়েছেন, সে তা থেকে সীমিত পরিমাণেই ব্যয় করবে।[২]

বাসস্থানের ব্যবস্থা করা: স্বামী যেভাবে থাকেন স্ত্রীর জন্যে সে রকম থাকার জায়গা ঠিক করে নেবেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন থাকবেন না। একত্রে অবস্থান করবেন। বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর নিরাপত্তার বিষটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেখানে বাস করো, স্ত্রীদেরকেও সেখানে বাস করতে দাও।[৩]

মর্যাদা দেয়া: স্বামী স্ত্রীকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেবেন। মনে রাখবেন স্ত্রী তার অধীনস্থ কর্মচারী, দাসী বা পরিচারিকা নন। সংসারে স্ত্রী তার সহযোগী। স্ত্রীর মর্যাদা তাই স্বামীর মর্যাদার সমান। সমাজে তার অধিকার স্বামীর অধিকারের সমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরাও তাদের ভূষণ।'[৪]

সদাচরণ করা: স্ত্রী ভালোবাসাপূর্ণ সুন্দর আচরণের হকদার। যে জন্যে স্বামীর নৈতিক এবং মানবিক দায়িত্ব স্ত্রীর সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা। আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে সংগত ও সুন্দর আচরণ করো। তাদেরকে যদি তোমরা অপছন্দ করো, তাহলে তোমরা তো অপছন্দ করবে এমন কিছু যার মধ্যে আল্লাহ সীমাহীন কল্যাণ রেখেছেন।[৫]

নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা: স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রধান কর্তব্য হলো, স্বামী নিজের নীতি নৈতিকতায় পবিত্রতা রক্ষা করবেন। ব্যভিচারিতা বা পরকীয়ার মতো কোনো ঘটনায় নিজেকে জড়িয়ে স্ত্রীর অমর্যাদা করবেন না। নিজের সুকৃতি ও সুকুমার বৃত্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাবেন, যেনো স্ত্রী তাকে ভালো মানুষ, আর্দশ চরিত্রবান মানুষ মনে করেন। কেননা, স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তার স্ত্রীর মূল্যায়ন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেসব লোকই উত্তম, যারা উত্তম তাদের স্ত্রীদের কাছে।'[৬]

গোপনীয়তা রক্ষা করা: স্বামীর কাছে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোনো কিছুই গোপন নয়। কিন্তু এর মধ্যে অনেক বিষয় রয়েছে যা প্রকাশ পেলে স্ত্রীকে অপ্রস্তুত হতে হবে বা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। স্বামীর কর্তব্য হলো দায়িত্বশীলতার সাথে এ সব গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে, স্ত্রীও তার নিকট আসে। আর সে স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়াদি প্রকাশ করে দেয়।'[৭]

অধিকারের সাম্য: সমাজে সবার ওপর, সব কিছুর ওপর স্ত্রীর দায়িত্ব পালন আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অধিকার। স্বামী স্ত্রীর এ অধিকার খর্ব করবেন না। পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তার মত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর স্বামীদের যেমন অধিকার আছে স্ত্রীর ওপর, তেমন অধিকার আছে স্ত্রীদেরও স্বামীর প্রতি।[৮]

যৌতুক না নেয়া: স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে বা স্ত্রীর অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শর্তসাপেক্ষে কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না। পূর্ব নির্ধারিণ অনুযায়ী বিয়ের শর্তে এ রকম কিছু গ্রহণ করার নাম যৌতুক। ইসলামে যৌতুক গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। এখানে বরং

---

[১] وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا আল-কুর'আন, ৪: ৪

[২] لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ আল-কুর'আন, সূরা তালাক: ৭

[৩] لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ আল-কুর'আন, সূরা তালাক: ৬

[৪] هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ আল-কুর'আন, ২: ১৮৭

[৫] وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا আল-কুর'আন, ৪: ১৯

[৬] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৭] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[৮] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ আল-কুর'আন, ২: ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের জন্যে স্বামী তার স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বিবাহ নিষিদ্ধ নারীদের ছাড়া অন্য সবাইকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এ শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের অর্থ সম্পদের বিনিময়ে কামনা করবে।'[১]

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান করা: যুক্তিযুক্ত কারণে কারো যদি একাধিক বিয়ে করতে হয়- তাহলে সে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। এ জন্যে শর্ত হলো, সব স্ত্রীদের মধ্যে অবশ্যই অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালোলাগে বিয়ে কর-দুই, তিন বা চারজন। আর যদি তোমরা ভয় করো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো।'[২] আয়াতে চারজন বিয়ের শর্তসাপেক্ষ অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান সম্ভব না হলে বিয়ে করা হালাল হবে না।

মালিকানার স্বাধীনতা দেয়া: স্বামী যেমন উত্তরাধিকার ও উপার্জনসূত্রে সম্পদের মালিক হতে পারেন, স্ত্রীরও তেমনি সম্পদের মালিক হওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর এ মালিকানার ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ না করা। আল্লাহ বলেন, পুরুষরা যা উপার্জন করে, তা তাদের জন্যে আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ।[৩]

দুর্ব্যবহার না করা: স্বামী স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না। তাকে অমানবিকভাবে প্রহার করবেন না। বরং তার সাথে সর্বোচ্চ মানবিক আচরণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তুমি স্ত্রীর মুখের ওপর আঘাত দেবে না, তাকে অশালীন গালি দেবে না এবং ঘর থেকে বের করে দেবে না।'[৪]

শাসন করা: স্ত্রী যদি ইসলামি অনুশাসন অনুসারে না চলে বা তার মধ্যে যদি আনুগত্যহীনতা কিংবা অন্যায় মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে তাহলে স্বামীর কর্তব্য হলো তাকে শাসন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা যাদের আনুগত্যহীনতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও। এরপর তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। তারপর মৃদু প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে নতুন কোনো পথ চিন্তা করো না।'[৫]

ক্ষমা করা: মানবীয় দুর্বলতার জন্যে স্ত্রী কোনো অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। তার সাথে কঠোর আচরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যদি স্ত্রীর কোনো ব্যবহারে স্বামী সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সে তার অন্য কোনো ভালো ব্যবহার মনে করে সন্তুষ্ট হবে।'[৬]

উপহার দেয়া: বিভিন্ন উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে উপহার দেবেন। উপহার দামি হওয়া শর্ত নয়। স্বামী তার সাধ্যমতো উপহার দেবেন। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর ও সুদৃঢ় হবে। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা উপহার দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।'[৭]

উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা: আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের জন্যে স্বামীদের সম্পদে উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমরা যা পরিত্যাগ করে গিয়েছো তাতে তারা পাবে এক অষ্টমাংশ।'[৮] স্বামীর কর্তব্য হলো, জীবদ্দশাতেই তিনি স্ত্রীর এ উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে যাবেন। যাতে কোনোভাবেই তাকে বঞ্চিত করা না যায়।

---

[১] وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ আল-কুর'আন, ৪: ২৪

[২] فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً আল-কুর'আন, ৪: ৩

[৩] لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ আল-কুর'আন, ৪: ৩২

[৪] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[৫] وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا আল-কুর'আন, ৪: ৩৪

[৬] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[৭] প্রাগুক্ত

[৮] وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم আল-কুর'আন, ৪: ১২

Dhaka University Institutional Repository

তালাকের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা: স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবনযাপন করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করেন, তাহলে স্ত্রীর অধিকার আছে – তিনি নিজ উদ্যোগে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেন। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর এ অধিকার ক্ষুণ্ন না করা। আল্লাহ বলেন, 'তাই তোমাদের যদি ভয় হয় যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না, আর স্ত্রী যদি কোনো কিছুর বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে নিস্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই।'[১]

এভাবে স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীকে দায়িত্বশীল করে ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সকল দিক থেকে একটি বিষয় প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছে যে, স্ত্রী চাকর বা দাসী নয়। সে স্বামীর সহযোগী ও বন্ধু।

৫। মা হিসেবে: ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মান দিয়েছে। যেমন:-

মায়ের অবস্থান আল্লাহর পরেই: আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমার রব আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদাচারণ করবে।'[২] আল্লাহর এ নির্দেশ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, মানুষ প্রথমে আল্লাহর নির্ধারিত ও আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করবে। তারপর মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে।

সদাচরণ করা: সন্তানের সদাচরণের প্রথম ও প্রধান হকদার মা। তার সাথে সন্তান সঙ্গত ও সুন্দর আচরণ করবে। মায়ের সাথে সদাচরণ করাকে আল্লাহ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন। বলা হচ্ছে, "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছু অংশীদার করো না এবং মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করো।'[৩] তাই সন্তান মায়ের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করবে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা: মানবসন্তানের পার্থিব জীবনে মায়ের ভূমিকাই মুখ্য। পিতা সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, ব্যয় নির্বাহ করেন। সীমাহীন কষ্ট সয়ে মা তাকে গর্ভেধারণ করেন, প্রসব করেন, দুগ্ধ পান করান। পরম মমতায় লালনপালন করেন। এ সব কারণে সন্তানের কর্তব্য হলো মায়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আল্লাহ বলেছেন, "মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভেধারণ করেছেন এবং তাকে দুগ্ধ পান করাতে হয় দুবছর। তাই তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'[৪]

আনুগত্য করা: মা পরম গুরুজন। বয়োজ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্তের ক্ষমতা দিয়েছে। এ জন্যে মায়ের প্রতি সন্তানের অন্যতম কর্তব্য হলো সন্তান তার প্রতি অনুগত থাকবে। তার আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। তার অবাধ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) মায়ের অনুগত থাকাকে সব মৌলিক ইবাদতের চেয়ে উত্তম ঘোষণা করেছেন। তার অবাধ্যতাকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, 'মাতাপিতার প্রতি অনুগত থাকা সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, উমরাহ এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।'[৫] তিনি আরো বলেন, 'গুনাহসমূহের প্রতিটি থেকে যেটি আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মাতাপিতার অবাধ্যতায় গুনাহ ক্ষমা করেন না, বরং মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীতেই এর শাস্তি প্রদান করেন।'[৬]

অমুসলিম মায়ের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখা: দুর্ভাগ্যক্রমে কারো মা যদি অমুসলিম হয় তা সত্ত্বেও তার সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। সে যদি শিরক বা কুফর করার জন্য নির্দেশ দেয় বা চাপ প্রয়োগ করে, তার নির্দেশ মানা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর মাতাপিতা যদি আমার সাথে শিরক করার জন্যে তোমার ওপর চাপ দেন; যে শিরক তোমার বোধগম্য নয়, তাহলে তুমি তাদের নির্দেশের অনুগত্য করো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখো আর তুমি তাদের পথ অনুসরণ করো যারা শিরক না করে আমার প্রতি দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট রয়েছে।'[৭]

---

[১] فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ আল-কুর'আন, ২: ২২৯

[২] وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا আল-কুর'আন, ১৭: ২৩

[৩] وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا আল-কুর'আন, ৪: ৩৬

[৪] وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ আল-কুর'আন, ৩১:১৪

[৫] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ আল-কুর'আন, ৩১:১৫

Dhaka University Institutional Repository

বিনয়ী আচরণ করা: মায়ের বিপুল সম্মান ও মর্যাদার কারণে তার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা যাবে না। কথায়, আচরণে কর্কশতা-কঠোরতা প্রকাশ করা যাবে না। বরং পরম ভালোবাসা, মমতা ও শ্রদ্ধায় সন্তান তার প্রতি সম্মানজনক আচরণ করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর মাতাপিতার জন্যে বিনয়ের বাহু অবনত করে দাও।'[১] তার সাথে বিনয়হীন আচরণ চরম বেআদবী।

বার্ধক্যে বিশেষ সেবা করা: বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সঙ্গ চায়, বিশেষ সেবা চায়। শারীরিক দিকে থেকেও এ সময়ে বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন। মায়ের বার্ধক্যে সন্তান তার অধিকতর সেবা করবে। তাকে তিরস্কার করবে না। ধমক দেবে না। তার বৃদ্ধসুলভ কথাবার্তা ও দাবিতে বিরক্তি প্রকাশ করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি মাতাপিতার একজন কিংবা উভয়ে তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তাদের প্রতি তুমি বিরক্তিসূচক 'উহ' উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে তিরস্কার করো না।'[২] নবী (সা) বলেন, 'সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা), কে ধ্বংস হবে? তিনি বলেন, যে তার মাতাপিতার দুই জনের একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথচ তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।'[৩]

ব্যয়নির্বাহ করা: মা অক্ষম হলে, নিজের ব্যয়নির্বাহ ও ভরণপোষণে অসমর্থ হলে সন্তানের কর্তব্য হলো মায়ের ব্যয়নির্বাহ ও ভরণপোষনের অর্থ সরবরাহ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন (হে মুহাম্মদ স) তোমরা যে কল্যাণময় ব্যয় করবে, তা করবে মাতাপিতার জন্যে, তোমাদের নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন ও পথচারীদের জন্যে।'[৪]

সন্তুষ্ট রাখা: সন্তান তার কথায়, কাজে, লেনদেনে এবং মায়ের প্রতি তার দায়িত্বশীলতা দেখিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখবে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাকে উপহার দেবে। তার অসুবিধা দূর করা ও প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপারে আন্তরিক হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতে সুখ লাভ করা মায়ের সন্তুষ্টি লাভের ওপর নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত।'[৫] তাই মাকে খুশি রাখতে হবে।

মাকে অগ্রাধিকার দেয়া: মা সন্তানকে গর্ভেধারণ করেন, সীমাহীন কষ্ট সয়ে প্রসব করেন, দীর্ঘ দুই বছর ধরে দুগ্ধ দান করান এবং লালন পালন করেন। সন্তানের জন্যে মায়ের এ বিপুল অবদানের কারণে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে মাকে পিতার ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাদীসে এসেছে – জনৈক সাহাবা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার উত্তম আচরণের সর্বাধিক হকদার কে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার মা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর পর কে? নবী (সা) বললেন, তোমার মা। সাহাবা (রা) জিজ্ঞাস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবা বললেন, তারপর কে? রাসূল (সা) বললেন, তোমার বাবা।'[৬] কুর'আন মাজীদেও পিতার চেয়ে তুলনামূলক মায়ের অবদানেরই বেশি বর্ণনা এসেছে। সুতরাং সন্তানের কর্তব্য হলো দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাকে প্রথম বিবেচ্য করে নেয়া।

মাগফিরাত কামনা করা: মা যদি ইন্তিকাল করে তা হলে সন্তানের কর্তব্য হলো তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সন্তানদের এ দুআ শিখিয়েছেন। বলা হচ্ছে – 'আমাদের প্রভু! হিসাব নিকাশের দিন আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন আমার মাতাপিতা ও মুমিনদেরকে।' 'আর বল, আমার প্রভু, তাদের প্রতি রহম করুন। যেমন তারা শৈশবে আমার ওপর করেছেন।'[৭] তাই মাতাপিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

---

[১] আল-কুর'আন, ১৭: ২৪

[২] আল-কুর'আন, ১৭: ২৩ (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا)

[৩] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৪] আল-কুর'আন, ২: ২১৫ (مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)

[৫] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৬] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৭] আল-কুর'আন, ১৭: ২৪ (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)

Dhaka University Institutional Repository

৬। ক্ষমা ও প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে: কোনো অপরাধ করে ফেলার পর তার ক্ষমা লাভ কিংবা কোনো ভালো কাজ করার পর তার উত্তম প্রতিদান প্রদান – এর কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ নারী–পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য করেননি। নর–নারী নির্বিশেষে যে কেউ ভালো কাজ করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে বা আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে আল্লাহ তাদেরকে প্রযোজ্য প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। বলা হয়েছে, 'অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গের হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী – তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।[১] ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্মেই নারীকে এমন মর্যাদা দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়নি।

৭। অর্থনৈতিক উত্তরাধিকারে নারী: একমাত্র ইসলামই পিতা ও স্বামীসহ সকল নিকটাত্মীয়ের সম্পদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে, তা কম হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।[২] শুধু এটুকুই নয় বরং স্ত্রী, মা ও মেয়ে হিসেবে বিভিন্ন ভূমিকায় নারীর প্রাপ্যতার বিষয়টিও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৩] ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা ও মতবাদে নারীকে সম্পত্তির এমন সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার দেয়া হয় না। তা সত্ত্বেও আপত্তি উত্থাপন করা হয়, ইসলামে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ সম্পদের অধিকার দেয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, পরিবারে প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব ইসলাম ছেলেকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে মেয়ের কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একজনের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষ তাদের সম্পদ ব্যয় করে।[৪] মেয়েরা ব্যয় নির্বাহ করতে বাধ্য না হওয়ার পরও ইসলাম মোহরানা, উত্তরাধিকার প্রভৃতি উপায়ে তাদেরকে সম্পদের মালিক করেছে। এ সম্পদ শুধুই তাদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হবে।

৮। অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের অধিকার: ইসলাম নারীকে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের অধিকার দিয়েছে। কুর'আন মজীদে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলা হয়েছে, পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[৫] নারী যখন কন্যা তখন তার ভরণ–পোষণের দায়িত্ব মাতাপিতার, নারী যখন স্ত্রী তখন তার ভরণ পোষণের পুরো দায় স্বামীর। আবার নারী যখন মা তখন সন্তানের দায়িত্ব তার সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহ করা। নারী নিজে আয় করতে পারবে তা সত্ত্বেও ব্যয় করার কোনো দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে না। সে যদি ইসলামের পর্দাবিধান মেনে, স্বামী, সন্তানের হক আদায় করে চাকুরি করে এবং সে অর্থ সংসারে ব্যয় করে তাহলে সে সদকার সওয়াব পাবে।

৯। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার: ইসলাম নারীকে অন্যান্য অধিকারের পাশাপাশি স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও দিয়েছে। ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম বা মতবাদে নারীকে আর্থিক দিক থেকে এতো নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। একজন পুরুষ যখন কোনো নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তার এ বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, সে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে মোহরানা প্রদান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়ে দাও।[৬] রাসূলুল্লাহ (সা) এ ক্ষেত্রে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো নারীকে মহর প্রদানের শর্তে বিয়ে করেছে অথচ মহর আদায়ের নিয়ত তার নেই তবে সে ব্যভিচারী।[১]

---

[১] আল–কুর'আন, সূরা আহযাব: ৩৫

[২] আল–কুর'আন, ৪: ৭

[৩] আল–কুর'আন, ৪:১১–১২

[৪] আল–কুর'আন, ৪:৩৪

[৫] আল–কুর'আন, ৪: ৩২

[৬] আল–কুর'আন, ৪:৪

Dhaka University Institutional Repository

মহরের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদের একক মালিক স্ত্রী। সে এ সম্পদ তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করতে পারবে বা যে কোনো ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে সম্পদশালীও হতে পারে। এভাবে বিনিয়োগকৃত অর্থে নারী যতোই সম্পদশালী হোক না কেনো সংসারে সে এ সম্পদ খরচ করতে বাধ্য নয়। তবে সে যদি খরচ করে সেটা তার বদান্যতা এবং এ জন্য সে সওয়াব পাবে।

১০। **শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে:** নারীকে জ্ঞানের ভুবনে নিয়ে আসার একক কৃতিত্ব ইসলামের। অন্যান্য ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থায় যেখানে নারীর জ্ঞানর্জনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো ইসলামে সেখানে নারীর জন্য জ্ঞানার্জনকে ফরয করা হয়েছে। কুর'আন মাজীদে নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহর আদেশ হলো – ' পড়, তোমার প্রভুর নামে; যিনি সৃষ্টি করেছেন।'[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন – 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয।'[৩]

১১। **ধর্মীয় ক্ষেত্রে:** ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর ধর্মীয় জীবনযাপনের কোনো অধিকার ছিলো না। নারীর জন্য উপাসনালয়ে প্রবেশ করা এবং ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করা ছিলো নিষিদ্ধ। তখন ধর্মীয় বিবেচনায় নারীকে পাপ ও ধ্বংসের প্রতীক মনে করা হতো। ইসলাম পুরুষের মতোই নারীকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। পুরুষের মতোই ধর্মানুশীলন করে মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলেছেন, 'আর যে সৎকাজ করে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, সে যদি মুমিন হয় তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

১২। **বৈবাহিক ক্ষেত্রে:** ইসলামপূর্ব যুগে নারী স্বেচ্ছায় বিয়ে করার অধিকার রাখতো না। বিয়ে করা, বিচ্ছেদ ঘটানো বা বিয়ে দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার ছিলো পুরুষের। এ ক্ষেত্রে নারীর মতামত যাচাই করা হতো না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীকে বিয়ে করারই প্রয়োজনবোধ করতো না বরং নির্বিচারে ভোগ করতো। ইসলাম এ ধারা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে। স্বামী নির্বাচন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ করার অধিকার একমাত্র ইসলামই নারীর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহানবী (সা) বলেছেন, 'প্রাপ্তবয়স্ক নারী নিজের ওপর তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি হকদার।'

অন্যত্র বলেছেন, 'অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে দেবে না।'[৪] তিনি এটাও বলেছেন যে পূর্বে বিয়ে হওয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যদি তার বিয়ে ভেঙে দিতে চায় তাহলে তা দোষের হবে না।[৫]

১৩। **তালাকের ক্ষেত্রে:** ইসলাম শুধু নারীকে স্বামী নির্বাচনের অধিকারই দেয় নি বরং প্রয়োজনে তালাক দেয়ার অধিকারও দিয়েছে। অবশ্য তালাক প্রক্রিয়াটিকে ইসলাম কখনোই উৎসাহিত করে নি বরং সর্বোতভাবে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হালাল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট দুটি কাজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এর একটি ভিক্ষাবৃত্তি এবং অন্যটি হলো তালাক।' যদি স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা কোনোক্রমেই সম্ভব না হয়, তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদই যদি একমাত্র সমাধান হয় সে ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী যে কারো পক্ষ থেকে তা হতে পারে। স্বামীরা তালাক দিলে স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে যা দিয়েছে তার কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। আর স্ত্রীরা তালাক দিলে তারা এর বিনিময়ে কিছু প্রদান করবে। সাবিত বিন কায়িস (রা) এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন –'হে আল্লাহর রাসূল! দীন ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাবিত আমার প্রতিবন্ধক। আমি তার অবাধ্যতার আশংকা করছি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – মোহরানা হিসেবে দেয়া তার বাগান কি তাকে ফেরত দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বাগান ফেরত দেয়ার শর্তে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বিয়ে ভেঙে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৬]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[২] আল-কুর'আন, সূরা আলাক:১

[৩] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক

Dhaka University Institutional Repository

১৪। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রেঃ পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ নিরসনে এবং যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নারীরা গঠনমূলক পরামর্শ দেয়ার অধিকার রাখে। ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। হুদায়বিয়া সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের চুল চেঁছে ফেলা বা ছেটে ফেলার এবং পশু কুরবানী করার আদেশ দেন। কিন্তু অবস্থা, পারিপার্শিকতা, মানসিক বৈকল্য, সন্ধির বাহ্যিক শর্তসমূহ সর্বোপরি হজ না করতে পারায় বেদনায় তারা এতোটাই মুহ্যমান ছিলেন যে, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কেউ এগিয়ে এলেন না। তখন মহানবী (সা) বিষয়টি নিয়ে উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমা (রা)এর সাথে পরামর্শ করেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারে নিজে চুল চেঁছে ফেলেন ও পশু কুরবানী করেন। তিনি চুল চেঁছে ফেলা ও পশু কুরবানী করার পর অন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করে।[১]

তাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়ার অধিকার নারীর আছে এবং ইসলামই তার এ অধিকার বাস্তবায়ন করেছে।

১৫। সামরিক ক্ষেত্রেঃ সাধারণভাবে ইসলাম নারীর দৈহিক প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে নারীকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয় নি। কেননা একজন পুরুষ বন্দী হলে তাকে হত্যা করা যায়, আরো অনেক নির্যাতন চালানো চায় কিন্তু নারী বন্দী হলে তাকে না হত্যা করেও বারবার হত্যা করা সম্ভব। তবে জরুরি অবস্থায় নারীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। রুবাই বিনতি মুআব্বি (রা) বলেছেন, 'আমরা মেয়েরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে যুদ্ধে গমন করেছি। আমরা সেখানে লোকদের পানি পান করানো, খিদমত ও সেবা শুশ্রূষা করেছি এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসার কাজ করেছি।[২]

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য মতবাদে নারী সৈনিক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এটা নারীর প্রতি সম্মান নয় বরং অসম্মান। কেননা পুরুষ ক্ষমতাবান থাকা সত্ত্বেও নারীকে এমন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়।

১৬। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীঃ পুরুষের মতোই ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা রয়েছে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, পরামর্শ দেয়া, প্রতিবাদ জানানো, কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য সংগঠিত হওয়া ইত্যাদি সকল ধরনের কাজ করার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়ে থাকে। ইসলামের মূলনীতি হলো, মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানে, কর্মে, দক্ষতায়, নীতি, দর্শন ও শৃঙ্খলায় যিনি সর্বোত্তম হবেন তিনিই হবেন নেতা। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম ব্যক্তি নির্ধারণের যোগ্যতা বা গুণ হিসেবে নারী বা পুরুষ হওয়ার কথা বলেন নি। বরং জ্ঞানে ও কর্মে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথাই বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিস প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[৩]

আল-কুর'আনে ঘোষিত এমন অসংখ্য আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণী ও কার্যাবলিতে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়নি। এমনিভাবে শূরা বা পারস্পারিক পরামর্শ ও উলিল আমর বা নেতৃত্বশীল ব্যক্তি সম্পর্কেও কুর'আনের আয়াতসমূহে সাধারণ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন কোনো ব্যক্তি যদি বলেন যে, এ সকল আয়াত পুরুষের জন্য নাযিল হয়েছে তাহলে তাকে এটাও বলতে হবে যে – সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, ইহসান, আদল প্রভৃতি হুকুম আহকামও শুধু পুরুষের জন্য নাযিল হয়েছে। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়। কেননা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সালাত-সাওমের সকল হুকুম সমানভাবে নর-নারীর জন্য নাযিল হয়েছে। তাই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করার কোনো যুক্তি নেই।

হাদীসেও এ ধারণার পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবন রাফি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে লোকদের সমবেত হওয়ার জন্য 'ইয়া আইয়্যুহান্নাস' বা 'হে মানবমণ্ডলি' বলে সম্বোধন করতেন

---

[১] প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ

[২] প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ আল-কুর'আন, সূরা মুজাদালা:১১

Dhaka University Institutional Repository

তখন উম্মু সালমা (রা) সে সফল সমাবেশে অংশ গ্রহণ করতেন। লোকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তিনি জবাবে বলতেন, আমিও মানবমণ্ডলির অন্তর্ভূক্ত। কেননা এখানে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।[১]

আবি বাকরা বলেন, উটের যুদ্ধের সময় আল্লাহ আমাকে মহানবী (সা) এর একটি হাদীসের মাধ্যমে উপকৃত করেছেন। তা হলো, মহানবী (সা) যখন শুনতে পেলেন যে, পারসিকরা খো করজের কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে তখন তিনি বলেছিলেন, যে জাতি একজন নারীকে ক্ষমতায় বসায় সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না।[২] অথচ ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আবি বাকরা (রা) উটের যুদ্ধে আয়শা (রা) এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এ কথাও বলেন, তিনি যুদ্ধের পরও আলী (রা)এর শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং আত্মগোপন করেন। আবি বাকরা বর্ণিত হাদীসটিকে সঠিক বলে ধরে নিলে তার অর্থ দাঁড়ায় একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী মহানবী (সা) এর বরাত দিয়ে বলেছেন যে, ইসলাম নারীর নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে এবং তা সত্ত্বেও তিনি একজন নারীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত সে নারীর প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এ সুস্পষ্ট বৈপরীত্বের ঘটনা আবি বাকরা (রা) এর মতো সাহাবীর পক্ষে ঘটা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ আবি বাকরা বর্ণিত হাদীসটি যেমন সত্য তেমনি তিনি যে আয়শা (রা) এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন তাও সত্য। তাঁর বর্ণিত হাদীসটি সত্য এ কারণে যে, নারী যদি স্বৈরাচারী শাসনকাজ পরিচালনা করেন তবে অবশ্যই তার নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কারণ পারস্য রাজের কন্যা রানী বিলকিস ইসলাম গ্রহণের পূর্বে স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনা করতেন বলেই তাঁর সম্পর্কে নবী (সা) উক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন।

আশরাফ আলী থানবী (র) এ সম্পর্কে বলেছেন, হাদীসটি নারীকর্তৃক পরিচালিত স্বৈরাচারী শাসন সম্পর্কিত, পরামর্শভিত্তিক শাসনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। ইসলাম গ্রহণের পর বিলকিস তার সাবা এলাকার উপর শাসনভার পরিত্যাগ করেছেন এমন কোনো উক্তি কুর'আনে কোথাও পাওয়া যায় নি। রানী বিলকিস মুশরিকী জিন্দেগী পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি পরামর্শের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী খিলাফতের শাসন পরিচালনা করেন। বিলকিস তার শাসন পদ্ধতির বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে, 'রানী বিলকিস বললো, হে পরিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করি না।[৩] এমন বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বিলকিসের মতো ক্ষেত্রে যখন একজন নারী ইসলাম অনুমোদিত পরামর্শ সভা কিংবা আইন সভার সাহায্যে শাসনকাজ পরিচালনা করে তখন তেমন অবস্থায় নারী নেতৃত্ব অনুমোদন না করার কোনো শক্তিশালী যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে বাস্তবতা হলো, নারীর শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার এ অধিকার বাস্তবায়ন করা কঠিন। কেননা বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন জনপ্রতিনিধিকে দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। জনপ্রতিনিধি নারী হলে তার পরিবার ও সন্তানের কল্যাণে তিনি ভূমিকা রাখতে পারবেন না। দলীয় বিরোধ ও বিতর্ক তার পারিবারিক সংহতি ও ঐক্যের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে। জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্বটি এমন যে, তাতে অবকাশ বা ছুটি কাটানোর কোনো সুযোগ থাকে না। অথচ মানবিক দায়িত্ব পালনের জন্যই নারী মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না আবার মাতৃত্বকালীন সময়ে তার পক্ষে কোনোক্রমেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে না। ফলে তাকে কোনো একটিতে ছাড় অবশ্যই দিতে হবে। এবং তা অবশ্যই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। পরিণামে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হবে বা স্বাভাবিক কাজের ধারা ব্যাহত হবে। চূড়ান্ত বিবেচনায় যা জাতীয় উন্নতির পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হিসেবে চিহ্নিত হবে। মূলত এ জাতীয় বাস্তব সমস্যা থাকার কারণেই যোগ্যতা থাকার পরও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সেনাবাহিনীর সদস্য, বিচারপতি ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যকালীন সময়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ রাখা হয়। এতে তাদের সম্মান যেমন কমে না তেমনি এর

---

[১] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ইমারাহ

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল 'ইতিসাম

[৩] قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ আল-কুর'আন, সূরা নামল: ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে তাদের মনুষ্যত্বকে অসম্মান বা হেয়ও করা হয় না। তাই সুযোগ থাকার পরও প্রাসঙ্গিক দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার কারণে নারীদেরকে নেতৃত্বে বরণ না করাই ইসলামের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নারীর নবী হিসেবে আগমণ না করাও এ বিষয়টিই সমর্থন করে।

বস্তুত ইসলাম নারী জাতিকে এতই মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে যে, আল-কুর'আনে সুরা 'নিসা ও মারয়্যাম' নামে দু'খানা সুরার নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু আজকের নারী সমাজ ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা ভুলে গিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের নামে নিজেদেরকে বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। সুতরাং জীবনের সকলক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃত নারী মুক্তি তথা নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই বলবো যে, "Islam was probably the greatest champion of women's rights the world has ever seen.[১]

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামি বিধানের ভূমিকা

বাংলাদেশে পরিবারে ও সমাজে নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়। কন্যা হয়ে জন্মানোর অপরাধে তাকে মা-বাবা ও অন্যান্যদের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়। ছেলে সন্তানের চেয়ে সকল ক্ষেত্রে সে কম সুবিধা ও অধিকার পায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও তার কোনো মতামত নেয়া হয় না। বিয়ের পর স্বামী ও তার আত্মীয়দের যৌতুক দাবি এবং সে কারণে নির্যাতন কিংবা এমনিতেই মৌখিক শারীরিক ও মানসিক লাঞ্ছনা নারীকে দুঃসহ জীবনে ঠেলে দেয়। আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, মানুষ হিসেবে সমান অধিকার ও মর্যাদা না দেয়া, নারীরা পাপের কারণ বলে অবহেলা ও উপেক্ষা করা, ব্যভিচারে বাধ্য করা, ধর্ষণ, হত্যা, অকারণে তালাক দেয়া, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অসমশ্রমে বাধ্য করা, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা ধর্ম ও শিক্ষা চর্চা থেকে দূরে রাখা, নাচ, গান, বিজ্ঞাপন, নাটক এবং চলচ্চিত্রে নারীদেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার, বিবাহপূর্ব প্রেম এবং শিক্ষা চাকুরি ও জীবনে অবাধ নারী সম্ভোগের ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি পদ্ধতিতে নারী নির্যাতনের শিকার হয়। ইসলামের বিধান অনুসারে নির্যাতনের এ সকল ক্ষেত্র থেকে নারীকে কীভাবে রক্ষা করা যায় কুর'আন-হাদীসে তার বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

১। দৃষ্টি শক্তি নিয়ন্ত্রণ: কোনো নারীর প্রতি কোনো পুরুষ ইচ্ছা করে তাকিয়ে থাকতে পারবে না। বরং দৃষ্টি সংযত করবে। নারীও কোনো পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। অনিচ্ছায় হঠাৎ করে চোখ পড়ে গেলও সাথে তা ফিরিয়ে নেবে। কেননা কামনা সৃষ্টি হওয়া বা লোভ জন্ম নেয়ার শুরু চোখের দেখা থেকেই হয়। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে। মুমিন নারীদের বলো তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।'[২]

২। সৌন্দর্য প্রকাশ না করা: সৃষ্টিগতভাবেই নারীদেহের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর জৈবিক আগ্রহ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় একে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও পুরুষ বা নারীদেহের উত্তেজক প্রদর্শনী এমনকি সাধারণ প্রকাশও বিপরীত লিঙ্গকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। ফলে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। সে কারণে সে অপর পুরুষকে নিজের রূপ সৌন্দর্য দেখা যাবে না। অপর পুরুষের মন বা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন পোশাক পরবে না। অলংকার ব প্রসাধনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে পরের সামনে উপস্থাপন করবে না। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন নারীরা সাধারণভাবে যা প্রকাশ পায় তাছাড়া যেনো তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো তারা মাথায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্যেশ্যে তারা যেনো সজোরে পদক্ষেপ না করে।'[৩]

৩। অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ না করা: মুমিন নর-নারী কেউ কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করবে না। কেননা এতে লজ্জাস্থানের হিফাযত অসম্ভব হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অপর কারো ঘরে প্রবেশ করো

---

[১] Dr. H. Korimov Andrey, Women Rights in Islam, London, 2003, p.234

[২] আল-কুর'আন, ২৪: ৩০-৩১

[৩] আল-কুর'আন, ২৪: ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

না যতোক্ষণ না ঘরের লোকদের অনুমতি নাও ও তাদের সালাম জানাও। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও তাহলেও প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় "ফিরে যাও" তাহলে ফিরে যাবে।'[১]

৪। **ভালো ধারণা রাখা:** মুমিন নরনারী পরস্পরের পবিত্রতার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। কেউ কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে তাকে মানসিক নির্যাতনের শিকার বানাবে না। আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা অপবাদ সম্পর্কে শুনলো তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলো না কেনো?"[২]

৫। **অশ্লীলতা প্রসারের সকল পথ বন্ধ রাখা:** মুসলিম সমাজে অশ্লীল অশোভন কোনো বিষয়ের স্থান নেই। সমাজে অশ্লীলতা প্রসার পেলে নারীর মর্যাদা নষ্ট হয়। তার সম্মান বিনষ্টের সমূহ সম্ভাবনা গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাই শুধু অশ্লীল আচরণ নয় বরং অশ্লীল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলা ও হারাম করেছেন। বলেছেন – 'নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।'[৩]

৬। **মিথ্যা অপবাদ দান শাস্তিযোগ্য অপরাধ:** সৎ চরিত্রবান পবিত্র নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ উথাপন করলে নারী নিদারুণ মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নারীকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা একে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন – 'যারা সতি ও পবিত্রচরিত্রবতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনোই কবুল করবে না।'[৪]

৭। **ধর্ষণ অপরাধের শাস্তি:** নারী পুরুষ উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুললে এবং তা চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ হলে তাদেরকে একশত কষাঘাত করা হবে।[৫] যদি তারা বিবাহিত হয় তাহলে তাদেরকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হবে।[৬] কিন্তু অপরাধটি যদি নারীর অমতে হয়, তাকে যদি এ কাজে বাধ্য করা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে নারীর অসহায়ত্ব ও অমত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাহলে এ জন্যে নারী কোনো শাস্তি পাবেন না। বরং এজন্যে ধর্ষক পুরুষই শাস্তি পরবে। সে অবিবাহিত হলে তাকে একশত কষাঘাত করা হবে। সে বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। এক্ষেত্রে নারীর অব্যাহতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আর যে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে তাহলে তাদের জবরদস্তির পর আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৭]

৮। **লিআনের বিধান:** স্বামী যেনো ব্যভিচারিতার মিথ্যা অভিযোগ তুলে স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে না পারে সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা লিআনের বিধান দিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যভিচারের অভিযোগ তুলতে স্বামীকে চারবার আল্লাহর নামের কসম করে বলতে হয় – তার স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অভিযোগ উথাপনের ব্যাপারে সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে শপথ করে বলতে হয় – 'যদি সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লানত।'[৮] অভিযোগ উথাপনের পর স্বামী যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৯। **ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকা:** ব্যভিচারের শাস্তির বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন – "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আনো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে নারীদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে

---

[১] আল-কুর'আন, ২৪: ২৭ - ২৮

[২] আল-কুর'আন, ২৪: ১২

[৩] আল-কুর'আন, ২৪: ১৯

[৪] আল-কুর'আন, ২৪: ৪

[৫] আল-কুর'আন, ২৪: (اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

[৬] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৭] আল-কুর'আন, ২৪: ৩৩

[৮] আল-কুর'আন, ২৪: ৬-৯

Dhaka University Institutional Repository

দেন। তোমাদের যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। এরপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তাহলে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু।[১]

এ আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্যে ঘরে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়কে কষ্ট প্রদান করার কথা উল্লেখিত হয়েছে, এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধানই সর্বশেষ নয়, বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। সূরা নূরে আল্লাহ তা'আলা সেই অন্য বিধান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন – "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে কষাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[২] অর্থাৎ শাস্তিটি গোপনে দেয়া যাবে না। দিতে হবে প্রকাশ্যে। বলা বাহুল্য সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনো রূপ বিবরণ ও বিশেষায়ণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশত কষাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এ শাস্তি কোনো ধরনের পুরুষ ও নারীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার সুনির্ধারিত ব্যাখ্যা দেন নি। কিন্তু তাঁর পরোক্ষ নির্দেশ ও নির্দেশনায় রাসূলুল্লাহ (সা) এ শাস্তির প্রয়োগগত দিক বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করো। আল্লাহ ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্যে সূরা নিসার প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বিবৃত করেছেন। তা হচ্ছে অবিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কষাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন আর বিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কষাঘাত ও পাথরের আঘাতে হত্যা।[৩]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা ও যায়দ বিন খালিদ যুহানী (রা) এর বর্ণনা থেকে বিষয়টি জোড়ালোভাবে প্রমাণ হয়। তাঁরা বর্ণনা করেন, জনৈক বিবাহিতা মহিলা তার অবিবাহিত চাকরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হন। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো"। তারপর তিনি আদেশ দিলেন ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশত কষাঘাত করো"। তিনি বিবাহিত মাহিলাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করার জন্য উনায়স (রা) কে আদেশ দিলেন। উনায়স (রা) নিজে মহিলার স্বীকারোক্তি নিলেন। তারপর তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করলেন"।[৪]

এ হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা) বিবাহিত ও অবিবাহিতকে ভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়েছেন এবং দুটো শাস্তিকেই আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো যদিও কুর'আনে প্রস্তারাঘাতে হত্যার বিধান দেয়া হয়নি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এ ফায়সালা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই পেয়েছেন।

ব্যভিচার যেমন জঘন্যতম অপরাধ তেমনি এর শাস্তিও কঠিন। কিন্তু এ শাস্তি সহজেই প্রয়োগ করা যাবে না। এজন্যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষের সাক্ষী প্রয়োজন। সাক্ষী প্রমাণে ব্যভিচার প্রমাণিত হলে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো দয়া প্রদর্শন করা যাবে না। আবার কষাঘাতের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এতোটা কাঠিন্যও অবলম্বন করা যাবে না যাতে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয় বা তার জীবন সংশয় ঘটে।

১০। নারীরিক নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যবস্থা: নারীদেরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হলে বা নির্যাতন করা হলে তার প্রতিবিধানে ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারীর শ্লীলতাহানির জন্য নির্যাতন হলে সংশ্লিষ্ট পুরুষ ব্যভিচারের শাস্তিতে দণ্ডিত হবে। কারণ তার লক্ষ্য ছিলো ব্যভিচার। যে কোনো কারণেই হোক সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর্থিক বা

---

[১] আল-কুর'আন, ৪: ১৫-১৬

[২] আল-কুর'আন, ২৪: ২

[৩] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ, সুনানে নাসাঈ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

Dhaka University Institutional Repository

অন্য কোনো বৈষয়িক কারণে নারীকে শারীরিকভাবে আঘাত করে নির্যাতন করা হলে ইসলামি আদালত কিসাসের বিধান অনুসারে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবে। যতোটুকু নির্যাতন নারীকে করা হয়েছে বা যেভাবে তাকে আহত করা হয়েছে কিংবা আঘাত করা হয়েছে, নির্যাতনকারীকেও ঠিক ততোটুকু পরিমাণ আঘাত করতে হবে। কুর'আন মজীদে এ জাতীয় শাস্তির উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "আমি তাদের জন্য তাওরাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমান যখম। এরপর কেউ যদি তা ক্ষমা করে তাহলে ক্ষমাকারীর পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম।[১]

তাই শারীরিকভাবে নারী যতোটুকু নির্যাতিত হবে, ইসলামি আইনের আলোকে ততোটুকু নির্যাতন নির্যাতনকারীর উপর চালানো যাবে। অবশ্য নারী নিজে এই কাজ করবেন না। ইসলামি আদালত নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শাস্তি দানের ব্যবস্থা করবে। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের সাথে সাথে যদি তাকে অসম্মান করার জন্য অশালীন কোনো কাজ করা হয় বা কোনো কথা বলা হয়, অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে বিচারক সে জন্যও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধে ব্যবস্থা: এসিড নিক্ষেপ ভয়ানক কাপুরুষতা এবং অমানবিক বর্বরতা। বাংলাদেশে এটি কী ভীতিকর অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে তা ইতোপূর্বে বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এসিড নিক্ষেপের ব্যাপারে কিসাসের শাস্তিইই কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ যে এসিড নিক্ষেপ করবে, তাকেও এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়া হবে, ততোটুকু, যতোটুক সে করেছে। এর পাশাপাশি এসিড নিক্ষেপের সাথে সাথে সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্ত্রাসীর জন্য ইসলাম যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে এসিড নিক্ষেপকারীর উপর সে শাস্তিও কার্যকর করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো – তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[২] ইসলামের শাস্তিবিধান অনুসারে এসকল শাস্তি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো মমতা বা দয়া দেখানো যাবে না। তাহলে মূলত অপরাধী আরো অপরাধ করার উৎসাহ পাবে। শাস্তি যদি জনসমাবেশে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হয় তাহলে নতুন করে কেউ আর একই অপরাধ করতে সাহসী হবে না। শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই নীতি ও পদ্ধতি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[৩]

এমন কঠোর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হলে এসিড নিক্ষেপ থেকে নারীকে সহজেই রক্ষা করা যাবে।

১২। উত্যক্তকরণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা: পথে-প্রান্তরে নারী নানা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হন। বখাটে এবং ভদ্রবেশী বিভিন্ন বয়সের পুরুষরা তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। অশ্লীল কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, শীষ বাজিয়ে, স্বাভাবিক পথচলা ব্যাহত করে, নানা কুপ্রস্তাব দিয়ে প্রভৃতি রকমারি পদ্ধতিতে নারীকে উত্যক্ত করা হয়। বলা বা লেখায় নারীর প্রতি উত্যক্তকরণের ক্ষতিকর প্রভাব বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। বরং সংশ্লিষ্ট নারীই এই বিড়ম্বনার অন্তহীন কষ্টের কথা বলতে পারেন। যে কারণে আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে উত্যক্তকরণের শিকার নারীকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে দেখি। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো, উত্যক্তকরণের কারণে নারী যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট উত্যক্তকারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

---

১ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ আল-কুর'আন, ৫: ৪৫

২ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল-কুর'আন, ৫: ৩৩

৩ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ আল-কুর'আন, ২৪: ২

Dhaka University Institutional Repository

কারণ প্রত্যক্ষভাবে হত্যায় অংশ না নিলেও সেই মূলত হত্যাকারী। তাকে ইসলাম নির্ধারিত হত্যায় শাস্তিই দেয়া হবে। আর যদি উত্যক্তকৃত নারী আত্মহননের পথ বেছে না নেয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় এবং অশালীন কার্যকলাপ সৃষ্টির দায়ে উত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দণ্ডবিধান কার্যকর করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো – তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১]

১৩। যৌতুক প্রতিরোধে ব্যবস্থা: বাংলাদেশে যৌতুক এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিবাহরীতিতে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে যে পণপ্রথার ব্যবস্থা রয়েছে তাই যৌতুক হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু ধর্মমতে পিতা-মাতার সম্পদে নারীর কোনো অংশ নেই বলে বিবাহের সময় স্বামী পক্ষ যথাসম্ভব বেশি বেশি অর্থ ও উপহার পণ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিবাহের আগে দর কষাকষির মাধ্যমে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইসলামে এমন বিধান নেই। ইসলামে বরং বিবাহের জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহরনা আদায় করতে হয়। যৌতুক তাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ইসলাম বিরুদ্ধ প্রথা। মুসলিমদের এ প্রথায় অভ্যস্থ হওয়ায় অর্থ হলো ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া। ইসলামি আদালাত ইসলামি বিধানের বিরুদ্ধাচারণের জন্য যারা যৌতুক দাবি করবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থা অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারীরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যেহেতু এ দেশের পুরুষরা ইসলামের বিধি-বিধান সত্যিকারার্থে অনুশীলন করে না, তাদের নীতি-নৈতিকতা ইসলামি আদর্শে গড়ে উঠেনি, সে কারণে মানসিক দিক দিয়ে তারা অধিকাংশই মন্দ। অধিকাংশই নারীকে মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে ভোগের সামগ্রি হিসেবে দেখতেই পছন্দ করে। আখিরাতের ভয় না থাকায় নারীর সাথে যে কোনো অন্যায় করার ক্ষেত্রে তাদের এতটুকু দ্বিধা হয় না। সে কারণে যে সকল নারীর ক্ষমতা আছে তারা ব্যক্তি পর্যায় থেকে জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, সন্তানদের ইসলামের নৈতিকতা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, নিজেরা ইসলামের শালীনতার বিধান মেনে চলতে পারেন। তাহলে আশা করা যায়, অনেক বিব্রতকর অবস্থা থেকে তারা এমনিতেই রক্ষা পাবেন। বাংলাদেশে অনেকেই ফ্যাশন করে পর্দা করার নামে বোরখা পরেন। অনেকেই পর্দার জন্য বোরখা পরতে বাধ্য হন পারিবারিক কারণে। মনে রাখা প্রয়োজন, পর্দা কেবল নারীর জন্য ফরয নয়, পুরুষের জন্যও সমানভাবে ফরয। আর বোরখা পরলেই পর্দা করা হয় না। এটা পর্দার একটা মাধ্যম মাত্র। তা সত্ত্বেও এই বাংলাদেশে যতোজন নারী এসিডে ঝলসিত হয়েছে তাদের কেউ-ই পর্দানশীল বা বোরখা পরিহিতা নারী নন। এ থেকে এটাও প্রমাণ হয়, এ সকল নারীদের অনেকেই আন্তরিকভাবে পর্দাবিধান না মেনে চললেও কেবল বোরখা পরার কারণে যেখানে অনেকখানি নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছেন, সেখানে তারা যদি ইসলামের সকল বিধান মেনে চলেন, তাহলে তারা যে নির্যাতন থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাবেন, তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সাথে সাথে সমাজের পুরুষগণ যদি ইসলামের বিধান মেনে নারীর অধিকার আদায় এবং নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এগিয়ে আসেন, তাহলে আলাদা করে নারী দিবস ঘোষণা করার প্রয়োজন হবে না। বরং প্রতিদিনই নারীর সম্মান ও অধিকার যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। এই বাংলাদেশে একজন নারীও আর নির্যাতনের শিকার হবেন না।

---

[১] إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল-কুরআন, ৫: ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

জনসংখ্যা সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা সমস্যা

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যা অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে প্রায় সকল সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সমস্যাগুলোর মধ্যে এটি শীর্ষস্থানেই ছিলো। বাংলাদেশের জনগণ সমস্যা না-কি সম্পদ তা নিয়ে এখন আর কোনো বিতর্ক নেই। বাংলাদেশের জনগণের বেশিরভাগ যেখানে অদক্ষ, অশিক্ষিত, উদ্যমহীন, কর্মবিমুখ এবং অলস সেখানে তারা কেবল বাংলাদেশে নয় বরং পৃথিবীর যে কোনো দেশের জন্যই সমস্যা হতে বাধ্য। স্বাধীনতার চার দশকে বাংলাদেশ অনেক কিছু অর্জন করলেও এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি ধারাবাহিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে। সঠিকভাবে সমস্যাটি বিশ্লেষণ এবং মানুষের সামনে তা উপস্থাপন করতে না পারার কারণে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দেশটির জন্য কেনো সমস্যা এবং সে সমস্যা উত্তরণে ইসলামি বিধান অনুসারে কী পরিকল্পনা গ্রহণ যায়, কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক, কীভাবে সমস্যাকে সম্পদে পরিণত করা যায় এ অধ্যায়ে সে কর্মকৌশল ও নীতি উদ্ভাবনের প্রয়াস পরিচালিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

সাধারণভাবে জনসংখ্যা বলতে মানুষের পরিমাণ বুঝায়। তবে পরিভাষায় মানুষের যে কোনো পরিমাণকে জনসংখ্যা বলে না। বরং জনসংখ্যা হলো এমন জনগণ যারা কোনো নির্দিষ্ট এলাকা, শহর বা দেশে বসবাস করে।[১] all the people who live in a particular area, city or country, the total number of people who live there.[২] যখন কোনো দেশের জনসংখ্যা প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় কম বা বেশি হয় এবং তা জাতীয় কল্যাণ ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে তখন তা সমস্যায় পরিণত হয়। বাংলাদেশ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট একটি দেশ। প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়, শিল্প বা কৃষিতেও আধুনিক নয়। উৎপাদনে, উপার্জনে, বিনিয়োগ ও বণ্টনে নিতান্তই অনুন্নত একটি দেশ। এদেশে লোক সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি, যার মধ্যে ২৮% ভাগ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।[৩] যারা শিক্ষিত তাদেরও কোনো কর্মমুখী শিক্ষা নেই, যে কারণে তারা দেশের শ্রমবাজারে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও দক্ষ শ্রমিকের অভাব পূরণ করতে পারেনি। সবমিলিয়ে বাংলাদেশে যে পরিমাণ কাজ আছে সে পরিমাণ দক্ষ লোক নেই কিন্তু শিক্ষিত বেকার রয়েছে অনেক, যারা বাংলাদেশের শ্রমবাজারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ কারণেই বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পদ না হয়ে সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

আদমশুমারি ২০০১ অনুযায়ী গণনাকৃত জনসংখ্যা হলো ১২,৩৮,৫১,১২০ জন এবং সংযুক্ত জনসংখ্যা হলো ১৩,০০,২৯,৭৮৯ জন। শুমারি অনুসারে জনসংখ্যার মোট সংখ্যা ও লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যান হলো:

মোট জনসংখ্যার পরিমাণ[৪]

লিঙ্গ	আদমশুমারি ২০০১	
	গণনাকৃত	সংযুক্ত
উভয়লিঙ্গ	১২,৩৮,৫১,১২০	১৩,০০,২৯,৭৮৯
পুরুষ	৬,৩৮,৯৪,৭৪০	৬,৭১,০০,৪৯৪
মহিলা	৫,৯৯,৫৬,৩৮০	৬,২৯,২৯,২৫৫

[১] UNFPA Report 1999 (all the people who live in a particular area, city or country)

[২] Advanced learner's Dictionary, ibid, p.980

[৩] 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh, ibid, p.16

[৪] Population Census 2001, BBS, Planning Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, July 2003, p.13

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সালে এসে জনসংখ্যায় আরো অন্তত ২ কোটি নতুন সংখ্যা যুক্ত হয়েছে বলেই মনে হয়। তবে জনসংখ্যার সব ধরনের বিভাজনেই প্রমাণ হয়, বাংলাদেশে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা অধিক।

আদমশুমারি ২০০১ এর প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৩৯ জন, ১৯৯১ সালে যা ছিলো ৭২০ জন। সবচেয়ে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হলো ঢাকা, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৫৩ জন লোক বাস করে এবং সবচেয়ে কম বাস করে বরিশাল বিভাগে তাও প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬১৩ জন। শুমারি অনুসারে দেশের বিভাগভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো।

জনসংখ্যার ঘনত্ব[১]

দেশ ও বিভাগ	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে	
		১৯৯১	২০০১
বাংলাদেশ	১২,৩৮,৫১,১২০	৭২০	৮৩৯
ঢাকা বিভাগ	৩,৮৯,৮৭,১৪০	১০৫০	১২৫৩
রাজশাহী বিভাগ	৩,০০,৮৮,৭৪০	৭৫৯	৮৭২
চট্টগ্রাম বিভাগ	২,৪১,১৯,৬৬০	৬০৮	৭১৪
খুলনা বিভাগ	১,৪৬,০৪,৯০০	৫৭০	৬৫৬
সিলেট বিভাগ	৭৮,৯৬,৭২০	৫৩৭	৬২৭
বরিশাল বিভাগ	৮১,৫৩,৯৬০	৫৬১	৬১৩

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, গত দশ বছরের ব্যবধানে প্রতিটি বিভাগে এবং জাতীয় পর্যায়ে সর্বত্রই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি নির্দেশ করে, সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি প্রবণ বিভাগ হলো ঢাকা, যা জাতীয় বৃদ্ধির চেয়েও অনেক বেশি।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায়, ১৯১১ সালে পরিচালিত আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো মাত্র ০.৮৭%। এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্ন থাকার কারণ হলো উচ্চ জন্ম হারের পাশাপাশি উচ্চ মৃত্যুহার। সর্বশেষ সমাপ্ত আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে এই হার গণনাকৃত ১.৫৩% এবং সংযুক্ত ১.৫৪%। শুমারি অনুসারে দেশের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারের পরিসংখ্যানগত পরিমাণ হলো:

জনসংখ্যায় প্রবৃদ্ধির হার[২]

আদমশুমারির বছর	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার %	
	গণনাকৃত	সংযুক্ত
১৯৫১	০.০২	০.৫০
১৯৬১	১.৯০	২.২৩
১৯৭৪	২.৬২	২.৫০
১৯৮১	২.৮৩	২.৩৩
১৯৯১	১.৯৯	২.১৫
২০০১	১.৫৩	১.৫৪

[১] ibid, pp. 17, 21

[২] ibid, pp. 14

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে জন্ম হার গত তিন দশকের তুলনায় অনেকটা কমেছে। জন্ম সংখ্যা ও দম্পতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতনতা এবং জন্মনিরোধক ব্যবহারের প্রতি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু আশংকার বিষয় হলো, বাংলাদেশে শিক্ষিত, সজ্জন ও বিত্তশালী লোক – যাদের সত্যিকারার্থেই একাধিক সন্তান গ্রহণ ও সঠিকভাবে যোগ্য করে তোলার সামর্থ আছে, সরকারের পরিকল্পিত পরিবার গঠনের আহ্বানে তারা পুরোপুরি সাড়া দিয়েছে। যে কারণে অধিকাংশ শিক্ষিত ও বিত্তবান পরিবারে এখন একাধিক সন্তান খুব বেশি দেখা যায় না। অন্যদিকে যাদের সন্তান শিক্ষিত ও যোগ্য করার কোনো ক্ষমতা নেই এবং যারা নিজেরাই নিরক্ষর এই সকল দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র পরিবারে সন্তান গ্রহণের হার কিন্তু আগের মতই আছে। আগের মতই তারা অল্প বয়সে বিয়ে করছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রজনন কাজে অংশ গ্রহণ করছে। এর ফলে সমাজে শিক্ষিত ও যোগ্য লোকের সংখ্যা কমে গেলেও নিরক্ষর, অযোগ্য এবং অদক্ষ লোকদের সংখ্যা আগের মতই বেড়ে চলেছে। ফলে মোট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মোটামুটি সন্তোষজনক (১.৫৩%) অবস্থা তৈরি হলেও জনসংখ্যার গুণগত মানে ভয়ানক ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে, যা দেশের অধিকতর সর্বনাশ সাধন করতে সক্ষম।

সুতরাং প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশকে এ সমস্যা থেকে মুক্ত করতে হলে এ বিষয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের চিন্তা ও দর্শনে যে ভুল বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে তা দূর করতে হবে। এ জন্য পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ধারণা এবং জনসংখ্যা সমাধানে ইসলামের নির্দেশনা বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

পরিকল্পনার সংজ্ঞা

ইসলাম পূর্ণত একটি পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামি জীবন দর্শনে মানুষের জীবন যাপনের প্রতিটি পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণকে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। একজন মানুষ কখন বিয়ে করবে, কখন পরিবার গড়ে তুলবে, কখন লেখাপড়া করবে, কখন কাজ করবে, কখন ঘুমাবে, কখন ইবাদাত করবে, পারিবারিক জীবনে কী দায়িত্ব পালন করবে, সামাজিক জীবনে কী ভূমিকা রাখবে তার প্রতিটি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের তাগিদ ইসলাম পূর্বাহ্নে প্রদান করে। প্রকৃত মুমিনের প্রতিটি কাজ পূর্ব পরিকল্পিত হয় এবং এভাবেই সে তার সময়, শক্তি ও অর্থের অর্থহীন অপচয় রোধ করে। পরিবারের ক্ষেত্রে ইসলাম পরিকল্পনা গ্রহণকে অধিকতর আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছে। কেননা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। পরিবারের ক্ষেত্রে এটি বাস্তব ও প্রামাণ্য সত্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম পরিকল্পিত পরিবার গঠন করার কথা বলে, পরিবার গঠনে পরিকল্পনা গ্রহণকে আবশ্যক করে কিন্তু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে না। বরং এ জাতীয় জন্ম নিয়ন্ত্রণকে ইসলাম পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলাম সমর্থিত পরিকল্পনা এবং নিষিদ্ধ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে প্রায়শঃ এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। একদল পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণকে অভিন্ন মনে করে উভয়টিকেই হারাম মনে করে। অন্যদল আবার উভয়টিকেই বৈধ মনে করে। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত প্রবলতর হওয়ায় কোথাও কোথাও জন্মনিয়ন্ত্রণকে জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলাম একে নিষিদ্ধ মনে করে। ইসলাম পরিকল্পিতভাবে পরিবার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। ইসলাম পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থা এমনই যে, তাতে স্বতন্ত্রভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ প্রয়োজন হয় না। বরং সহজাতভাবে প্রকৃতিগতভাবেই পারিবারিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে পরিকল্পনা হলো চিন্তন বা উদ্ভাবন। কোনো কাজ কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত ব্যয়ে সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করা যায় পরিকল্পনা হলো তার সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। মূলত পরিকল্পনা হলো কাজ করার আগে কাজ কীভাবে করা হবে তার চিন্তা এবং অনুমান বা দৈবসাহায্যের ভিত্তিতে নয় বরং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করার একটি যুক্তিবৃত্তিজাত পদ্ধতি, সুশৃঙ্খল পন্থায় কাজ করার একটি মানসিক প্রবণতা। তাই কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্বেই যে সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থা গৃহীত হয়

Dhaka University Institutional Repository

তাকে পরিকল্পনা বলা যায়। কিংবা ভবিষ্যৎ কার্যধারার ভিত্তি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া হলো পরিকল্পনা।[১] অথবা "পরিকল্পনা হচ্ছে মৌলিকভাবে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খল উপায়ে কাজ করার একটি মানসিক পূর্বাবস্থা এবং কাজ করার পূর্বে চিন্তা ও অনুমানের পরিবর্তে তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করা।[২] এভাবেও বলা যায়, "পরিকল্পনা হলো সার্বিক অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচেতনভাবে গৃহীত প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যেমন, কী উৎপাদিত হবে, কী পরিমাণ উৎপাদিত হবে, কখন, কোথায় ও কীভাবে সেগুলো উৎপাদিত হবে এবং উৎপাদিত পণ্য কাদের মধ্যে বণ্টিত হবে।[৩]

আরো সহজভাবে বললে, পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, সেগুলো অর্জনের বিভিন্ন উপায় মূল্যায়ন এবং যথাযথ ও উপযুক্ত কার্যক্রম চয়নের প্রক্রিয়া।[৪] বস্তুত পরিকল্পনা হলো কার্যপদ্ধতি এবং কাজ শুরু করার আগেই কাজের মাধ্যমে অর্জনের জন্য পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা। এর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিকল্পসমূহ যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অবশ্য কার্যপদ্ধতি ও কর্মক্ষমতার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় না থাকলে পরিকল্পনা কেবল 'কল্পনা'য় পরিণত হয়। এ কারণে একটি আদর্শ পরিকল্পনা প্রণীত হয় কাজ করার যোগ্যতা মূল্যায়নের নিরিখে।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ অনুসারে পরিকল্পনা হলো সাধারণভাবে গৃহীত, জাতীয় বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপিত, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত, সময়-অর্থ-মানব সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচিত, কর্ম ও ফলাফল বিশ্লেষিত এবং সাধারণভাবে বাস্তবায়ন যোগ্য ব্যবস্থাপনার কর্মজাল বা কর্মবেষ্টনী।

পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো পরিকল্পনা। কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়নের আওতায় যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পড়ে, তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক উন্নয়নও এর আওতায় পড়ে। উন্নয়ন বলতে সমাজ কাঠামো, জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসহ আর্থিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, আয় বৈষম্য দূর, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে বোঝানো হয়।

অধ্যাপক Dudley Seers[৫] উন্নয়ন প্রত্যয়টি বোঝাবার জন্য দারিদ্র্য, আয় বৈষম্য এবং বেকারত্ব – এই তিনটি মৌলিক উপাদানের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, যদি এই তিনটি উপাদান কোনো দেশে উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়মুখী হয় তাহলে বুঝতে হবে, সে দেশ উন্নয়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর যদি কোনো একটি বা দুটি উপাদান অথবা তিনটিই ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাহলে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হলেও সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন হয়েছে, তা বলা যাবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উন্নয়নের জন্য যেমন প্রয়োজন সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, তেমনি প্রয়োজন আর্থিক প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবন মানোন্নয়ন।[৬]

---

[১] "Planning is the process of devising a basis for a course of future action." - Seckler Hudson, Organization and Management, Macmillan & Co, 1998, p.125

[২] "Planning is fundamentally an intellectual process, a mental pre-disposition to do work in an orderly way to think before act in the light of facts, rather than guesses." - Arther Dunham, Planning & Family Planning, London 1985, p.238

[৩] H. D. Dickinson, Economics of Socialism, Oxford University Press, 1967, P.14

[৪] "Planning is the process of specifying future objectives, evaluating the means for achieving them and making deliberate choices about appropriate courses." - Social Work Dictionary

[৫] Dudley Seers উদ্ধৃতি: সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা মার্চ ২০০৪, পৃ.২৩

[৬] সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ণ ও নিমকফ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেন, "The great debate about planning in not longer concerned with the question as to whether it is possible or whether it can be reconciled with democracy,

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত ব্যক্তিগত উন্নতিতে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন,

১। সম্পদের যৌক্তিক বণ্টন ও ব্যবহার: পরিকল্পনা বলতে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনাকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে সম্পদের যৌক্তিক বণ্টন ও ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষ্যভিত্তিক সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহারের নিমিত্তে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থা দ্বারা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিকল্পনার বিকল্প নেই।

২। সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন: পরিকল্পনা হলো জনগণের দীর্ঘকালীন সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র নিযুক্ত সুনির্দিষ্ট সংস্থা দ্বারা গৃহীত তথ্যনির্ভর সুচিন্তিত কর্মপ্রয়াস। পরিকল্পনা হলো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা। পরিকল্পনা ছাড়া তাই সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব।[১]

৩। সমন্বিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন: অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রায়শ পরিকল্পনা বলতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বোঝানো হয়। কারণ অনুন্নত দেশের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সীমিত সম্পদ ও উপকরণসমূহের সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়, কীভাবে শিল্প এবং কৃষির উন্নয়ন ও প্রসার করা যায় এবং কীভাবে উন্নততর জীবন মান অর্জন করা যায় – তার প্রচেষ্টা চালানো। অনুন্নত দেশের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য থাকে সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের উন্নয়ন। যে কারণে এসব দেশের পরিকল্পনাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning) বলা হয়।[২]

৪। মানবিক খাতের উন্নয়ন: জনগণের আর্থিক সমস্যার সমাধান এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার ও কার্যকর বিনিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্পের প্রসার, সামাজিক খাতের উন্নয়ন ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাসস্থান,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি মানবিক খাতের উন্নয়নের প্রতি সমান গুরুত্বারোপের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। অনুন্নত দেশে স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জনগণের মানোন্নয়নই পরিকল্পনার মূল বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং বাস্তবতার আলোকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো পরিকল্পনা।[৩] সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ণের ভাষায়, "Planning is likely to be more effective where it is most needed at the level of society problem.[৪]

৫। ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও যোগ্যতার বিকাশ: পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা কিছু না কিছু মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন। পরিকল্পিত উপায়ে এই মেধা ও যোগ্যতা বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হলে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তার সুপ্ত মেধা ও যোগ্যতার কাঙ্ক্ষিত বিকাশ সাধিত হবে। ফলে তা ব্যক্তির নিজের উন্নতিতে যেমন তেমনি তার পরিবার এমনকি জাতীয় উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। অন্যদিকে পরিকল্পনা ছাড়া এ জাতীয় সুফল ভোগ করা অসম্ভব।[৫]

৬। অর্থ, সময়, যোগ্যতা ও সুযোগের অপচয় রোধ: মানুষের জীবনকাল অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং সীমিত। একইভাবে সীমিত তার অর্থ-সম্পদ, সময়, যোগ্যতা ও সুযোগ। পরিকল্পিতভাবে মানুষ যদি তার প্রতিটি অর্থ, প্রতিটি মুহূর্ত, অর্জিত দক্ষতা এবং

---

but rather with the question of how planning may be improved planning is inherent in the conception of modern society." - Ogburn & Nimkof, ibid, p.27

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

[২] প্রাগুক্ত

[৩] ড. আবুল কালাম আজাদ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, আইআরপি, ঢাকা ২০০১, পৃ.৩৭

[৪] Ogburn, ibid, p.65

[৫] ড. আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাতে সমর্থ হয় তাহলে সে একটি সর্বাত্মক অপচয় চক্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তার অর্থের অপচয় হয় না। সে সঠিক ও কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে প্রান্ধলিত কাজ শেষ করতে পারে। অর্থহীন কাজে সে তার যোগ্যতা ব্যবহার করে না এবং কোনো একটি সুযোগই সে অবহেলায় হারায় না। ফলে জীবনের সকল পর্যায়ে সফলতা অর্জন করা যায়।

৭। **সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন:** একটি কাজ কীভাবে করা হবে অথবা জীবনে অনেকগুলো সুযোগের মধ্যে কোনো সুযোগটি গ্রহণ করা হবে কিংবা ক্যারিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে কোনো পথটি অবলম্বন করা হবে – এমন অসংখ্য জিজ্ঞাসা আর সম্ভাবনা মানুষের জীবনে বারবার আসে। মানুষ যদি পরিকল্পিতভাবে এই সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে তার সিদ্ধান্তটি যেমন সঠিক হয় তেমনি গৃহীত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। কেননা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যক্তি তার সমর্থ, যোগ্যতা, গন্তব্য এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বিশ্লেষণ করে থাকে। এতে করে কাজটি থেকে সে যেমন কী চায় বা কী পেতে চায় সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারে তেমনি তার করণীয় বিষয়টিও সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করে নিতে পারে। ফলে সিদ্ধান্তটি ভুল হয় না এবং সঠিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়।[১]

৮। **সফলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি:** পরিকল্পনাহীন জীবন অর্থহীন এবং অসাফল্যে ভরা। কেননা যে জীবনের কোনো পরিকল্পনা নেই, সেটি আসলে কোনো জীবনই নয়। এমন জীবনের অধিকারী মানুষেরা দৈবের উপর ভর করে জীবন ধারণ করেন। যে কোনো প্রাপ্তিতে তারা খুশি হন আর ব্যর্থতাকে কপালের লিখন হিসেবে মেনে নিয়ে সুতীব্র হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কেননা সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকার কারণে তিনি জানেনই না, কী তার করা উচিত, কীভাবে করা উচিত, কেনো করা উচিত এবং কার জন্য করা উচিত। একটি সঠিক পরিকল্পনায় এই প্রশ্নগুলোর প্রতিটির জবাব উল্লেখ থাকে। ফলে ব্যক্তির পক্ষে কাজটির লক্ষ্য অনুসারে ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। এতে করে সফলতা লাভের সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।[২]

৯। **পরিবারের সদস্যদের সামগ্রিক উন্নয়ন:** পরিকল্পনা ছাড়া পরিবারের সকল সদস্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। কেননা পরিকল্পনা না থাকলে সদস্যরা প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায় না। ফলে তাদের প্রয়োজন মত যত্ন নেয়া, পরিচর্যা করা বা লালন-পালন করা সম্ভব হয় না। পরিকল্পনার অভাবে পরিবারের সদস্যরা তাদের করণীয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়েও অন্ধকারে থাকে। দেখা যায়, তারা প্রত্যেকে একই কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে কিংবা একই বিষয়ে স্ব স্ব যোগ্যতা নিয়োজিত করছে, ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবহেলায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যাচ্ছে, চূড়ান্তভাবে যা পরিবারের উন্নতিকেই ব্যাহত করছে। অথচ পরিকল্পনা মাফিক সদস্যদের প্রত্যেকের করণীয় আলাদা করে দেয়া এবং সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করার নীতি গ্রহণ করা হলে পরিবারের প্রতিজন সদস্য স্বতন্ত্রভাবে এবং সমন্বিতভাবে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবেন।[৩]

১০। **সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন:** পরিকল্পনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সন্তানের অধিকার আদায় বা তাদের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য। পরিকল্পনা ছাড়া সংসার শুরু করলে অনেক অভাব-অভিযোগ যেমন থাকে তেমনি থাকে অনেক অপ্রস্তুতি আর তেমন অবস্থায় যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার ভোগান্তির সীমা থাকে না। সন্তান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিআমত। তাই তাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার আগে অবশ্যই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা ছাড়া উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি অসম্ভব। আবার একটি সন্তানের পরে আরেকটি সন্তান গ্রহণেও পরিকল্পনা থাকা দরকার। কেননা মায়ের দুধে, যত্নে ও পরিচর্যায় সন্তানের যেমন অধিকার আছে তেমনি মায়েরও সুস্থ্য থেকে শারীরিকভাবে পুরোপুরি সক্ষম হওয়ার পর নতুনভাবে সন্তান ধারণ ও জন্ম দেয়ার অধিকার আছে। পরিকল্পনা ছাড়া সন্তান বা মায়ের এ অধিকার পূরণ করা অসম্ভব। একইভাবে সন্তানের লেখাপড়া, চরিত্র গঠন এবং আনুসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা অনিবার্য। পরিকল্পনা ছাড়া সন্তানকে যদি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে লেখাপা করানো হয় তাহলে একটা সময়ে এসে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে চিকিৎসক, প্রকৌশলী,

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বৈমানিক, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যাংকার হতে পারবে না। কেননা পরিকল্পনার অভাবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ব্যক্তির কোনো লক্ষ্য থাকবে না। আর লক্ষ্য না থাকার জন্য সে আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা করতে ব্যর্থ হবে। ফলে হতাশ হওয়া ও ব্যর্থ হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।[১]

১১। পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়কঃ পরিকল্পনা ছাড়া পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের মৌলিক মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় সমর্থ অনুপস্থিত থাকে। একটি চাহিদা পূরণ করতে গেলে অন্যটি ঠিকমত পূরণ করার প্রয়োজনীয় রসদ থাকে না। এতে করে মৌলিক চাহিদাতেই চরম ভারসাম্যহীন অবস্থা তৈরি হয়। এমনকি যাদের সকল চাহিদা পূরণের যথেষ্ট সঙ্গতি আছে, তাদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য যে, যদি তারা পরিকল্পনা ছাড়া চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নেয়, তাহলে কোনোটিতে হয়তো মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেবে, কোনোটিতে হয়তো কোনো মনোযোগই দেবে না। ফলে মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে এবং নিশ্চিতভাবেই ব্যক্তি কোনো না কোনো দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ ও অথর্ব হিসেবে বেড়ে উঠবে। কেবল সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণই এ ক্ষেত্রের সকল অসুবিধা দূর করতে পারে।[২]

বস্তুত ব্যক্তি জীবন হোক বা পরিবার জীবন হোক, সামাজিক বিষয় হোক অথবা হোক জাতীয় কোনো প্রসঙ্গ, সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভের প্রথম ও প্রধান পূর্বশর্ত হলো সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পরিকল্পনা ছাড়া কাজ নিতান্তই অর্থহীন। মূলত তা যোগ্যতা, দক্ষতা ও সুযোগের নিদারুন অপচয়। পারিবারিক ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। সফল, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ পরিবার গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ অনিবার্য।

পরিবার পরিকল্পনার প্রচলিত সংজ্ঞা

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা নিরোধের স্বীকৃত তথাকথিত আধুনিক প্রক্রিয়া পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম প্রবর্তনের পথিকৃত হচ্ছেন আমেরিকার মার্গারেট স্যাঙ্গার। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের পরিকল্পিত কার্যক্রম। এটি পরিবার কেন্দ্রিক একটি কল্যাণধর্মী কর্মসূচি। এ পরিকল্পনা পরিবারের কাঠামো ও অবকাঠামো তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সংকীর্ণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে পরিবারের আয় ও সদস্য সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত উপায়ে সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট ও সুখী পরিবার গড়ে তোলা।[৩]

WHO[৪] এর সংজ্ঞানুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা হলো জীবন যাপনের এমন একটি চিন্তাধারা ও পদ্ধতি যা কোনো ব্যক্তি তার জীবনে কিংবা সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধের প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে যাতে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উন্নতি সাধিত হয় এবং তারা দেশের সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সুতরাং বলা যায় পরিবার পরিকল্পনা বলতে এমন একটি কর্মসূচিকে বোঝায় যা দ্বারা পরিকল্পিত উপায়ে সুখী, স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধিশালী পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সন্তানের জন্মদান ঘটনাক্রমে না হয়ে পরিকল্পনা মাফিক হওয়াই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মূলকথা।[৫]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

[৪] WHO – World Helth Organisation

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পরিকল্পিত পরিবার বা পরিবার পরিকল্পনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। তবে পরিবার পরিকল্পনার সাথে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' বা জন্মনিরোধকে একীভূত করে দেখার কারণে এ ব্যাপারে ধর্মভীরু অথবা সংস্কারবিমুখ লোকদের মধ্যে খানিকটা দ্বিধা তৈরি হতে দেখা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হলো, পরিবার পরিকল্পনা মানেই জন্মনিয়ন্ত্রণ নয়। বরং একজন মানুষ কখন সংসার শুরু করবে, কীভাবে সংসার শুরু করবে, সংসারকে কী আদর্শ ও ভাবধারায় সজ্জিত করবে, তার আয়ের উৎসসমূহ কেমন হবে, কোনো সময়টিকে সে বিবাহ করা বা সন্তান গ্রহণের আদর্শ সময় হিসেবে বিবেচনা করবে, জন্ম নেয়া সন্তানদের যত্ন কীভাবে নেবে, তাদেরকে কীভাবে লেখাপড়া করাবে, কী প্রক্রিয়ায় তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করা সম্ভব হবে কিংবা কীভাবে তাদের মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে ইত্যাকার সকল বিষয়ই পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়। একজন সত্যিকার সচেতন মানুষ এ জাতীয় পরিকল্পনা ছাড়া কখনোই পরিবার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন না বা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরিবার পরিচালনার চেষ্টা করেন না। কেননা প্রতিজন বোধসম্পন্ন মানুষই জানেন ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তেমনি পারিবারিক জীবনেও সফল হতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার বিকল্প নেই।[২] নানাভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়।

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

পরিবার পরিকল্পনার সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে এক করে দেখার কারণে ইসলামের একটি মহৎ ও আবশ্যকীয় কর্মসূচী 'পরিবার পরিকল্পনা' সম্পর্কে সাধারণ মুসলিম এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মুসলিম পর্যন্ত দ্বিধায় পড়ে যান। তারা সহজ করে বলতে পারেন না যে, পরিবার পরিকল্পনা ফরয কিন্তু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ হারাম। পরিবার পরিকল্পনা হলো পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। একজন পুরুষ জীবনের কোনো পর্যায়ে এসে পরিবার গঠন করবে তার একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। বিয়ে করার পর সে তার স্ত্রীকে নিয়ে কীভাবে সংসার চালাবে, কোথায় থাকবে, কেমন বাসায় থাকবে, বাসায় থাওয়া দাওয়ার মান কেমন হবে, কী কী খাতে অর্থ-সম্পদ ব্যয় হবে, আয়ের উৎস কী হবে, ব্যয়সমূহ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, অপচয় ও অপব্যয় না করে কীভাবে আবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ের পরিকল্পনা প্রতিটি মানুষেরই থাকা উচিত। সন্তান জন্মদানের আগেই মায়ের স্বাস্থ্য, সন্তানের যত্ন, প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপযোগিতা পূরণের ব্যবস্থার জন্যও পরিকল্পনা প্রয়োজন। সন্তানকে কীভাবে মানুষ করা হবে, কী ধরনের বিদ্যালয়ে তাকে পড়ানো হবে, ভবিষ্যতে সে কী পেশায় নিয়োজিত হবে সে অনুসারে পরিকল্পিতভাবে লেখাপড়া করানোও পরিবার পরিকল্পনারই অংশ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের সাথে এর দূরতমও সম্পর্ক নেই।[৩]

জন্ম নিয়ন্ত্রণ হলো নর-নারীর শারীরিক মিলন সত্ত্বেও যেন সন্তান জন্মগ্রহণ করতে না পারে সে জন্য গৃহীত ব্যবস্থা। এর আসল উদ্দেশ্য হলো বংশ বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা। প্রাচীন কালে এ উদ্দেশ্যে আযল, গর্ভপাত, শিশুহত্যা, অবিবাহিত থাকা কিংবা

---

[১] সন্তানের জন্ম পরিকল্পনা অনুসারে হলে সন্তান যথাযথ প্রস্তুতি ও প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে আসতে পারে। মা মানসিক ও শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সন্তান ধারণের জন্য তৈরি হন। বাবা সন্তানের ব্যয়ভার নির্বাহ ও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর যত্ন, চিকিৎসা ও উন্নত খাবার নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। পরিবার ও কর্মস্থলের জন্য দুজনেই সময় ভাগ করে নেন। ফলে সন্তানের আগমন আনন্দময় হয়। তার অনাদরে অবহেলায় বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায়। মাতৃ তার সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং কাঙ্ক্ষিত মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে পরিকল্পনা ছাড়া ঘটনাচক্রে যে শিশু পৃথিবীতে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অনাদরের শিকার হয়। তাকে অবহেলা করা হয় বা অবজ্ঞা করা হয়। মা-বাবা তাকে জন্ম দেয়ার জন্য এক ধরনের হীনমন্যতা ও অপরাধবোধে ভোগেন। ফলে তার পূর্ণ মানসিক বিকাশ হয় না। এ ধরনের শিশুরাই পরবর্তীতে সন্ত্রাসী হয়ে থাকেন। এভাবে অবহেলায়-অবজ্ঞায় শিশুদের পক্ষেই মাতৃ-পিতৃ হন্তা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

[২] ড. আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৫২

[৩] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন পরিহার করা ইত্যাদি নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। বর্তমানে অবিবাহিত থাকা বা স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন পরিহার করার পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয়েছে বরং এর পরিবর্তে এমন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে যাতে যৌন মিলন বহাল থাকে কিন্তুগর্ভ সঞ্চারের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। ইউরোপ, আমেরিকায় গর্ভপাতের ব্যবস্থা এখনও আছে। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ঘোষণা দিয়ে বিভিন্ন ক্লিনিকে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। তবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য গর্ভপাত নয় বরং গর্ভসঞ্চার বন্ধ করা। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো, এ বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী ও উপায়-উপাদান ব্যাপক হারে সমাজে ছড়িয়ে দেয়া, যেন যৌন মিলনের সময় মানুষ এর সুবিধা ভোগ করতে পারে।[১]

ইসলাম একটি পরিকল্পনাভিত্তিক জীবনব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এটি ছিলো একটি সুপরিকল্পিত সৃষ্টিকর্ম। মানুষের আকৃতি কেমন হবে, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, চাহিদা ও রুচিবোধ কী হবে – সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই তিনি পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। মানুষ কীভাবে জন্ম নেবে, কোথায় জন্ম নেবে, মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে সকল উপায় উপকরণ ও উপযোগী পরিবেশ প্রয়োজন হবে – তাও তিনি পূর্বাহ্নেই ঠিক করে রেখেছিলেন। একটু লক্ষ্য করলেই বিশ্বজাহান সৃষ্টি ও মানুষের জীবনধারায় আল্লাহ তা'আলার এই সুপরিকল্পনার বিষয়টি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। আল-কুর'আনে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আমি প্রতিটি বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।[২]

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, ধ্বংস, লালন, পরিপোষণ ইত্যাদি প্রতিটি কর্মের মধ্যেই অনন্য সাধারণ পরিকল্পনা রয়েছে। মানুষ যেন তাঁর এই পরিকল্পনামাফিক কাজ করার বিষয়টি লক্ষ্য করে এবং সে পরিকল্পনা অনুসারে নিজেরাও পরিকল্পিত জীবন গড়ে তোলে, কুর'আন মজীদে সে সম্পর্কে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে বিশেষত মুসলিম উম্মাহকে বারবার তাঁর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন। তাদের চারপাশে বিরাজমান বিশ্ব পরিকল্পনা সম্বন্ধে গভীরভাবে ভেবে দেখতে এবং এর অলৌকিকতা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেই দিয়েছেন, "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিঃসন্দেহে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৩]

এ আদেশের অনুবর্তী হয়ে মুমিনগণ যে চিন্তা-ভাবনা করে কুর'আনে তার বর্ণনাও অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "(জ্ঞানী তারা) যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকর করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আর বলে – 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এগুলো অর্থহীন সৃষ্টি করেননি। আপনি মহাপবিত্র, তাই আমাদেরকে আপনি জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।[৪]

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা পরিকল্পনাহীনভাবে একটি কাজও করেন না। তাঁর কোনো কথা বা কাজই অর্থহীন বা অনর্থক নয়। বিশ্বজগতের দিকে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায় যে, মহাবিশ্বে আল্লাহ তা'আলা একটি নিখুঁত শৃঙ্খলা ও প্রাকৃতিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রজ্ঞা ও বোধসম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ বার বার এই শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলা হয়েছে, "সূর্য চাঁদকে অতিক্রম করতে পারে না, রাত দিনের আগে যেতে পারে না। এগুলোর প্রতিটি নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।[৫]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

[২] إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আল-কুর'আন, সূরা কামার: ৪৯

[৩] إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ আল-কুর'আন, ৩: ১৯০

[৪] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ আল-কুর'আন, ৩: ১৯১

[৫] لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ আল-কুর'আন, সূরা ইয়াসীন: ৪০

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলা হয়েছে, "(আল্লাহ:) যিনি স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত পাবে না। আবার লক্ষ্য করে দেখো, কোনো খুঁত দেখতে পাও কি?"[১] "এরপর তুমি (আল্লাহর সৃষ্টির খুঁত খুঁজে বের করার জন্য) বারবার দৃষ্টি ফেরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছেই ফিরে আসবে (কিন্তু তুমি কোনো খুঁত বের করতে পারবে না।[২]

কেবল মহাবিশ্ব সৃষ্টিতেই নয়, বরং মানুষ সৃষ্টির নেপথ্যেও আল্লাহ তা'আলা এক সুমহান পরিকল্পনা নিহিত থাকায় ইঙ্গিত করেছেন। এ কারণেই ফেরেশতারা যখন মানুষ সৃষ্টি না করার পক্ষে মতামত প্রদান করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই বিশেষ পরিকল্পনার অংশ বিশেষ উন্মোচিত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "(স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে (আমার) খলীফা সৃষ্টি করছি। তারা বললেন, আপনি কী এমন জাতিকে সৃষ্টি করছেন, যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আর আমরাই তো প্রশংসাসহ আপনার তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি! আল্লাহ বললেন, তোমরা যা জান না তা নিশ্চিতভাবেই আমি অধিক জানি।[৩]

মানুষকে মর্যাদা দান,তাদের জীবন যাপনের রীতি-নীতি নির্ধারণের মধ্যেও পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি, তাদেরকে স্থলভাগে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[৪]

তিনি মানুষের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করেছেন। মানুষের ভোগ ও সুখের সামগ্রীতে সমগ্র পৃথিবী সজ্জিত করেছেন। এর মধ্যেও তাঁর মহান পরিকল্পনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুর'আন মাজীদে এ ঘোষণাই বিঘোষিত হয়েছে। যেমন, "তিনি আল্লাহ, যিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৫]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একা একা বসবাসের জন্য বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেননি। মানুষকে তিনি একটি উম্মাহ বা জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যেন মানুষ তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে পারে। মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির ঊষালগ্নে কেবল একজন পুরুষ সৃষ্টি করেন। এরপর তার সঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করেন একজন নারীকে। তারপর তাদের দুজন থেকে বিস্তৃত করেন অসংখ্য নারী পুরুষ। তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশে আলাদা করেন। কিন্তু সর্বত্রই সমাজবদ্ধ বসবাসের এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।[৬]

সর্বোপরি আল্লাহ মানুষকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অনন্য পরিকল্পনার অধীনে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। "আমি জিন ও মানুষ জাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[৭]

মানুষের সৃষ্টিশৈলীর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার এই পরিকল্পনার প্রকাশ দেখা যায়। যেমন তিনি বলেন, "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, তারপর তোমার সুষম বিকাশ ঘটিয়েছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, সে আকৃতিতেই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৮]

---

[১] الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ আল-কুর'আন, সূরা মুলক: ৩

[২] ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ আল-কুর'আন, সূরা মুলক: ৪

[৩] وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ আল-কুর'আন, ২: ৩০

[৪] وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا সূরা বনী ইসরাঈল:৭০

[৫] هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا আল-কুর'আন, ২: ২৯

[৬] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

[৭] وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আল-কুর'আন, সূরা যারিয়াত:৫৬

[৮] يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ - فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ আল-কুর'আন, সূরা ইনফিতার: ৬-৮

Dhaka University Institutional Repository

মুমিন জীবনে পরিকল্পনার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হলো সালাত। দৈনিক পাঁচ বার নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করতে হয়। আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরয করা হয়েছে।[১] ইসলামে সালাতের পাশাপাশি অন্যান্য যে আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ ফরয করা হয়েছে, তার প্রতিটির নেপথ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের আর্থিক ভারসাম্যহীনতা প্রতিরোধ এবং দরিদ্রতা নিয়সনের লক্ষ্যে যাকাতের বিধান দেয়া হয়েছে। আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং নিরন্ন মানুষের দুঃখ উপলব্ধির জন্য সাওমের বিধান দেয়া হয়েছে। এর কোনো একটি ইবাদাতও ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় যেভাবে খুশি সেভাবে বা যখন খুশি তখন সম্পাদন করতে পারে না। বরং এ জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হয়।

ইসলামে পরিকল্পনার বিষয়টিতে কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবী-রাসূলের জীবনেতিহাস বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয়েছে। মিসরে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করার জন্য হযরত ইউসুফ (আ) একটি চমৎকার পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন, যা ছিলো জাগতিক সমস্যা মোকাবেলায় একটি কার্যকর দৃষ্টান্ত। বিষয়গত গুরুত্বের কারণে মহান আল্লাহ কুর'আন মজীদে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।[২]

কুর'আন মজীদের উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ। আয়াতের শিক্ষানুসারে কোনো মুমিনই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনাহীনভাবে পরিচালনা করতে পারে না। দুনিয়াতে সুখে-শান্তিতে থাকার জন্য এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত কাজ। দুনিয়ার জীবনকে শান্তিপূর্ণ ও কাম্য করে তোলার পদ্ধতিও আল্লাহই নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, "আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো তবে দুনিয়ার কথা ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ যেমনভাবে তোমার উপর ইহসান করেছেন তেমনভাবে অন্যদের প্রতি ইহসান করো। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী কাউকে পছন্দ করেন না।[৩]

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথে, মানুষের কল্যাণে ও দুঃস্থদের সহযোগিতার জন্য অর্থ ব্যয়ের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দান করার ক্ষেত্রে তুমি তোমার হাত ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ করে রেখ না এবং তোমার হাত পুরোপুরি খুলে দিও না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।[৪]

এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের বিস্তারিত এবং প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার ছক এঁকে দিয়ে ইসলাম সর্বোত্তভাবে পরিকল্পিত জীবন যাপনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছে।

---

[১] إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا আল-কুর'আন, ৪: ১০৩

[২] "(মিসরের) রাজা বললেন: 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ। হে সভাষদগণ! আপনারা যদি পারেন তাহলে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিন।' সভাষদরা বলল: 'এটি একটি অর্থহীন স্বপ্ন। তাছাড়া এ জাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান আমাদের নেই।' (ইউসুফের দুজন) কারাসঙ্গীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিলো দীর্ঘদিন পর তার ইউসুফের কথা মনে হলো। সে বলল: 'আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এনে দেব। তাই আপনারা আমাকে (ইউসুফের নিকট) প্রেরণ করুন।' (তাকে প্রেরণ করা হলো।) সে বলল: 'হে সত্যবাদী ইউসুফ! (রাজা স্বপ্নে দেখেছেন) সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ। আপনি আমাকে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি রাজা ও তার পরিষদবর্গের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং তাদেরকে জানাতে পারি।' ইউসুফ বললেন: 'তোমরা সাত বছর বিরামহীন চাষ করবে, এরপর তোমরা যে ফসল কাটবে তা শীষসহ রেখে দেবে। তবে তোমাদের খাওয়ার জন্য সামান্য পরিমাণ রাখবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এ সাত বছর (কিছু উৎপন্ন হবে না, বরং) লোকেরা তা খাবে যা তোমরা আগের সাতবছর জমা করে রেখেছো। তবে বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য যে সামান্য পরিমাণ তোমরা রেখে দেবে। তারপর আসবে এমন একটি বছর, মানুষের জন্য যে বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং মানুষ বিপুল ভোগবিলাসে লিপ্ত হবে।" আল-কুর'আন, সূরা ইউসুফ: ৪৩-৪৯

[৩] وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ আল-কুর'আন, ২৮: ৭৭

[৪] وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا আল-কুর'আন, ১৭: ২৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর গোটা জীবন একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে পরিচালনা করেছেন। মক্কায় ইসলাম প্রচার করা, প্রথম দিকে নির্যাতন সহ্য করা, প্রতিরোধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করা, নওমুসলিমদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা, আবিসিনিয়ায় হিজরত, বায়আতুল আকাবা, মদীনায় হিজরাত, হিজরাতের সময় স্বতন্ত্র পথে মদীনা গমন, মসজিদে নববী নির্মাণ, মদীনা সনদ প্রণয়ন, বিভিন্ন যুদ্ধ প্রভৃতি প্রতিটি কাজে তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ পরিকল্পনা নীতিই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাঁর অনুসরণে খোলাফায়ে রাশীদাও সুষ্ঠু, সুন্দর ও আদর্শ পরিকল্পনার আলোকেই খিলাফত পরিচালনা করেছেন।

এ আলোচনা থেকে একান্তভাবে যে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হলো, ইসলাম অপরিকল্পিত জীবন যাপন পছন্দ করে না। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সে অনুসারে কাজ করাই মুসলিমের কর্মপদ্ধতি হওয়া আবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। তা হলো, পরিকল্পনা গ্রহণ বা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা অথবা কাজ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা কোনোক্রমেই তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ নয়। কেননা পৃথিবীর সকল কালের, সকল দেশের মুমিনগণ এ বিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই পোষণ করে থাকেন যে, তার অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভালো, মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই আল্লাহর হাতে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু করার ক্ষমতা কারো নেই, তাঁর ইচ্ছার বাইরে কখনো কোনো কিছু সংঘটিতও হয় না। যেমন আল্লাহ বলেন, "(হে রাসূল স) আপনি তাদেরকে বলুন: আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দেয়ার ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতাম তাহলে তো আমি বিপুল কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হতাম এবং কোনো খারাপ বিষয়ই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। বস্তুত মুমিন জাতির জন্য আমি সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছু নই।[১]

একইভাবে তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। মুসলিম ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের এবং সন্তানের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে। কুর'আনে এর প্রকৃতি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার উপরই নির্ভর করেছি, আপনার প্রতি অগ্রসর হয়েছি এবং ফিরে আসব আপনার কাছেই।[২]

তাই প্রতিজন মুসলিম একান্তভাবে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করেন, সাথে সাথে পরিকল্পিতভাবে জীবন গঠনের চেষ্টা করাকে আল্লাহ নির্ভরতা পরিপন্থী বিষয় মনে করেন না। বরং ইসলামের মূল্যবোধ ও দর্শন অনুসারে তাঁরা মনে-প্রাণে এও বিশ্বাস করেন যে, 'আল-আখয বিল আছবাব' বা নিজের জরুরী প্রয়োজন পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী বিষয় নয়। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সা) কে বলেছেন, "কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আপনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। যারা ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।[৩]

হযরত উমর (রা) বলেছেন, "আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো তুমি জমিতে বীজ বপন করবে, তারপর ভালো শস্যের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।[৪] অর্থাৎ বীজ বপন না করে যদি ভালো শস্যের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা হয় তাহলে তা হবে নিতান্তই মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতাসুলভ কাজ। অনুরূপভাবে পরিকল্পিত পরিবার সংক্রান্ত প্রক্রিয়া মানুষ গ্রহণ করলেও সফলতা বা ব্যর্থতা হচ্ছে আল্লাহর হাতে।

মানুষ স্বীয় কল্যাণের আশায় যদি কোনো উপকরণের আশ্রয় গ্রহণ করে বা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে তা তাকদীর বা তাওয়াক্কুলের বিরোধী কাজ হবে না। হযরত উমর (রা) সিরিয়া সীমান্তের যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে গেলে তাঁকে মহামারী হিসেবে আবির্ভূত প্লেগ রোগের কথা বলা হলো। তা শুনে তিনি প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে হযরত আবূ ওবায়দা ইবনে জাররা

---

[১] قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
আল-কুর'আন, সূরা আরাফ: ১৮৮

[২] ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير আল-কুর'আন, সূরা মুমতাহিনা: ৪

[৩] وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين আলে ইমরান: ১৫৯

[৪] ড. আবদেল রহীম উমরান, তানজীম আল-উসরাত ফীত তিরাসিল ইসলামী, জামেয়া আল-আযহার, কায়রো, ১৯৯৪, পৃ.১২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

(রা) তাঁকে বললেন, "হে উমর! আপনি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন?" উমর (রা) জবাব দিয়েছিলেন: "আমি আল্লাহর নির্দেশেই আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।[১]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর এক সাহাবী উট ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, উটটির ব্যাপারে তিনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন। জবাবে মহানবী (সা) তাঁকে বলেছিলেন, "উটটিকে ভালো করে বাঁধো, এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো।[২]

বস্তুত পরিকল্পনা করা এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ যে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কাজ নয় বন্যা প্রতিহত করার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা, জলোচ্ছাসের সময় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মজবুত করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া থেকেও বিষয়টি প্রমাণ হয়। প্রকৃতপক্ষে অলসতা ও অসহায়ত্বকে স্বাগত জানানোর ব্যাপারে ইসলাম মোটেই উৎসাহ দেয়নি। কর্মবিমুখতাকে কোনোক্রমেই তাওয়াক্কুল হিসেবে আখ্যায়িত করেনি। বরং পরিকল্পিত প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, প্রকৃত মুমিনের জীবন অবশ্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনাভিত্তিক হতে হবে।

ইসলামে পরিবার পরিকল্পনার ধারণা

গোড়া থেকেই ইসলাম পরিকল্পিত পরিবার গঠনের তাগিদ দিয়েছে। কুর'আন মজীদে তরুণদের বিয়ে করার যে আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তাতেই পরিবার পরিকল্পনার মূল নির্দেশনা নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহযোগ্য নর-নারী তাদের বিয়ে সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।[৩]

আয়াতখানি একান্তভাবে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে। আয়াতে যাদের বিয়ে করার যোগ্যতা আছে এমন নারী-পুরুষের বিয়ে সম্পন্ন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, যদি তাদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকে, তাহলে আল্লাহ বিয়ের বদৌলতে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। এ থেকে প্রমাণ হয় আয়াতে যে সঙ্গতির কথা বলা হয়েছে তা হলো শারীরিক। অর্থাৎ শারীরিকভাবে একজন নারী বা পুরুষ যখন বিয়ের যোগ্য হবে, কেবল তখনই তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষই বিয়ের জন্য শারীরিক দিক থেকে যোগ্য বিবেচিত হন। এতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিক-বালিকার বিয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সাথে সাথে এটি কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার একটি দিকও কেননা এতে কখন বিয়ে করা উচিত সে বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একইভাবে সংসার শুরু করার সময় কখন তা নির্দেশ করে আল্লাহ বলেন, "যাদের বিয়ের সামর্থ নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।[৪]

এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, কেউ যদি শারীরিক দিক থেকে বিয়ে করার যোগ্য হয় কিন্তু আর্থিক দিক থেকে না হয় সে যেন আর্থিক দিক থেকে বিয়ে করার যোগ্যতা অর্জন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে। আয়াতে যোগ্যতা বলতে যে আর্থিক যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা ব্যক্তি যদি শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম হয় তাহলে আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে বলতেন না। তাঁর বাণীই প্রমাণ করে, তিনি শারীরিক দিক থেকে সক্ষম কিন্তু আর্থিক দিক থেকে অক্ষম লোকের কথা বলেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মহানবী (সা) বলেছেন, এমন ব্যক্তি যেন রোযা রাখে। এতেও আর্থিক অক্ষমতার বিষয়টিই প্রমাণ হয়। কেননা যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে সক্ষম সে যদি রোযা রাখে তাহলে তার যৌন কামনা ও চাহিদা অনেকখানি অবদমিত হবে। সে যদি শারীরিকভাবে অক্ষম হয়, তাহলে তো রোযা রাখার কোনো প্রয়োজন হয় না।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ! আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ঈমান

[৩] وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ আল-কুর'আন, ২৪: ৩২

[৪] وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ আল-কুর'আন, ২৪: ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম লক্ষ্য হলো, মানুষ কখন পরিবার জীবন শুরু করবে তা ঠিক করে দেয়া। সে প্রাপ্ত বয়স্ক হবে এবং শারীরিক ও আর্থিক দিক থেকে বিয়ে করার মত সঙ্গতি সম্পন্ন হবে। তাহলেই সে বিয়ে করতে পারবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেই পরিকল্পিত পরিবার গড়ার প্রাথমিক ভিত্তিটি এর মাধ্যমে ঠিক করে দিলেন। মানুষকে সাধারণভাবে বিয়ে করার তাগিদ দেয়া হলেও কাউকে কাউকে বিয়ে করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করলেন। বিয়ে করা, সন্তান জন্ম দান, সন্তানের লালন-পালন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক অধিকার ও কর্তব্য, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবারের প্রতিজন সদস্যের প্রতি অন্যান্য সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ প্রয়োজনীয় বিধান প্রদান করলেন। এ বিধানসমূহ মূলত ইসলামের পরিবার পরিকল্পনা নীতিরই বিভিন্ন দিক।

ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা

আগেই বলা হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। ক্ষেত্র বিশেষে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কারো কারো ক্ষেত্রে বা কোনো কোনো পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনার অংশ হতে পারে, কিন্তু কোনোক্রমেই তা পরিবার পরিকল্পনার সম্পূর্ণ রূপ নয়। এ পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা যেতে পারে।

কুর'আন মজীদের এক আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি কাঠামোতে রদবদলকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যাদান করা হয়েছে। যেমন, (শয়তান বলল) তাদেরকে নির্দেশ দেব তারা যেন আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি বিকৃত করে দেয়।[১]

এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর সৃষ্ট কাঠামোতে রদবদল করার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুকে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে বলেছেন তা না করা অথবা এমনভাবে ব্যবহার করা, যার তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এ মূলনীতির মাপকাঠিতে দেখা দরকার যে, নর-নারীর সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য কী এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন হয় কি-না। এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কুর'আন থেকেই পেতে পারি। কুর'আন মজীদ নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে দুটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে। প্রথমত, "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের শস্যক্ষেত। তাই তোমরা তোমাদের ফসলের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের (পরকালের) জন্য কিছু করো।[২]

দ্বিতীয়ত, "আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পেতে পার এবং এ জন্য তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় চিন্তাশীল জাতির জন্য এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।[৩]

প্রথম আয়াতে নারীদেরকে ফসলের জমি আখ্যা দিয়ে একটি জৈবিক সত্য (Biological fact) পেশ করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান অনুসারে নারীর মর্যাদা ফসলের জমির মতই। আর পুরুষ হলো চাষী। তাদের উভয়ের মিলনের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মানুষ, জন্তু জানোয়ার ও গাছপালা সবাই সমান।

দ্বিতীয় আয়াতে নর-নারীর সম্পর্ক স্থাপনের আরো একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থায়িত্ব। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবন যাপনই তমদ্দুনের বুনিয়াদ। এ উদ্দেশ্যটা মানুষেরই জন্য আর মানুষের দৈহিক সৃষ্টির মধ্যেই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার যাবতীয় উপাদান মজুদ রাখা হয়েছে।

মহাবিশ্বের বিশাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক সর্বব্যাপী শক্তিশালী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে খাদ্য বিষয়ক আর অপরটি হলো বংশ বিস্তার। খাদ্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য হলো, বর্তমানে যে সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থেকে এই ব্যবস্থাপনার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য মহান

---

[১] وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ আল-কুর'আন, ৪: ১১৯

[২] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ আল-কুর'আন, ২: ২২৩

[৩] وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ সূরা রূম: ২১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করেছেন। দেহের ভেতরের অংশগুলোকে খাদ্য হজম করা এবং সেগুলোকে দেহের অংশে পরিণত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সর্বোপরি এ উদ্দেশ্যেই খাদ্যের প্রতি সৃষ্টির স্বাভাবিক আগ্রহও তৈরি করে দিয়েছেন। এ কারণে মানুষসহ পৃথিবীর সকল সৃষ্টি খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ ব্যবস্থার অভাবে পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টিই অস্তিত্বশীল থাকতে পারতো না। তবে একজন সৃষ্টিকর্তার কাছে খাদ্য গ্রহণের এ ব্যবস্থাটি সচল রাখার চেয়ে বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা বহাল রাখাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ব্যক্তির জীবনকাল অত্যন্ত সীমিত। তার এ সীমাবদ্ধ আয়ু শেষ হওয়ার আগেই বিশ্বের কারখানাকে সচল রাখার জন্য তার স্থান দখলকারী তৈরি হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এ দ্বিতীয় ও মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যই মহান আল্লাহ সন্তান জন্মের ব্যবস্থা রেখেছেন। সৃষ্টিকে পিতৃ ও মাতৃশক্তিতে বিভক্ত করা, উভয়ের দৈহিক কাঠামোতে পার্থক্য রাখা, উভয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বহাল রাখা এবং দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য উভয়ের মনের মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দান করেছেন।

মহান আল্লাহর বিশ্ব জাহানের অসংখ্য সৃষ্টিরাজির প্রতি লক্ষ্য করলে একটি বিষয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তা হলো, যে জীবের সন্তান অনেক বেশি সংখ্যক হয় তাদের মধ্যে তিনি সন্তান লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য খুব বেশি আগ্রহ ও স্নেহ-মমতা দান করেননি। কারণ এ সৃষ্ট জীবেরা কেবল বিপুল সংখ্যক সন্তান জন্মের কারণেই বংশ টিকিয়ে রাখে। কিন্তু যে সকল জীবের সন্তান হয় কম, তাদের মনে আল্লাহ তা'আলা সন্তানের প্রতি এমন গভীর স্নেহ-মমতা প্রদান করেন যে, সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত মমতা ও ভালোবাসায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মানব সন্তান সৃষ্টজীবের সকল প্রজাতির সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম হয়ে জন্মায় এবং দীর্ঘকাল তাদেরকে মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখির যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক ও প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক অথবা প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এ জন্যই মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সাথে স্থায়ী প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য থাকে। এ দুটি বিষয়ই মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করে। এখান থেকেই পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ রচিত হয়। পরিবার থেকে বংশ আর বংশ থেকে গোত্র হয়। আর এভাবেই সভ্যতার সুবিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়।

এবার মানুষের গঠন বৈচিত্র বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মানুষের দেহ গঠনে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বংশধরের স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষের দেহে যতো উপকরণ আছে তার মধ্যে দেহের নিজস্ব কল্যাণের চেয়ে ভবিষ্যতের বংশধরদের কল্যাণের প্রতিই বেশি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মানবদেহের যৌন গ্রন্থিগুলো এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। এ গ্রন্থিগুলো একদিকে মানব দেহে হরমোন সঞ্চার করে এবং এর ফলে দেহ একদিকে সৌন্দর্য, সুষমা, কমনীয়তা, সজীবতা, বুদ্ধিমত্তা, চলৎশক্তি, বলিষ্ঠতা ও কর্মশক্তি সৃষ্টি হয় এবং অপরদিকে এ যৌন গ্রন্থিই প্রজনন শক্তি সৃষ্টি করে নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে। যে সময় মানুষ বংশ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকার যোগ্য থাকে, জীবনের সে অংশেই তার যৌবন, সৌন্দর্য ও কর্মশক্তি বিদ্যমান থাকে। যে সময় সে সন্তান জন্মানোর অযোগ্য হয়ে পড়ে জীবনের সে অংশটাই দৌর্বল্য ও বার্ধক্যে নিয়ত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যস্থিত গোপন সম্পর্ক রক্ষার দুর্বলতা আসার অর্থই হলো মরণের অগ্রিত নোটিশ লাভ করা। যদি মানুষের দেহ থেকে তার যৌন গ্রন্থিগুলোকে বাদ দেয়া যায় তাহলে সে একদিকে যেমন মানব বংশ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকার ব্যাপারে অসমর্থ হয়ে পড়ে তেমনি অন্যদিকে তার মানবীয় যোগ্যতা ও কর্মশক্তিও বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কেননা যৌনগ্রন্থির অবর্তমানে দেহ ও মস্তিষ্কের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

নারীদেহ সৃষ্টিতে বংশ বৃদ্ধির কাজটিকে পুরুষের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, নারী দেহের যাবতীয় কল-কব্জা কেবল বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। সে যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখনই তার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়। এ ব্যবস্থা দ্বারা নারীদেহ প্রতিমাসেই গর্ভ ধারণের উপযুক্ত থাকে। শুক্রাণু গর্ভাধারে স্থান লাভ করার সাথে সাথে নারীদেহে একটি বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। ভাবী সন্তানের কল্যাণকারিতা তার সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

উপর সুস্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তার জীবন রক্ষার জন্য সর্বদিন পরিমাণ দৈহিক শক্তি ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। এ কারণেই নারীর স্বভাবে স্নেহ, প্রীতি, ত্যাগ, কষ্ট ও সহিষ্ণুতা বদ্ধমূল হয়ে যায়। এ জন্যই পিতৃত্বের সম্পর্কের তুলনায় মাতৃত্বের সম্পর্ক অধিকতর গভীর ও শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে। সন্তান প্রসবের পর নারীদেহে দ্বিতীয় একটি বিপ্লব সাধিত হয়। এর ফলে নারী সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য তৈরি হয়ে যায়। এ সময় নারীদেহের দুগ্ধ গ্রন্থিগুলো তার খাদ্যের উত্তম অংশকে টেনে নিয়ে সন্তানের জন্য দুধ সরবরাহ করার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং এখানেও নারীকে ভবিষ্যত বংশধরের জন্য আরো এক দফা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সন্তানের জন্য দুধ সরবরাহ করার কাজ থেকে অবসর পাওয়ার সময় নিকটবর্তী হতে হতে নারী আবারো সন্তান ধারণের যোগ্য হয়ে ওঠে।

এ কার্যকারণ পরম্পরা নারীর বংশ বৃদ্ধির যোগ্যতা থাকাকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যখনই এ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়, তখনই সে মরণের পথে পা বাড়ায়। বার্ধক্যের সময় শুরু হতেই তার সৌন্দর্য, সুষমা বিদায় নেয়, তার দৈহিক সজীবতা, কমনীয়তা ও আকর্ষণ শেষ হয়ে যায় এবং শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক অবসাদ তাকে ঘিরে ধরে যার সমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য যতোদিন জীবন ধারণ করে ততদিনই তার জীবনের শ্রেষ্ঠসময়। আর জীবনের যে সময়টুকু সে নিজের জন্য বেঁচে থাকে সে সময়টা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর এবং ভীষণ অনাকাঙ্ক্ষিত সময়। অ্যান্টন নিমিলোভ এ প্রসঙ্গে বলেন, "নারী জন্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব জাতির বংশ রক্ষা করা।[১]

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ডাঃ এলিক্সিস ক্যারেল বলেন, "নারীর সন্তান জন্ম দানের যে কর্তব্য এটা যে কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা আজো সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। এ দায়িত্ব পালন করা নারীত্বের পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। তাই নারীদের সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

ডাঃ ওসওয়াল্ড সোরজ বলেন, "যৌন প্রেরণার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য কী এবং এটি কোনো উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্ট? এ প্রেরণার সম্পর্ক যে বংশ বৃদ্ধির সাথে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ কথা উপলব্ধি করার ব্যাপারে জীববিজ্ঞান আমাদেরকে সহায়তা করে থাকে। এটা একটা প্রমাণিত জৈবিক বিধান যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে তৎপর এবং প্রকৃতি এদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা পূরণ করার জন্য সতত উদগ্রীব। এ দায়িত্ব পালনে পালনে বাধা সৃষ্টি করলে জটিলতা ও বিপদ অনিবার্য। নারী দেহের বৃহত্তর অংশ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্ম দানের জন্য সৃষ্ট। যদি কোনো নারীকে তার দেহ ও মস্তিষ্কের এ দাবি পূরণ করা থেকে বিরত রাখা যায়, তাহলে সে দৈহিক ক্ষয় ও পরাজয়ের শিকারে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে সে মা হতে পারার মধ্যে এক নতুন সৌন্দর্য ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করে, যা তার দৈহিক ক্ষয়ক্ষতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।[৩] সোরজ আরো বলেন, "আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ কাজ করতে চায়। কোনো অঙ্গকে তার দায়িত্ব পালন থেকে নিয়ন্ত করলে এর পরিণতি স্বরূপ দৈহিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একটি নারীর জন্য কেবল এজন্য সন্তানের প্রয়োজন হয় না যে, তার মাতৃত্ব এটি দাবি করে অথবা সে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনকে তার প্রতি আরোপিত একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করে, বরং এ জন্য তার সন্তানের প্রয়োজন যে, তার দৈহিক ব্যবস্থাপনা শুধু এ উদ্দেশ্যেই বিন্যস্ত হয়েছে। যদি তার দেহের এ সৃষ্টি কার্যকে বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থাপনায় এক শূন্যতা, বঞ্চনা ও পরাজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়।[৪]

কুর'আন মজীদে বর্ণিত তথ্য এবং উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো বংশ বৃদ্ধি এবং এ সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক জীবন যাপন করে মানবীয় তমদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষের মধ্যে যে আকর্ষণ ও উভয়ের দাম্পত্য জীবনে যে আনন্দ দান করেছেন তা

---

[১] Anton Nemilov, Biological Tragedy of Woman, London 1932

[২] Dr. Alixis Carrel, Man The Unknown, London 1942

[৩] Dr. Oswald Schwarz, The Psychology of Sex, London, 1945, p.17

[৪] ibid

Dhaka University Institutional Repository

কেবল এ কারণে যে, যেন মানুষ তার মজ্জাগত প্রেরণার চাপে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে। এখন যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে চায় কিন্তু এর পরিণতি মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না, সে আল্লাহর সৃষ্টিতে ও তাঁর সৃষ্টি ধারায় বিকৃতি সাধনের ইচ্ছাই পোষণ করে। এমন ব্যক্তির তুলনা হতে পারে সে ব্যক্তির সাথে যে রসনা তৃপ্তির জন্য ভালো ভালো খাবার চিবিয়ে গিলে ফেলার বদলে বাইরে ফেলে দেয়। এমন ব্যক্তি মূলত মানব বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে নিজেরই ভবিষ্যত হত্যা করে, একে আত্মবংশ হত্যা বলাই সঙ্গত। শুধু তাই নয়, বরং এমন ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়মের সাথেও নিরন্তর ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত হয়। প্রকৃতি যৌন মিলনে যে সুখানুভূতি রেখেছে তা রেখেছে বংশ বৃদ্ধির প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য সাধনের পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পুরামাত্রায় পুরস্কার চায় কিন্তু কর্তব্য পালনে অস্বীকার করে সে কি ধোঁকাবাজ নয়?

ইসলামে পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার কল্যাণ

আমরা আগেই প্রমাণ করেছি, ইসলাম মূলত একটি পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে ইসলাম যেমন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা পেশ করেছে, পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম বা মতবাদ সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্যই পেশ করেনি। মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক বা বিভাগ নেই যে সম্পর্কে ইসলাম বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা পেশ করেনি। ইসলামি পরিকল্পনা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক, বিভাগ, স্তর ও পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। পরিবারের ক্ষেত্রেও ইসলামের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে যা অনুসরণ করলে পারিবারিক জীবনেও সর্বোচ্চ কল্যাণ সম্ভব।

ইসলামের নীতিমালা ও হুকুম-আহকামের একটি বিশেষ দিক হলো, এর প্রতিটি বিধান মানবিক এবং যুক্তিসঙ্গত। মানবীয় প্রকৃতির সাথে ইসলামি বিধি-বিধানের সহজাত মিল এ কারণেই লক্ষ্য করা যায়। ইসলামে মানুষের জন্য যে কোনো ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ বিধানটিই দেয়া হয়েছে। মানুষের উপর অনাবশ্যক কাঠিন্য আরোপ করে এখানে জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়নি। অত্যধিক কঠোরতা, সীমাতিরিক্ত বোঝা, পদে পদে নিষেধাজ্ঞা ও শৃঙ্খল কিংবা সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেয়ার নীতি ইসলামে একেবারেই বর্জন করা হয়েছে। বরং সরলতা, শৃঙ্খলা, মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর সীমাহীন দয়া, মমত্ববোধ আর সাধ্য অনুসারে কাজের আদেশ দেয়ার নীতিই ইসলামি জীবন বিধানে সর্বোতভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এ মূলনীতি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন ও কষ্টসাধ্য করতে চান না।[১]

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের বাইরের দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে যা ভালো কিছু অর্জন করেছে তার প্রতিদান সে পাবে আর সে মন্দ যা কিছু অর্জন করেছে তার পরিণামও সেই ভোগ করবে।[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, কেননা মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩]

আরো বলা হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।[৪]

বিধান প্রণয়নে মহান আল্লাহ যখন এমন নীতি অবলম্বন করেছেন, তখন যে বিধানে সত্যিকারার্থেই মানুষের ক্ষতি হয় অথবা কারো জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পরে কিংবা কাউকে অবথা হয়রান হতে হয়-এ জাতীয় বিধান উদ্ভাবন, প্রণয়ন বা প্রবর্তন করা ইসলাম সম্মত হতে পারে না। তাই পরিবারেও ইসলাম মাতাপিতার জন্য এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি বাধ্যতামূলক করে না যেখানে তাদের দায়িত্ব পালনে উদাসীন হতে বাধ্য হতে হয় অথবা তাদের নিজেদেরই জীবন সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। বেশি সন্তান নিলে খাবারের অসুবিধা হবে, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে কিংবা সুখী হওয়া যাবে না - এ জাতীয় ইচ্ছায় যারা

---

[১] يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আল-কুর'আন, ২: ১৮৫

[২] لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ আল-কুর'আন, ২: ২৮৬

[৩] يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا আল-কুর'আন, ৪: ২৮

[৪] وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ আল-কুর'আন, সূরা হজ: ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেন, তারা ইসলাম বিরোধী কথাই বলেন। কেননা মানুষের প্রয়োজনীয় এ উপাদানগুলো সরবরাহ করার দায়িত্ব কোনো মানুষের নয়। এ নিয়ে তার শঙ্কিত বা ভীত–সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ উদ্দেশ্যে কেউ জন্মনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতায় পূর্ণ ঈমান রেখে কেউ যদি বাস্তবসম্মত এবং ইসলাম সমর্থিত কারণে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের উদ্যোগ নেয় এবং সে পরিকল্পনায় সন্তানের সংখ্যা সীমিত রাখার বিষয়টিও থাকে, তাহলে তাকে নিষিদ্ধ বা অবৈধ বলার যুক্তি থাকে না। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে ইসলামে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়। যেমন,

পরিবার পরিকল্পনার অর্থনৈতিক দিক: ইসলামে সন্তানের জন্মদানকেই মাতাপিতার একমাত্র দায়িত্ব বলা হয়নি। বরং তাদের ভরণ–পোষণ, চরিত্র গঠন, প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব পালন এবং মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্যান্য দিক পূরণ করার দায়িত্বও মাতাপিতাকে দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করা মাতাপিতার অনিবার্য দায়িত্ব। কেননা এ দায়িত্ব পালন করা বা না করার উপর ভবিষ্যতের মানুষ যোগ্য হবে নাকি অযোগ্য হবে, চরিত্রবান হবে নাকি চরিত্রহীন হবে, স্বাস্থ্যবান হবে নাকি চিররোগা হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্ভর করে। মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন, "আর পুরুষ তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী দায়িত্বশীল তার স্বামীর সম্পদ, সন্তান, সংসারের। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১]

ইমাম নববী (র) এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যাদের খাওয়া–পরার দায়িত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তাহলে এ কাজই তার গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[২]

এমন দায়িত্ববোধ, সন্তানকে প্রকৃত ইসলামি আখলাকে মানুষ করার প্রেরণা, অবৈধ উপার্জন থেকে বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং দীনি কাজে প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করার লক্ষ্য নিয়ে কেউ যদি পরিকল্পিতভাবে সন্তান গ্রহণের নিয়্যত করেন এবং এ জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও ব্যবহার করেন, তাহলে তা অবৈধ হবে না। কেননা এ কাজে তিনি আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত সীমালংঘন করেননি অথবা সন্তান হত্যার মত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ইমাম গাযালী (র) তাঁর ইহইয়াউ উলুম আল–দীন[৩] শীর্ষক বিশ্বখ্যাত গ্রন্থে এমন মত প্রকাশ করেছেন।

পরিবার পরিকল্পনার স্বাস্থ্যগত দিক: কুর'আনে রয়েছে, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু।[৪] এর তাৎপর্য হলো, মানুষ স্বেচ্ছায় এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে তার নিজের জীবন হুমকিগ্রস্ত হয়। এ ঘোষণাই আত্মহত্যা হারাম হওয়ার মূলভিত্তি। মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে না। কেননা তার শরীর, স্বাস্থ্য, সক্ষমতা তার নিকট আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আমানত। অন্যের ক্ষতি করলে বা অন্যকে কষ্ট দিলে নিজেকে সমপরিমাণ ক্ষতির হুমকিগ্রস্ত করা হয় বলে আয়াতে বিশেষ রীতিতে নিজের ক্ষতি করতে, নিজেকে হত্যা না করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, মানুষের জীবন সংশয়াপন্ন হতে পারে বা সে শারীরিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে অথবা তার কারণে অন্যের ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কাজও সে করতে পারবে না। পরিবার পরিকল্পনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বনের স্বাস্থ্যগত যুক্তিটি এ বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

অধিক সন্তান ধারণ যদি মায়ের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়, বারবার প্রসব যদি পরিবারের অন্যদের অসুবিধার কারণ হয়; বিশেষত পরপর সন্তান নেয়ার কারণে যদি পূর্ববর্তী সন্তানের সকল হক ঠিকমত পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং সে

---

[১] وَالرجُلُ رَاعٍ عَلَى اهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْل عَنْ رَعِيَتِهِ والامْرَاةُ رَاعِيَةٌ عَلَى اهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ আল–হাদীস

[২] ইয়াহইয়া নববী, শারহু সহীহ মুসলিম, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবি, বৈরুত, ১৩৯২ হিজরি, কিতাবুন নিকাহ

[৩] আল–গাযালী, ইহইয়াউ উলুম আল–দীন, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২৪

[৪] وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا আল–কুর'আন, ৪: ২৯

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের জীবন ও যথাযথ বৃদ্ধি হুমকিগ্রস্ত হয় – তেমন ক্ষেত্রে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য এবং স্বার্থ চিন্তা করে কেউ যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

ফাতওয়ায়ে আলমগিরীতে রয়েছে, "স্তন্যদানকারী মায়ের যদি গর্ভ দেখা দেয় এবং স্তনের দুধ শুকিয়ে যায় আর এতে স্তন্যপায়ী সন্তানের ক্ষতির আশংকা থাকে এবং ঐ সন্তানের পিতার পক্ষে অর্থ ব্যয় করে ধাত্রী নিয়োগ করা অসম্ভব হয় তাহলে গর্ভ বীর্য প্রাণহীন মাংসপিন্ডে পরিণত হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় মহিলার ঋতুস্রাব নিয়মিত করানোর জন্য চিকিৎসা করানো যাবে।[১]

ইমাম গাযালী (র) এ সম্পর্কে বলেছেন, "স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্য ও কর্মোচ্ছলতা যাতে স্থায়ী আনন্দের উৎস হয়, যেন দীর্ঘ জীবন ও যৌবন লাভ সম্ভব হয় এবং স্বাস্থ্যগত কারণে যেন স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আশঙ্কা তৈরি না হয় – এ উদ্দেশ্যে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে।

বাস্তবিক পক্ষে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম, রাসূলুল্লাহ (সা) এর গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা এবং সে অনুসারে ইসলামি চিন্তাবিদগণের নানা বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, স্বাস্থ্যগত কারণে জন্মনিরোধ বৈধ হবে, যদি–

ক) নতুন গর্ভধারণে স্তন্যপায়ী সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে;

খ) সন্তান প্রসবকালে মায়ের জীবন সংশয়াপন্ন হওয়ার আশংকা তৈরি হয়;

গ) কম বয়সে গর্ভ ধারণের কারণে কিশোরী মাতার সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে;

ঘ) শারীরিক দিক থেকে নারী এমন অসুস্থ্য হয় যে, গর্ভধারণে তার জীবন সঙ্কটাপন্ন হতে পারে;

ঙ) যার বার গর্ভধারণ মাকে জীবন সংশয়ে ঠেলে দেয়;

চ) দু সন্তানের জন্ম দানের মধ্যে স্বল্প বিরতি মা ও সন্তানকে স্বাস্থ্যগত হুমকিতে ঠেলে দেয় এবং সন্তানের হক প্রয়োজন অনুসারে আদায় না করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং

ছ) নতুন গর্ভধারণের মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে বংশগত কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি সংক্রমণের প্রবল আশঙ্কা থাকে।

উল্লিখিত অবস্থায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে মা যদি জন্মনিরোধের কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করেন, সে জন্য তিনি গুনাহগার হবেন না। কেননা এতে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অক্ষুন্ন রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনার ধর্মীয় দিক: ইসলাম কোনো ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি বা সীমাতিক্রমকে পছন্দ করেনি। এ কারণেই দান করার আদেশ যেমন দেয়া হয়েছে, তেমনি দান করে নিঃস্ব হওয়াকেও অভিনন্দিত করা হয়নি। দারিদ্র্যকে যেমন সমর্থন করা হয়নি, তেমনি সীমাহীন প্রাচুর্যকেও কাঙ্ক্ষিত অবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। সকল ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা দারিদ্র্য যেমন মানুষকে ধর্মচ্যুত করে তেমনি সীমাহীন ঐশ্বর্যও পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে। মানুষের এ বিপথগামিতার ক্ষেত্রে সম্পদের সাথে সাথে সন্তান–সন্ততিও তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে থাকে। মহান আল্লাহ এ কারণেই ঘোষণা করেন: "জেনে রেখ, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা বিশেষ।[২]

"হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ–সম্পদ এবং সন্তান–সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না রাখে।[৩]

তাই সন্তানের সংখ্যাগত কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে যদি তারা আল্লাহর স্মরণে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে, তাহলে নিতান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর বিধান অব্যাহত রাখার জন্য জন্মনিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আরো কিছু লক্ষ্যের কথাও বলা হয়ে থাকে। যেমন, যদি শত্রু এলাকায় জন্ম হলে সন্তানের ইসলাম বিচ্যুত হওয়ার বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা ধর্মীয় অবক্ষয়ের কারণে সন্তানের অবক্ষয়ের শিকার হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা থাকে তেমন ক্ষেত্রেও সন্তানের সংখ্যা সীমিত রাখার স্বার্থে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। আধুনিক ইসলামি আইনজ্ঞগণ এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়

---

[১] ফতওয়ায়ে আলমগিরী, ৪র্থ খন্ড, মাকতাবাত আল–মাজিদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৬ হিজরি, পৃ. ১১২

[২] وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ আল–কুর'আন, ৮: ২৮

[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ আল–কুর'আন, সূরা মুনাফিকূন: ৯

Dhaka University Institutional Repository

আযল প্রসঙ্গে হাদীসের একাধিক বর্ণনা রয়েছে। যেমন, "হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে আযল করতাম এবং তখন কুর'আন নাযিল হতো।[১]

জাবির (রা) সূত্রে একই ধারার আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে আযল করতাম। এ খবর তাঁর নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।[২]

আরো একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "আমরা আযল করতাম এবং তখন কুর'আন নাযিল হতো। সুফিয়ান উক্ত বর্ণনায় সাথে আরো যুক্ত করেছেন, "আযল যদি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে আল-কুর'আনে তা নিষেধ করা হতো।[৩]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, আযল সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসিত হলেন। তিনি বললেন, "সকল বীর্যেই সন্তান হয় না। যদি আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করতে চান, তবে কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারে না।[৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমার একটি দাসী আছে। আমি তার সাথে আযল করি। আল্লাহর নবী বললেন, এতে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা রদ হবে না। কিছুকাল পরেই লোকটি ফিরে এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা), যে দাসীটির বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করেছিলাম সে গর্ভবতী হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আমি কেবল আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।[৫]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জাবির (রা) বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে বলল, আমার একজন দাসী আছে সে আমাদের সেবা করে এবং আমাদের খেজুর বাগানে পানি দেয়। আমি তার সঙ্গে সঙ্গম করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক, তা আমি চাই না। আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা করো, তার সাথে আযল করতে পার। তবে যা নির্ধারিত হয়ে গেছে, তা অবশ্যই হবে। কিছুকাল পরে লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এলো এবং বলল, ঐ দাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে বলেছি, তার সম্বন্ধে যা পূর্বে নির্ধারিত হয়ে গেছে, তা তার জন্য ঘটবেই।[৬]

এ হাদীসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, আগন্তুক মহানবী (সা) এর নিকট আযল করার অনুমতি চাননি। বরং কীভাবে দাসীর গর্ভ সঞ্চার রোধ করা যায়, তার পরামর্শ চেয়েছেন। আর মহানবী (সা) নিজে থেকে বলেছেন, তুমি আযল করো। সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন, আযল করলেই গর্ভনিরোধ সফল হবেই এমন নাও হতে পারে। কেননা আল্লাহ যাদেরকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছেন, তাদের সৃষ্টি কখনোই কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

স্বাধীন স্ত্রীর সাথে আযল করার ব্যাপারে মহানবী (সা) স্ত্রীর অনুমতি নেয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করতে নিষেধ করেছেন।[৭]

ইসলামি নীতি দর্শনে কোনো হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহানবী (সা) হলেন আল্লাহ তা'আলা মনোনীত Authority. যদি মহানবী (সা) এর সমকালীন কোনো বিষয়ে তাঁর সাহাবী (রা) গণ কোনো মত বা ফয়সালা প্রকাশ করেন, তাহলে তা মহানবী (সা) এর ফায়সালার মতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। কেননা সাহাবী (রা) গণের উচ্চ মর্যাদা ও মর্তবা এবং স্বয়ং আল্লাহ তাঁদের

---

[১] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল নিকাহ

[২] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] প্রাগুক্ত عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَىْءٍ لَمْ يَسْتَطِعْهُ شَىْءٌ

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً هِىَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا فِى النَّخْلِ وَ اَنَا اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اِعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اِنَّهُ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا প্রাগুক্ত

[৭] عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ و عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نُهِىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلاَّ بِاِذْنِهَا আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪১১ হিজরি, আযল অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি নিজের সন্তুষ্টি ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যয় পোষণ করতে হবে যে, সাহাবী (রা) গণ মহানবী (সা) এর জীবদ্দশায় এমন কোনো কথা অবশ্যই বলেননি বা এমন কোনো কাজ অবশ্যই করেননি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেননি। কোনো ক্ষেত্রে কারো মাধ্যমে যদি অপছন্দনীয় কোনো কাজ করা হয়েও থাকে, সাথে সাথে কুর'আন বা হাদীসে তার সংশোধনী কিংবা হিদায়াত চলে এসেছে। নবী (সা) এর সমকালীন কোনো বিষয়ে কোনো সাহাবী কিংবা সাহাবীগণ যদি এমনভাবে উল্লেখ করেন যে, নবী (সা)ও বিষয়টি জানতেন, কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি, তাহলে তা তো তাকরীরি হাদীসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তাই ইসলামি হুকুম-আহকাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাকরীরি হাদীস যেমন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, আযলের ক্ষেত্রেও তা না হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাই আযলকে বৈধ এবং ইসলাম সম্মত মনে করাই যথার্থ।[১] ইমাম তাহাবী, ইবনে কাইয়েম, ইমাম গাযালী (র) এর মত বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদগণ এ কারণেই উল্লিখিত হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, ইসলামে আযল নিষিদ্ধ বা অবৈধ কোনো পদ্ধতি নয়।

অবশ্য আযলকে 'আল-ওয়াদ আল-খফী' বা গুপ্ত শিশু হত্যা হিসেবে ব্যাখ্যা করার একটা বিভ্রান্তকর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই বিভ্রান্তির উৎস জুদামা বিনতে ওহাব (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আমি গায়লা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সহবাস করা প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। এরপর আমি রোমান ও পারস্যবাসীদের সম্পর্কে চিন্তা করলাম এবং জানলাম, তাদের গর্ভবতী মায়েরাও সন্তানদের স্তন্য দান করতো। এতে তাদের কোনো ক্ষতি হতো না। এরপর সাহাবী (রা)গণ রাসূল (সা)কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এটা হলো গুপ্ত শিশু হত্যা।[২]

অভিন্নসূত্রে হাদীসখানি ইমাম মালিক, ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইমাম ইবনে মাযাহ (র) স্ব স্ব হাদীস সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করলেও হাদীসের 'আযল' সংক্রান্ত শেষ অংশটুকুর বর্ণনা তাদের গ্রন্থে নেই। তাছাড়া আযল যে গুপ্ত শিশু হত্যা নয়, সে সম্পর্কে পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ (সা) সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন, ইবনে ছাওবান ও জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আযল করতাম। কিন্তু ইহুদিরা দাবি করছে, এটা শিশু হত্যা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "ইহুদিরা মিথ্যা বলছে। যদি আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, কেউ-ই তা রোধ করতে পারে না।[৩]

এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত ওবায়েদ ইবনে আবূ রিফা আনসারী বর্ণনা করেছেন। কয়েকজন সাহাবী হযরত উমর (রা) এর সামনে আযল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তারা মতবিরোধ করছিলেন। উমর (রা) তাদেরকে বললেন: তোমরা কি এ বিষয়ে মতবিরোধ করছো, অথচ তোমরা হলে এমন সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছো। (তোমরাই যদি মতবিরোধ কর) তাহলে তোমাদের পরে যারা আসবে, তারা কী করবে? উমর (রা) তাদের যুক্তি শুনতে চাইলেন। একজন বলল, ইহুদিরা দাবি করে, আযল ক্ষুদ্র শিশু হত্যা। হযরত আলী (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আযল শিশু হত্যা হতে পারে না। ভ্রূণ বৃদ্ধির সাতটি স্তর অতিক্রম করার আগে শিশু হত্যা হয় না। প্রথমত তরল মাটি বা বীর্য, দ্বিতীয়ত আলাক বা জমাট রক্ত, তৃতীয়ত মুদগা বা ভ্রূণপিন্ড, চতুর্থত অস্থি, পঞ্চমত গোশত দিয়ে আচ্ছাদান, ষষ্ঠত, হাড় স্থাপন এবং সপ্তমত পরবর্তী স্তরের সৃষ্টি।' হযরত উমর (রা) আলী (রা)কে বললেন, তুমি যথার্থই বলেছ। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন।[৪]

বীর্য থেকে শিশুতে রূপান্তরের এই পর্যায়গুলো মহান আল্লাহই কুর'আন মজীদে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন, আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করি; এরপর তাকে আমি বীর্যরূপে একটি সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি; পরে আমি বীর্যকে

---

[১] ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার, দারুল হাদীস কায়রো, মিশর, ১৯৯৩, ৫ম খন্ড, পৃ.১৯৭

[২] ذَالِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[৩] عَنْ اِبْنِ ثَوْبَان عَنْ جَابِر قَالَا: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صلعم كُنَّا نَعْزِلُ فَزَعَمَتِ الْيَهُوْدُ اِنَّهَا الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ - اِنَّ اللهَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ شَيْءٌ আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

[৪] আল্লামা আন্দালুসী, আল-ইসতিজকার, ১৮ খন্ড, পৃ.২০৮-২০৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত করি জমাট রক্তে, এরপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, এরপর মাংসপিণ্ডে সৃষ্টি করি হাড় এবং পরে হাড়কে গোশত দিয়ে ঢেকে দেই। সবশেষে তাকে নতুন একটি সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। তাহলে সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান![১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা) এবং তাঁর প্রধান দু শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে, স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে আযল বৈধ।[২]

ইমাম মালিক (র) সহ মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন, গর্ভনিরোধের পদ্ধতি হিসেবে আযল বৈধ। তবে যোনীতে বীর্যপাত স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার। যদি তিনি দাবি করেন, তাহলে তাকে এ অধিকার বা আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার জন্য স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৩]

আযল সম্পর্কে শাফিঈ মাযহাবের মত হলো, আযল বৈধ এবং তা স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াও বৈধ। এর মধ্যে যদি অপছন্দনীয় কিছু থেকেও থাকে, তা মাকরূহ তানযিহী বা তুচ্ছ ও ক্ষমাযোগ্য। ফিকহী পরিভাষায় শাফিঈ মাযহাবে যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে মাকরূহ তানযিহী পরিভাষা ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, এটা অতি উত্তম আচরণ থেকে একটু নিম্ন স্তরের আচরণ। হাম্বলী মাযহাবেও সাধারণভাবে আযলকে বৈধ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বর্তমানে গর্ভনিরোধের জন্য অনেক আধুনিক উপকরণ তৈরি হয়েছে। কনডম, পিল, লাইগেশন, অপারেশন, ইনজেকশন ইত্যাদি উপকরণগুলো যথাসম্ভব সহজলভ্য করা হয়েছে। মানুষ যেন এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে সে জন্য নানা রকম বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, লক্ষ্যগত কারণে এই প্রচারণা ও প্রক্রিয়াকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। যেমন, এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে বিলবোর্ডে বিশেষভাবে যে শ্লোগানগুলো থাকে, তা হলো, স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে বিশ্বস্তঃ থাকুন। অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে এইডস হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা স্ত্রী এইডস আক্রান্ত নন। পরের শ্লোগানটি হলো, প্রতিবার মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করুন। স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় কনডম ব্যবহারের কথা বলা না হলেও পরে প্রতিবার মিলনে কনডম ব্যবহারের কথা বলা হলো। মূলত এখানে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে। বস্তুত এভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যভিচার বিস্তারে ভয়ানক ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া সামগ্রীগুলো ব্যবহারের নেপথ্যে কারণ হিসেবে ইসলাম যে কারণগুলোর কথা বলে সেগুলো মোটেই বলা হচ্ছে না। এমতবস্থায় মুসলিম উম্মাহ কী করবে?

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মা ও শিশুর যে কোনো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং নীতি স্বার্থে মুসলিম স্বামী-স্ত্রীও গর্ভনিরোধের লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণসমূহ ব্যবহার করতে পারবেন। বিধর্মীরা আবিষ্কার করেছে বলেই অথবা খারাপ নিয়্যতে আবিষ্কার করা হয়েছে বলেই যে সেটার ভালো ব্যবহার সম্ভব নয়, তা কিন্তু না। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অমুসলিমদের দ্বারা হলেও মুসলিমগণ কিন্তু তার মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। ইন্টারনেট, কম্পিউটার, বিমান, মোটর গাড়ি, জাহাযসহ অধিকাংশ যোগাযোগ ও পরিবহন মাধ্যমের আবিষ্কারক অমুসলিমগণ। নিজেদের কল্যাণের স্বার্থেই মুসলিম উম্মাহ কিন্তু তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকছেন না। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তবে কে কী নিয়্যতে এগুলো ব্যবহার করছে, তা বিবেচনার ভার মহান আল্লাহ তা'আলার।

আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি, ইসলাম সর্বোতভাবে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়। মানুষের জীবনকে হুমকিগ্রস্ত করা বা ঝুঁকির মধ্যে রাখা ইসলামের নীতি নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই নীতিটি অনুসরণ করাই হবে সঙ্গত। তাহলেই অনেক প্রশ্নের জবাব সাধারণ মানুষও বের করে ফেলতে পারবেন।

---

[১] وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ – আল-কুর'আন, সূরা মুমিনূন: ১২-১৪

[২] আল-খাওয়ারিযমী, জামী মাসানিদ আল-ইমাম আযম, ২য় খন্ড, পৃ.১১৮-১৯

[৩] ইমাম মালিক, মুয়াত্তা, পূর্বোক্ত, কিতাবুন নিকাহ

Dhaka University Institutional Repository

আগেই প্রমাণ হয়েছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা এ দেশের জন্য একটি ভয়ানক সামাজিক সমস্যা। এর কারণ এটা নয় যে, তারা সংখ্যায় অনেক বেশি। বরং এর কারণ হলো বাংলাদেশের জনগণ দেশের জন্য বোঝা। এর অদক্ষ, নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত। এদের অনেকের (৬২%) প্রথাসিদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকলেও অধিকাংশই কেরানী বা আমলা হওয়ার উপযোগী। দেশকে উন্নয়নে বা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তাদের কোনো কর্মকৌশল বা কর্মদক্ষতা নেই। সুতরাং দেশকে জনসংখ্যার এ সমস্যা থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যেককে সুশিক্ষিত করা। সুদক্ষ করা। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রেরণা দিয়ে কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা। তাহলে জনসংখ্যার আকার নিয়ে কাউকেই ভাবিত হতে হবে না। এ কাজ সফল করে তুলতে ইসলাম পরিকল্পিত জীবন গঠনের যে দর্শন পেশ করেছে তার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, সমস্যা আর থাকবে না। তাহলে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের নিজেদের বোধ, বিবেক ও সামর্থ দিয়ে নিজ নিজ করণীয় নির্ধারণ করে নিতে পারবেন। ফলে জনসংখ্যা আকার যা-ই হোক, তা দেশের সমস্যার পরিবর্তে সম্পদে পরিণত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

সন্ত্রাস সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস সমস্যা

সাম্প্রতিক বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ানক মরণব্যাধি হলো সন্ত্রাস। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সন্ত্রাসের। বাংলাদেশও সন্ত্রাসের কালো থাবা থেকে রেহাই পায়নি। এ দেশের সকল পেশার সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে আজ সন্ত্রাসের কাছে বন্দী। সন্ত্রাসের কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে, শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে অদ্যাবধি দেশে বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সন্ত্রাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সন্ত্রাসের চেয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেই মানুষ অধিক ভোগান্তির শিকার হয়েছে। দেশের প্রতিজন সচেতন নাগরিক এ অবস্থার অবসানের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেই স্বভাবগতভাবে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন সন্ত্রাসের। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ত্রাস নির্মূল হচ্ছে না। এর কারণ কী? কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের এই দেশে সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু হলেও ইসলামি বিধান অনুসারে সন্ত্রাস নির্মূলের কোনো পদক্ষেপ তেমনভাবে কখনোই গ্রহণ করা হয়নি। এ অধ্যায়ে সন্ত্রাস কবলিত বাংলাদেশকে ইসলামি বিধানের আলোকে কীভাবে সন্ত্রাস মুক্ত করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সন্ত্রাসের সংজ্ঞা

সন্ত্রাস হলো কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা; অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি। সন্ত্রাসবাদ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান নীতি।[১] a feeling of extreme fear; a feeling of sheer/pure terror. a person, situation or thing that makes you very afraid. violent action or the threat of violent action that is intended to cause fear, usually for political purposes. terrorism – the use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act.[২] ইহরাব' বা কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা।[৩]

যে কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বা বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করাই সন্ত্রাস। যে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল বা তদানুযায়ী কাজ করে সে হলো সন্ত্রাসবাদী।[৪] কতো যে এর রূপ, নারী পাচারকারী, শিশু-কিশোর অপহরণকারী, জিম্মিকারী অবশেষে হত্যাকারী। .....নারী, শিশু-কিশোর অপহরণ, জিম্মিরূপে রাখা, মুক্তিপণ আদায়ে নানান ফন্দি-ফিকির করা, ধর্ষণ করা এবং শেষতক হত্যা করা।[৫]

১৯৯৮ সালে এপ্রিল মাসে আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, "সন্ত্রাস হলো ব্যক্তি বা সামষ্টিক অপরাধ মনোবৃত্তি হতে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, যে প্ররোচনা বা লক্ষ্যেই তা হোক না কেনো, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্টে ফেলার হুমকি দেয়া হয় বা তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখোমুখি করা হয় অথবা প্রাইভেট বা সরকারি সম্পত্তি ছিনতাই করা, দখল করা, নষ্ট করা হয় অথবা কোনো রাষ্ট্রীয় উৎস ধ্বংসের মুখে ফেলা হয়।[৬]

---

[১] ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১৩

[২] ibid, p.1342

[৩] মু'জামুল ওয়াসিত নাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, আল-ইদারাতুল 'আম্মাহ লিল মু'জামাত ও ইহয়ায়ুত তুরাস, দারুল ইলম, দিল্লী, তা.বি. পৃ.৩৭৬

[৪] সংসদ বাঙ্গলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ.৬৬১

[৫] সিরাজ কাজী, শিশু, কিশোর, নারী অপহরণ, ধর্ষণ খুন ও ভায়োলেন্স প্রবণ প্রাজ্ঞজন, সাপ্তাহিক উষা, ৪র্থ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ঢাকা ২০০২, পৃ.২০

[৬] মাহমুদুল হাসান, সন্ত্রাস নয় শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অন্বেষা, দৈনিক ইনকিলাব, ৮ আগস্ট ২০০২, ঢাকা, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন মজীদে সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ পরিভাষা হিসেবে ফিৎনা ও ফাসাদ[১] শব্দ দুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফিতনা বলতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সন্ত্রাস, গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, ধর্মীয় নির্যাতন, শিরক, কুফর, নিফাক, প্রলোভন, পরীক্ষা ইত্যাদি সবই বুঝানো হয়েছে।[২] আর ফাসাদ হলো বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি। তাই দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লড়াই, ঝগড়া এবং এমন কাজ হলো ফিৎনা-ফাসাদ যাতে মানুষের সামাজিক শান্তি নষ্ট হয়। তারা শান্তি, সৌহার্দ ও সুখে বাস করতে পারে না।

বিস্তারিতভাবে বললে, অন্যায় কোনো কাজ সম্পাদন বা অবৈধ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পেশি, লেখনী, মেধা, রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে যে কোনো ভাবে চাপ প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকারে বাধ্য করানোর প্রথা ও পদ্ধতিই সন্ত্রাস। এর সহজ ও সাধারণ প্রকাশ পেশিশক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে। সন্ত্রাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। মানুষের সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ব্যাহত হয়। এই বিশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত অবস্থাই সন্ত্রাস বা ফিৎনা-ফাসাদ।

সন্ত্রাস ও জিহাদ

বর্তমান বিশ্বের ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংস্থা তাদের প্রচার মাধ্যমের জোরে সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ এবং মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসীর সমর্থক হিসেবে প্রচারের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তারা জিহাদের অর্থ বিকৃতভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। যারা জিহাদের কথা বলছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছে তাদেরকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা দেশ ও সংস্থাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। অথচ জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদিতার দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। বরং জিহাদের সম্পর্ক শান্তির সাথে। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্যই জিহাদ করা হয়। কুর'আন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে জিহাদের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহ পথে জিহাদ করো, যেভাবে তাঁর পথে জিহাদ করা উচিত।[৩]

অপর আয়াতে তিনি বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার উপায় অন্বেষণ করো ও তাঁর পথে জিহাদ কর; যাতে তোমরা সফল হতে পার।[৪] তিনি আরো বলেন, "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।[৫]

কাফিরদের সাথে সম্মুখ সমরের বা যুদ্ধের যে বিবরণ বা নির্দেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন তাতে জিহাদ শব্দের পরিবর্তে কিতাল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। যেমন, "আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা মুশরিকদের সাথে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের সাথে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ করে। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।[৭]

বস্তুত জিহাদ হলো ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ইসলাম সম্মত যে কোনো ধরনের কর্মপ্রচেষ্টা। যুদ্ধ এর সর্বশেষ স্তর। ইসলামি নীতি ও দর্শন অনুসারে এ যুদ্ধও আক্রমণাত্মক হবে না। বরং যুদ্ধ হবে আত্মরক্ষামূলক বা রক্ষণাত্মক। আক্রান্ত

---

[১] আল-কুর'আন, ২: ১১ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ আল-কুর'আন, ২:১৯১

[২] প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, তানভীরুল কুর'আন, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

[৩] وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ কুর'আন, সূরা হজ: ৭৮

[৪] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল-কুর'আন, ৫: ৩৫

[৫] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ আল-কুর'আন, ৯: ৭৩

[৬] وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ আল-কুর'আন, ২: ১৯০

[৭] وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ আল-কুর'আন, ৯: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

হলেই কিংবা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলেই কেবল মুসলিমগণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সর্বশেষ মাধ্যম হিসেবে যুদ্ধকে ব্যবহার করবে এবং কুরআনী ঘোষণা অনুসারে সে ক্ষেত্রেও কোনো রকমের সীমালংঘন করা যাবে না।

ইসলামি জীবন-দর্শন, আদর্শ ও নীতিমালায় জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ একটি বিষয়। সাধারণভাবে জিহাদ বলতে যুদ্ধ বুঝানোর যে প্রক্রিয়া তার সুবিধা নিয়েই ইসলাম বিরোধীরা জিহাদের সাথে সন্ত্রাসকে গুলিয়ে ফেলার অবিমৃষ্যকারিতা প্রদর্শন করেছেন। সত্যিকারার্থে জিহাদ মোটেই যুদ্ধকে বুঝায় না। শাব্দিক বিবেচনায় জিহাদ অর্থ চেষ্টা করা, শক্তি ব্যয় করা, সংগ্রাম করা, কঠোর পরিশ্রম করা, সর্বশক্তি নিয়োগ করা, সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা পরিচালনা, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করা ইত্যাদি।[১] ইসলামি পরিভাষায়, ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এবং ইসলামের অনুকূলে যে কোনো পর্যায়ে শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয়কে জিহাদ বলা যায়।[২] মূলত জিহাদ হলো ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান, সম্পদ, মেধা, ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও জীবন নিয়োজিত করা। ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে চেষ্টাই করা হোক তাকে জিহাদ বলা যাবে।[৩] সুতরাং ইসলামের জন্য নির্যাতন সহ্য করা, অপমানিত হওয়া, ইসলামের পক্ষে প্রয়োজনীয় লেখালেখি বা জ্ঞান-গবেষণা করা, ইসলামের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রচারে ব্যস্ত থাকা এবং চূড়ান্ত মুহূর্তে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া জিহাদেরই বিভিন্ন পর্যায়। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রামকেই প্রকৃতার্থে জিহাদ বলা যায়।

বর্তমান সময়ে বিশ্বের কোথাও মুসলিমরা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় থাকার মতো ক্ষমতায় নেই। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম দেশে এবং প্রতিটি অমুসলিম দেশে সৎ মুসলিমগণ নানাভাবে নিপীড়িত হচ্ছেন। সর্বত্র তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। মুসলিম নামধারী কেউ কোথাও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালালে পশ্চিমা গোষ্ঠী ও ইসলাম বিরোধীরা তাকে অবধারিতভাবে ইসলামের সন্ত্রাস হিসেবে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা করে। অথচ হিটলার যখন ষাট হাজার ইহুদিকে কেবল জাতিগত বিদ্বেষের কারণে গ্যাস চেম্বারে দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে[৪] কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নামে ভারতের গুজরাটে রাষ্ট্রপক্ষের প্রত্যক্ষ মদদে অসংখ্য মুসলিমকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়[৫] তখন তো সে জন্য খ্রিস্টান ধর্ম বা সনাতন ধর্মকে সন্ত্রাসী হিসেবে দায়ী করা হয় না। এর কারণ বিশ্বের প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলোর আদর্শিক শূন্যতা এবং তা পূরণে ইসলামের বিকল্পহীনতা। বর্তমান বিশ্বে মানবিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় হয়েছে, দেশে দেশে অশান্তির যে তীব্র হুতাশন প্রজ্জ্বলিত রয়েছে - তার একটাই নিরাময়, ইসলাম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ইসলাম যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বিশ্বের সাধারণ মানুষ শান্তিতে থাকলেও কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার আর স্বৈরাচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। ভোগবাদীদের অবাধ ভোগাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। চরিত্রহীনদের অবাধ ও উন্মাদ যৌনাচার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এই ভয়ে ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে। আর আদর্শিক দেউলিয়াত্বের কারণে ইসলামকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করার ক্ষমতা নেই বলেই তারা মিথ্যাচার-অপপ্রচার ও অর্থহীন অভিযোগ উত্থাপনের বালখিল্যতা প্রদর্শন করছে।

---

[১] রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারায়িবিল আল-কুর'আন, মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, কায়রো ১৩২৪ হি পৃ.২৬৫

[২] মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুর'আনে রাষ্ট্র ও সমকাল, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬, পৃ.৭৩

[৩] "Jihad in its trust and purest form, the form to which all Muslims aspire, is the determination to do right, to do justice even against your own interests. It is an individual struggle for personal moral behavior. Especially today it is a struggle that exists on many levels; self-purification and awareness. Public service and social justice, on a global scale, It is a struggle involving people of all ages, colors and creeds, for control of the big decisions; not oily who controls what piece of land, but more importantly who gets medicine and who can eat."- Jaeed Eiasin, Of Faith and Citizenship : My American Jihad, Graduation Ceremony Speech, Harvard University, U.S.A 6 June 2002

[৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই ঘটনা ঘটে। (দ্রষ্টব্য: R. K. Marsh, World War & USA, New York 1997, p.65)

[৫] ২০০৬ সালে এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, এই দাঙ্গায় মুসলিম নিধনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো। (দ্রষ্টব্য: খুশবন্ত সিং, দিল্লীর চিঠি, প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০০৬, পৃ.১০)

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসের কুফল

সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে ফিৎনা–ফাসাদ ও সন্ত্রাসের কুফল সর্বাধিক। এ সামাজিক সমস্যাটি সরাসরি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বলে এর কুপ্রভাব মানব জীবনকে বেশি বিপর্যস্ত করে। মানুষের বেঁচে থাকাকে অনিশ্চিত ও যন্ত্রণাময় করে ফিৎনা ফাসাদ সন্ত্রাস সমাজে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মহাস্রোত প্রবাহিত করে। এখানে এর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আলোচানা করা হলো।

শান্তি বিনষ্ট: ফিৎনা ফাসাদ বা সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্যই থাকে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা। সুশৃঙ্খল ও সুখী জীবনযাপন ব্যাহত করা। সে কারণে ফিৎনা ফাসাদ ও সন্ত্রাসের ফলে সামাজিক শান্তি নষ্ট হয়। জীবন থেকে স্বস্তিঃ ও আনন্দ দূর হয়ে যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত শংকায় সবসময় মন আচ্ছন্ন থাকে। চিরকাঙ্ক্ষিত শান্তি স্থায়ীভাবে জীবন থেকে বিদায় নেয়।[১]

নিরাপত্তাহীনতা: ফিৎনা ফাসাদ ও সন্ত্রাস কবলিত জনপদে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। যখন তখন যে কেউ অপমৃত্যুর শিকার হতে পারে। কিংবা আহত হতে পারে। ফিৎনা ও সন্ত্রাসের কারণে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা থাকে না। সম্ভ্রমের নিরাপত্তা থাকে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে। বিনাদ্বিধায় ভূলুণ্ঠিত করতে পারে মানুষের ইজ্জত ও সম্মান। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ ধরনের নিরাপত্তাহীনতা ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করে।[২]

শত্রুতা বৃদ্ধি: ফিৎনা ফাসাদ ও সন্ত্রাসে মানুষের পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার জায়গা দখল করে নেয় শত্রুতা। পারস্পরিক বিদ্বেষ বেড়ে যায়। যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বেড়ায় তার সাথে সন্ত্রাসের শিকার লোকজন এবং যারা শিকার নয় তাদেরও কোনো সুসম্পর্ক থাকে না। শত্রুতা ও বিদ্বেষ সমাজকে মানুষবাসের অনুপযোগী করে তোলে।

সন্ত্রাস বৃদ্ধি: ফিৎনা ফাসাদ ও সন্ত্রাস আরো নতুন নতুন সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। যারা সন্ত্রাসের শিকার হয় প্রথমত তারা আইনের আশ্রয় নেয়। কিন্তু ব্যাপক ফিৎনা ফাসাদ ও সন্ত্রাসের জন্যে আইনের পক্ষ থেকে সঠিক রায় পায় না। বরং আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্যে তারা দ্বিতীয় দফা আক্রমণের শিকার হয়। এভাবে আক্রান্ত লোক যেমন নতুনভাবে সন্ত্রাসের শিকার হতে পারে তেমনি আক্রান্ত লোকেরাও কোনো বিচার না পেয়ে আইন হাতে তুলে নিতে পারে। যা নতুনভাবে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।[৩]

জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত: ফিৎনা ফাসাদ ও সন্ত্রাসের কারণে ব্যবসায় বাণিজ্য ঠিকমতো করা যায় না। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা যায় না। অফিস আদালতে কাজ হয় না। সড়ক, সেঁতু, মিল, কারখানা ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ বাধাগ্রস্ত হয়। সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসের সুবাদে দুর্নীতি দানা বাধে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।[৪]

শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে: বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রস্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে চলতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। শিশু, কিশোর ও দেশের ভবিষ্যত দিনের পরিচালক ছাত্রদের শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়ে।[৫]

ধর্মীয় ক্ষতি: ফিৎনা, ফাসাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি অত্যন্ত জঘন্য ধরনের হারাম কাজ। এর ফলে আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করা হয়। আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেওয়া হয়। মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে ফিৎনা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা জাহান্নামে নিজেদের বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। ফলে দুনিয়ায় অশান্তির পাশাপাশি সন্ত্রাস আখিরাতেও সমূহ ক্ষতির কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

ঘৃণা লাভ: সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের তাদের অন্যায় শক্তির কারণে সাধারণ মানুষ তাদেরকে ভয় পায়, সমীহ করে; কিন্তু ভালোবাসে না। মনের সবটুকু বোধ দিয়ে তাদেরকে ঘৃণা করে। কোনো বিবেকবান সুস্থবুদ্ধির মানুষ তাদের সাথে সম্পর্কও রাখে না। ফলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘৃণা লাভের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়।

---

[১] অধ্যাপক সিরাজুল হক, সন্ত্রাস ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, আগামী প্রকাশন, ঢাকা ২০০৩, পৃ.৩২
[২] প্রাগুক্ত
[৩] ড. শাহরিয়ার কবির, সন্ত্রাসের বিষে নীলকণ্ঠ দেশ, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ১ মে ২০০৬, পৃ.২৭
[৪] হাসান রফিক, আমাদের জন্যে অর্থনীতি ও সন্ত্রাস, সাপ্তাহিক রোববার, ১৪ আগস্ট ২০০৬, পৃ.৩৪
[৫] ড. আহমেদ মতিউর রহমান, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সঙ্কট, ঢাকা ২০০৭, পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণসমূহ

বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো লোকদের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া। কারণ ইসলামহীনতা সন্ত্রাসের জনক। সমাজে যথাযথ ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকলে সন্ত্রাস থাকতে পারে না। কোথাও যদি সন্ত্রাস থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে ইসলাম নেই। এ ছাড়া আরো কিছু কারণ সন্ত্রাস সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। যেমন,

১। **দরিদ্রতা:** বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণগুলোর মধ্যে দরিদ্রতা অন্যতম। অর্থ সম্পদের তীব্র অভাব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মরিয়া করে তোলে। তারা জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের ন্যূনতম প্রত্যাশায় ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। ফলে সন্ত্রাস জন্ম নেয়।

২। **বেকারত্ব:** বাংলাদেশে বেকারত্বের জন্য অনেক রকমের সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য শ্রমশক্তি কাজ না পেয়ে হতাশার কারণে নিজেদের চাহিদা পুরণের জন্য ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণ ইত্যাদি কাজ করে।

৩। **মাদকাসক্তি ও মাদক ব্যবসায়:** মাদকাসক্তরা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে সন্ত্রাসী কাজ করে। আবার মাদকের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় এতে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবসায়ীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

৪। **নৈতিক অবক্ষয়:** বাংলাদেশে ব্যক্তির নীতিহীনতা, ব্যভিচার, লোভী মানসিকতা সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি করে। এতে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ায় পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

৫। **ক্ষমতায় অশুভ বাসনা:** বাংলাদেশে ক্ষমতা দখলের অশুভ বাসনায় বারবার রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষমতাসীনরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে রাজপথে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কর্মীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারার[১] পৈচাশিকতার নেপথ্যে এ অশুভ বাসনাই সক্রিয় ছিলো।

৬। **আইন প্রয়োগে শৈথিল্য ও অপপ্রয়োগ:** কড়াকড়িভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ হয় না; কখনো কখনো করা হলেও তার শিকার হয় নিরপরাধ মানুষ। ফলে অপরাধীরা আরো অপরাধ করে আর সাধারণ মানুষ অপরাধী হওয়ার প্রেরণা পায়।[২]

৭। **অপসংস্কৃতির বিভীষিকা:** নগ্নতা ও অশ্লীলতানির্ভর নৈতিক চেতনা বিরুদ্ধ চলচ্চিত্র ও অবাধ আকাশ সংস্কৃতি সর্বসাধারণ্যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। চলচ্চিত্রের হত্যাযজ্ঞ প্রায়ই বাস্তবে অনূদিত হতে দেখা যায়।

৮। **ন্যায়বিচারের অভাব:** সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার না পাওয়ায় আইনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এক সময় নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেয়। আর সন্ত্রাসীরা বিচার না হওয়ায় আরো সন্ত্রাস করার সাহস পায়।[৩]

৯। **প্রশাসনিক দুর্নীতি:** আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও প্রশাসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে। সর্বস্তরের দুর্নীতির কারণে সন্ত্রাসী সহজেই অর্থ-বিত্ত-প্রভাব খাটিয়ে অধিকতর সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৪]

১০। **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের নীতিহীনতা, ক্ষমতালিপ্সা, পরমত অসহিষ্ণুতা সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় কারণ। জবরদস্তি হরতাল, চাপিয়ে দেয়া ধর্মঘট, দলাদলি, নেতৃত্বের কোন্দল ইত্যাদি নানা কারণ সন্ত্রাসের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।[৫]

১১। **নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাব:** অপরিকল্পিত ও ব্যাপক নগরায়ন এবং শিল্পায়ন একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন কেড়ে নিয়ে ভালোবাসাহীন যান্ত্রিকতা সৃষ্টি করেছে। যা সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে।

১২। **সামাজিক ঐক্যের অভাব:** নিজস্ব স্বার্থ ও ক্ষুদ্র নিরাপত্তা চিন্তায় সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসের মুকাবিলা করে না বলে সন্ত্রাস বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে সামাজিক ঐক্যের ভীষণ অভাব লক্ষ্য করা যায়।[৬]

---

[১] ২৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে ঢাকার পুরানা পল্টনে প্রতিপক্ষের সমর্থক-কর্মীদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার পর নিহত ব্যক্তির লাশের উপর দাঁড়িয়ে অমানবিক উল্লাস করতে দেখা যায় হত্যাকারীদের। (দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আমার দেশ, প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০০৬, পৃ.১)

[২] অধ্যাপক সিরাজুল হক, পৃ.৩৭

[৩] ড. শাহরিয়ার কবির, পৃ.২৮

[৪] হাসান রফিক, পৃ.৪০

[৫] ড. আহমেদ মতিউর রহমান, ৪৩

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

Dhaka University Institutional Repository

১৩। **অস্ত্রের সহজলভ্যতা:** আধুনিক অস্ত্রের সহজলভ্যতা ও সাধারণ ব্যবহার সন্ত্রাসের একটি কারণ। অস্ত্রধারী গ্রেফতার না হওয়া, প্রয়োজনীয় শাস্তি না পাওয়া বরং সর্বত্র সমীহ পাওয়ার কারণে সন্ত্রাসের ধারা আরো বেগবান হয়।

১৪। **অবৈধ উপার্জন:** চাঁদাবাজি বাংলাদেশে বিপুল অর্থ অবৈধভাবে উপার্জনের সর্বপ্রধান উৎস। চাঁদাবাজির জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়। আবার চাঁদাবাজির অধিকার কোন পক্ষ লাভ করবে তা নিয়ে চাঁদাবাজদের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ ঘটে থাকে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

সন্ত্রাসবাদ মূলোৎপাটন করে মানব সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া, মায়া এবং দরদ ও ভালোবাসার শিক্ষা দেয় ইসলাম। সেই সাথে দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়, যুলম, নিপীড়ন, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতাকে পদদলিত করে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব উপহার দেয়া ইসলামের মূল শিক্ষা।

নিজের শান্তি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অভিষ্ট লক্ষ্য। এ জন্য ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিবদমান শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি সত্তাকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সাহায্যে আত্মশৃঙ্খলা অর্জনকেই যথার্থ ইসলাম হিসেবে গণ্য করা হয়।[১]

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা) প্রচারিত দীন। দীন হিসেবে ইসলামের মৌলনীতি আল্লাহর একত্ব। এর অনুসারীগণ হলেন মুসলিম। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই ইসলাম। ইসলাম তাই শান্তির পথে অনুপ্রবেশ আর মুসলিম হলো আল্লাহ ও মানবাত্মার সাথে শান্তি স্থাপন। মানবাত্মার সাথে শান্তি স্থাপন অর্থ মানুষের জন্য সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় হতে বিরত থাকা। আল্লাহ বলেন, "হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২]

আল্লাহর একত্ব ও মানবজাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের এই দুই মৌলিক বিধান ইসলামের শান্তির কথা প্রমাণ করে। শান্তিই হলো মূলমন্ত্র। কারণ এই শান্তির পথেই ইসলামের উদ্ভব এবং শান্তিই এর শেষ ফল। ইসলাম মূলত তাই শান্তিরই ধর্ম। মানুষকে অধিকতর সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা ইসলামের মূল লক্ষ্য। 'প্রকৃতির সব কিছুর মত মানুষের মধ্যে নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ তার মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। মানুষের মধ্যে মানবিক বৃত্তির পূর্ণতা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে এবং এই পূর্ণাঙ্গতা তার মুক্তি লাভে সাহায্য করে।[৩]

ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখে না বা তার উপর জোর-যুলম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজের সত্তার স্বাভাবিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।[৪]

ইসলামে জাতিগত প্রাধান্য নেই; গোত্র, বর্ণ, সামাজিক পদমর্যাদা ও পেশার ক্ষেত্রেও ইসলাম কোনো প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে প্রভেদ থাকতে পারে কিন্তু তারা সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই তাদের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। ইসলামি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে ভাষাগত পার্থক্য, ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা কোনো অন্তরায় নয়। ইসলাম বর্তমান বিশ্বের বর্ণবাদী, স্বদেশহিতৈষী ও জাতীয়তাবাদীভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, আদর্শবাদী ও আন্তর্জাতিক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে তৎপর। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক জন্মসূত্রে নয় বরং নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতেই। জন্মসূত্রে মার্কিন বা আফ্রিকান, যোগসূত্রে ইহুদি বা

---

[১] Syedur Rahman, An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, Dacca 1963, p.24

[২] আল-কুর'আন, ২: ১১২

[৩] কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ.৫

[৪] Abul Hashim, The Creed of Islam, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka 1987, p.21

Dhaka University Institutional Repository

আর্য, বর্ণসূত্রে কৃষ্ণ বা শ্বেতকায় এবং ভাষাসূত্রে ভারতীয় বা আরবীয় যাই হোক না কেনো আল্লাহকে যিনি প্রভূ হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং মহানবী (সা)এর নির্দেশসমূহকে জীবনের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তিনিই এ সমাজ ব্যবস্থায় শরীক হতে পারেন। এই সমাজে অংশগ্রহণকারী সকলে একই অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার। কোনো রকম বর্ণ বা জাতিগত ভেদাভেদের শিকার কেউ হবে না। উঁচু-নিচু বলে কেউ গণ্য হবে না। ধরা ছোঁয়ার বাইরে এমন কারো অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না।[১]

পেশাগত বৈষম্যও তাদের মধ্যে ছিলো। মূর্তিদের তত্ত্বাবধায়ক তথা পুরোহিতগণ ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান। তাই তারা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন। মজুর শ্রেণীর মানুষকে তারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে ঘৃণার চোখে দেখতেন। সন্ত্রাসী কার্যকালাপে তারা এতটাই উন্মত্ত ছিলো যে, যৎসামান্য উত্তেজনার বশে ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাত। তাদের নারীরা ছিলো তাদের অস্থাবর সম্পত্তি। বিশেষত ক্রীতদাসের সাথে এমনভাবে ব্যবহার করা হতো যেন তারা ভারবাহী পশু। পশুর উপর অত্যাচার বর্তমানে মানুষের মনে যে পরিমাণ অনুকম্পা জাগিয়ে তোলে তখন ক্রীতদাসের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার স্বাধীন মানুষের মনে ততটা রেখাপাত করতো না। এসব অসাম্যকে ত্যাগের ফল ও দেবতাদের বিধান বলে মনে করা হতো। এসব সামাজিক অবিচার ধর্ম ও দর্শনের সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করতো।[২]

মহানবী (সা)এর আগমনের সময় নৈতিক ও বৈষয়িক অবস্থা ছিলো যীশু খ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ইউরোপের অবস্থার চেয়েও খারাপ। অন্যায়, নির্যাতন ও শোষণের অক্টোপাসে আবদ্ধ আরবদের সাধারণ জনতা তখন আর্তনাদ করছিলো। তারা অপেক্ষায় ছিলো একজন ত্রাণকর্তার। সেই ত্রাণকর্তা হিসাবে তাঁরা খুঁজে পেল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)কে।[৩] ঐ সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা আরব দেশের অবস্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় হলেও তখন সমগ্র ইউরোপ ছিলো মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত। সন্ত্রাস, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিলো সর্বব্যাপী। ভারতবর্ষে তখন পৌত্তলিকতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সতীদাহ, দেবীর সামনে নরবলী প্রভৃতি ছিলো বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চাপে আর্তনাদ করছিলো। বর্ণপ্রথা এতই কঠোর ছিলো যে, কোনো শুদ্র ব্রাহ্মণের পথ দিয়ে হেটে গেলে তাকে ফাঁসি দেয়া হতো।[৪]

আদিম অধিবাসীদের সাথে ব্রাহ্মণদের ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তাতো দূরের কথা তারা তাদের ছায়াও মাড়াত না। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পালিত কুকুর একজন আদিবাসীর চেয়ে বেশি সম্মান পেত। বস্তুত সারা পৃথিবী যখন বিরাজমান অশুভ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য উৎসুক তখনই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।[৫]

মহানবী (সা) যে ধর্মের জয়গান ও প্রচার করেন তা সন্ত্রাসমুক্ত ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এ এমন এক ধর্ম যেখানে জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সব ভেদাভেদ মানুষের চিন্তা ও চেতনা থেকে মুছে ফেলার কথা বলা হয়েছে। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাজিক অসমতা দূল করেন, নারীদের মর্যাদায় স্বীকৃতি দেন, ক্রীতদাসের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন এবং মদ্যপান, জুয়া, রক্তপাত প্রভৃতি অসামাজিক প্রথা কঠোর হস্তে দমন ও দূর করে সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার সাধন করেন। মানব জাতির মুক্তি ছিলো তাঁর লক্ষ্য এবং আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠা, ও সততা ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত।[৬]

মহানবী (সা) প্রেরিত হয়েছিলেন সারাজাহানের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতস্বরূপ। আল্লাহ বলেছেন, "আমি তো আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।[৭] তাই ইহকালেও যেন সকল মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারে, শান্ত-স্নিগ্ধ এ পৃথিবীতে বুক ভরে স্বস্তিঃর নিঃশ্বাস নিতে পারে; গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত দুরাচারের জন্য সমাজের সকল

---

[১] কে আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৭

[২] Abul Hashim, The Creed of Islam, ibid, p.80

[৩] Syedur Rahman, An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, ibid, p.20

[৪] ibid

[৫] Abul Hashim, The Creed of Islam, ibid, p.80

[৬] Syedur Rahman, An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, ibid, p.23

[৭] আল-কুর'আন, সূরা আম্বিয়া: ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন যাতে দুর্বিসহ হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেতন। তাই এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি প্রয়োজনে কল্পনাতীতভাবে কঠোর হয়েছেন। দুনিয়া থেকে যতো অনাচার, অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস সবই তিনি কঠোর থেকে কঠোরতরভাবে প্রতিরোধ করেছেন।

নবুয়ত পাওয়ার পরে তো বটেই এমন নবুয়্যত পাওয়ার আগেও তিনি সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এ সব নির্মূল করতে। তাই আমরা দেখতে পাই মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি 'হিলফুল ফুযূল' সংগঠনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ সংগঠনের প্রথম ধারায় বর্ণিত ছিলো: "আল্লাহর কসম! মক্কা নগরীতে কারো উপর অত্যাচার হলে আমরা সবাই মিলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করবো। চাই সে উঁচু শ্রেণীর হোক বা নিচু শ্রেণীর হোক, স্থানীয় হোক বা বিদেশী হোক। অত্যাচারিতের প্রাপ্য যতোক্ষণ পর্যন্ত না আদায় হতে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এভাবেই থাকবো।[১] এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে নবুয়্যতপূর্ব জীবনে মহানবী (সা) মক্কানগরী থেকে অত্যাচার ও সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদে মানবেতিহাসের সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেছেন।

অমুলিমদের অত্যাচারে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত ইহুদিদের সাথে তিনি এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে মদীনার সনদ নামে খ্যাত। ৪৭টি ধারা বিশিষ্ট এ সনদ সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দলীল। সনদের একটি ধারায় বলা হয়েছে, "তাকওয়া অবলম্বনকারী ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের হাত সমবেতভাবে ঐ সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হবে যারা বিদ্রোহী হবে অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যায়, পাপাচার, সীমালংঘন, বিদ্বেষ অথবা দুর্নীতি ও ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হবে। তারা সকলে সমভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে যদি সে কারো আপন পুত্রও হয়ে থাকে।[২]

আরেকটি শর্তে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে এবং সাক্ষ্য প্রমাণে তা প্রমাণিতও হবে তার উপর কিসাস গ্রহণ করা হবে – হত্যার বদলে হত্যা করা হবে। তবে তার উত্তরাধিকারীরা যদি তাকে রক্তপণ নিয়ে ক্ষমা করে দেয় আর সমস্ত ঈমানদারদের তাতে সায় থাকে তাহলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।[৩]

এভাবে শুরু হয় মদীনায় জীবনে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। এছাড়া সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সন্ত্রাসীদেরকে এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন, যার পর আর কারো পক্ষেই সন্ত্রাসবাদের দিকে পা বাড়ানোর মোটেই সম্ভবপর ছিলো না। বাহরাইনের উকল ও উরায়না[৪] এবং ইহুদি বনু নযীর গোত্রের[৫] বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

দয়ার সাগর হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাস দমনে মহানবী (সা) ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কারণ সন্ত্রাসীদের প্রতি দয়া দেখালে অবশিষ্ট শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। তারচেয়ে বরং গুটিকয়েক সন্ত্রাসীকে কঠোর শাস্তি দিয়ে অবশিষ্ট অধিকাংশ মানুষের শান্তি নিশ্চিত করাই সমর্থনযোগ্য, যৌক্তিক এবং কাঙ্ক্ষিত। সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা) যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন তার প্রতিটির উৎসই ছিলো মহান আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নির্দেশের বাস্তবায়ন মাত্র। কুর'আন মজীদে এ সকল নির্দেশ নানাভাবে বিবৃত হয়েছে।

ইসলাম বিশ্বমানবতার ধর্ম। সর্বত্র শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ইসলাম তার অনুসারীদের শান্তির পক্ষে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছে এবং কোনোক্রমেই শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আল্লাহকে ডাক, ভয় ও আশা নিয়ে।[৬]

---

[১] সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ.২২৮

[২] হযরত রাসূলে করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৩১৮

[৩] হযরত রাসূলে করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১৯

[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৫] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদুদ

[৬] আল-কুর'আন, সূরা আরাফ: ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসী সকলের নিকটই ঘৃণিত। মহান আল্লাহও সন্ত্রাসীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখেন এবং তাদের উপর লা'নত বর্ষণের ঘোষণা দিয়েছেন। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় ওয়াদা করার পর তা ভেঙে ফেলে, যে সম্পর্ক আল্লাহ রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় – তাদের জন্য আছে অভিশম্পাত।[১]

সন্ত্রাসের বিস্তৃতির কারণে অধিকাংশ সময় মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ ও অশান্তি নেমে আসে। এ কথার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন: "মানুষের কর্মের ফলে স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। (এটা এজন্য নয় যে) আল্লাহ যেন তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করতে পারেন, যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।[২]

সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বই মহান আল্লাহর কাম্য। মানবজাতির চিরশত্রু শয়তানের ফাঁদে পড়ে অনেকেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাসীদের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ বলেন: "যখন সে ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির এবং ফসলের ক্ষেত ও জীব-জন্তু ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।[৩]

সন্ত্রাসী আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়, তাঁর কোপানলে পতিত হয়। কুর'আন মজীদে এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে: "এরপর সেখানে অসংখ্য রকমের ফাসাদ সৃষ্টি করেছিলো, তারপর আপনার প্রতিপালক তাদের উপর আযাব নাযিল করলেন।[৪]

সন্ত্রাস মানব জীবনের জন্য ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। জীবনের সর্বত্র তা বিপর্যয় ও অশান্তি নামিয়ে আনে। এর ভয়বহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: "আর ফিতনা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছে তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দাও। ফিতনা[৫] হত্যাকাণ্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যতোক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধে লিপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না। যদি তারা তোমাদেরকে হত্যা করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের পরিণাম।[৬]

সন্ত্রাস সর্বগ্রাসী, সন্ত্রাস সর্বনাশী। সন্ত্রাসের ভয়াল ছোবল সকলকেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে তোলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাক যা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী তাদের উপরই আপতিত হবে না (বরং তোমাদের উপরও আপতিত হবে)। জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।[৭]

সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েও নিজেদেরকে সমাজে শান্তি স্থাপনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সে কারণে সন্ত্রাসীয় শান্তিবাণীতে বিভ্রান্ত হওয়া মুমিনদের কাজ নয়। আল্লাহ বলেন, "যখন তাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে তোমরা ফাসাদ বা সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা হলাম শান্তি স্থাপনকারী।[৮]

কুর'আন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম বর্ণনা করে মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার নীতি অবলম্বন করেছে। হযরত লূত (আ)এর জাতি সমাজে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম করতো বলে মহান আল্লাহ তাদের উপর যে শাস্তি অবধারিত করেছিলেন তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে গযব নাযিল করবো, কারণ তারা অশালীন কাজে লিপ্ত আছে।[৯]

---

[১] আল-কুর'আন, সূরা রাদ: ২৫

[২] আল-কুর'আন, সূরা রূম: ৪১

[৩] আল-কুর'আন, ২: ২০৫

[৪] আল-কুর'আন, সূরা ফাজর: ১২-১৩

[৫] ফিতনা বলতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সন্ত্রাস, গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, ধর্মীয় নির্যাতন, শিরক, কুফর, নিফাক, প্রলোভন, পরীক্ষা ইত্যাদি সবই বুঝানো হয়েছে। মানুষের জন্য এ অবস্থায় স্বাভাবিক জীবন যাপন অসম্ভব বলেই ফিতনা প্রতিরোধের এ কঠিন বিধান দেয়া হয়েছে।

[৬] আল-কুর'আন, ২: ১৯১

[৭] আল-কুর'আন, ৮: ২৫

[৮] আল-কুর'আন, ২: ১১

[৯] আল-কুর'আন, সূরা আনকাবূত: ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আখিরাতে সন্ত্রাসীদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। কুর'আন মজীদে এ শাস্তির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যারা কাফির এবং যারা মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দিত আজ আমি তাদেরকে শাস্তির উপর শাস্তি বাড়িয়ে দেব। কেননা তারা বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো।[১]

হযরত সালেহ (আ) সামূদ জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়ার পর কিছু সন্ত্রাসী লোক তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরকে হত্যার হীন চক্রান্তে মেতে ওঠে। নবীর আদেশ অমান্য করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তাদেরকে মহান আল্লাহ ভয়ানক শাস্তি দান করেন। বলা হয়েছে: "অতএব দেখুন, তাদের ষড়যন্ত্রের কী পরিণাম হয়েছিলো। আমি ষড়যন্ত্রকারীদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এইভাবে তাদের ঘরবাড়ি, সীমালংঘনের কারণে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় জ্ঞানী লোকদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষনীয় নিদর্শন রয়েছে।[২]

দেশ ও সমাজে শান্তি স্থাপনের মহান উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পরোপকারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বুকে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার আদেশ দান করেছেন। বলেছেন, "আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো তবে দুনিয়ার দায়িত্ব ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ যেমনভাবে তোমার উপর ইহসান করেছেন তেমনভাবে অন্যদের প্রতি ইহসান করো। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আল্লাহ বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।[৩]

যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেড়ায় এবং দুনিয়ার বুকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের শাস্তির ধরন উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো – তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[৪]

ইসলাম সবসময় তার অনুসারীদেরকে ফাসাদ বা জনগণের মধ্যে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা-সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিস্তারের ভয়ানক পরিণতির ভয় দেখিয়েছে এবং বলেছে, যারা মানুষের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তারা আল্লাহর রহমতের অতি নিকটবর্তী। বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আল্লাহকে ডাক, ভয় ও আশা নিয়ে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সদাচারীদের অত্যন্ত নিকটবর্তী।[৫]

ইসলাম সকলকে সন্ত্রাসের উর্ধ্বে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেন: "সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি। হে আদম সন্তান! আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই নগরী যেমন তোমাদের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পত্তিও মর্যাদা সম্পন্ন। মনে রেখো! জাহিলিয়া যুগের সকল নীতি, সকল আচরণ আজ আমি পদতলে দলিত করছি। জাহিলিয়া যুগের রক্তপাত এবং তার প্রতিশোধের সকল ঘটনা আজ থেকে সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সর্বপ্রথম আমি আমার পিতৃব্য ভ্রাতা ইবনে রাবিয়া বিন হারিসের খুনের দাবি প্রত্যাহার করছি।[৬]

এভাবেই মহানবী (সা) সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব উপহার দিতে বেরে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছিলেন। ন্যায় ও সদয় ব্যবহারে তাঁর নিকট কখনো স্বধর্মী-বিধর্মী বিচার ছিলো না। তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু মহানবী (সা) সব সময় তাঁর সাথে পরম শ্রদ্ধার সাথে কথা বলেছেন, অত্যন্ত সদ্ভাবে জীবনযাত্রা

---

[১] আল-কুর'আন, ১৬: ৮৮

[২] আল-কুর'আন, সূরা নমল: ৫১-৫২

[৩] আল-কুর'আন, ২৮: ৭৭

[৪] আল-কুর'আন, ৫: ৩৩

[৫] আল-কুর'আন, সূরা আরাফ: ৫৬

[৬] মওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ.৪৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাহ করেছেন। মহানবী (সা) তাঁর বিধর্মী অতিথিদের মলমূত্র নিজ হাতে ধুয়ে দিয়েছেন। ইসলামের অতি বড় শত্রুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[১] মহানবী (সা) সমভাবে সকলের সাথে মিলেমিশে সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় সাহাবীদের সাথে তিনি মাটি কেটেছেন এবং মাটির বোঝা নিজে মাথায় করে বহন করেছেন। জনৈক সাহাবী তাঁর ভৃত্যকে প্রহার করছে দেখে মহানবী (সা) তাঁকে বললেন:"সে তোমার ভাই। তুমি যা খাবে তাই তাকে খেতে দেবে আর তুমি যা পরবে তাই তাকে পরাবে।[২]

মদীনায় হিজরাতের পর মহানবী (সা) মদীনায় আউস ও খাযরাজ গোত্রের শতাব্দী প্রাচীন বিবাদ ভুলিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মধুর বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে দেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর দীন ধারণ করো এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিআমাতের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করো। যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, তখন আল্লাহ তোমাদের মনের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করে দিলেন আর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাইভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো ছিলে আগুনের গর্তের কিনারে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা হিদায়াত লাভ করো।[৩]

ইসলাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে। ইসলামে সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা রয়েছে। সিনাই পর্বতের নিকট সেন্ট ক্যাথরিন মঠের সাধু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে মহানবী (সা) তাদের জীবন, ধর্ম ও সম্পত্তি রক্ষার যে সনদ প্রদান করেন, তা নিজ ধর্মের রাজাদের কাছ থেকেও খ্রিস্টানরা কখনো পায়নি। এ সনদের মূলকথা ছিলো: "অমুসলিম শত্রুকে প্রতিহত করা হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদের বাধ্য করা হবে না। তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী ও পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের ক্রুশ ও দেবদেবীর মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না। তারা নিজেরা অত্যাচার করবে না এবং তাদের প্রতিও কোনো অত্যাচার করা হবে না। জাহিলিয়ার যুগে রক্তের পরিবর্তে রক্ত নেয়ার যে প্রথা ছিলো তা তারা পালন করতে পারবে না। তাদের নিকট হতে কোনো উশর[৪] গ্রহণ করা হবে না। তাদেরকে সেনাবাহিনীর কোনো রসদ দিতে হবে না।[৫]

মহানবী (সা)এর শত্রুদের প্রতি প্রেরিত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলতেন: "আমাদের প্রতি কৃত ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গৃহাভ্যন্তরে বসবাসকারী ক্ষতিহীন বাসিন্দাদের গায়ে হাত দিও না। নারীদের অক্ষমতার সম্মান করো। দুগ্ধপোষ্য শিশু আর রোগ শয্যায় মানুষকে আঘাত করো না। বাধা প্রদান করে না এমন অধিবাসীদের গৃহ ভেঙে দিও না। তাদের জীবনধারণের উপকরণসমূহ ও ফলের গাছ নষ্ট করো না। খেজুর গাছের ক্ষতি করো না।[৬] তিনি আরো বলতেন: "যে ব্যক্তি যিম্মির[১] প্রতি

---

[১] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ.৩

[২] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল জিহাদ

[৩] আল-কুর'আন, ৩: ১০৩ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)

[৪] উশর অর্থ এক দশমাংশ। পরিভাষায়, উশর হলো জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এটি আদায় করা হয়। যদি জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় বৃষ্টির পানি, নদীর পানি বা ঝর্ণার পানি দ্বারা তাহলে উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করা হয়। আদায়কৃত এ এক দশমাংশ শস্যের নাম উশর। জমির ফসল উৎপাদনে যদি কৃত্রিমভাবে পানিসেচ করা হয় তাহলে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করা হয়। পরিমাণ বিশভাগের একভাগ হলেও একেও উশরই বলা হয়। (দ্রষ্টব্য: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, কিতাবুত যাকাত)

[৫] সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদ: মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ.১২৮

[৬] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় ব্যবহার করবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেবে আমি পরলোকে তার জন্য অভিযোগকারী হব।[২] এ প্রেক্ষাপটেই বলা হয়েছে, "The recognition of rival religious systems as possessing a Divine revelation gave to Islam from the outset a theological basis for the toleration of non-Muslim.[৩]

এভাবে ইসলাম মানুষকে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে। জনসাধারণের জান-মাল, ইজ্জত-অব্রুর হিফাযতের দায়িত্ব ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মানুষের আর্থিক দুর্গতি দূরীভূত করার সকল বাস্তব এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মহানবী (সা) থেকে শুরু করে তাঁর সাচ্চা প্রতিজন অনুসারী – প্রত্যেকে সন্ত্রাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সন্ত্রাস বিরোধী ভূমিকায় হযরত আবূ বকর (রা) মহানবী (সা)এর অনুসরণে তাঁর সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছেন: "হে যায়িদ! নিশ্চিত হয়ো, যেন তোমরা নিজের লোকদের উৎপীড়ন না করো। তাদেরকে বিব্রত করবে না। বরং তোমরা সকল ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। আর যা ন্যায়-সঙ্গত ও বিচার সম্মত তা করতে যত্নবান হবে। কারণ যারা অন্যথা করে তাদের উন্নতি হবে না। যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে, তখন তোমরা মানুষের মত নিজেদের পরিচয় দেবে আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর যদি তোমরা বিজয়ী হও, তাহলে ছোট শিশুদের হত্যা করবেনা, বৃদ্ধদেরকে না, নারীদেরকেও না। খেজুর গাছ নষ্ট করবে না, শস্যের ক্ষেত পোড়াবে না। ফলের গাছ কাটবে না। শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে যা তোমরা হত্যা করবে তার বাইরে গবাদি পশুর কোনো ক্ষতি করবে না। যখন তোমরা কোনো সন্ধি বা চুক্তি করো তা পালন করবে এবং তোমাদের কথা রক্ষা করে চলবে। তোমরা চলার পথে দেখবে কিছু ধর্মপরায়ন লোক মঠের মধ্যে সংসারত্যাগী অবস্থায় বাস করছে, যারা এই প্রকারে আল্লাহর সেবায় নিযুক্ত, তাদেরকে বিরক্ত করবে না। তাদেরকে হত্যা করবে না বা তাদের মঠ ধ্বংস করবে না।[৪]

বাক স্বাধীনতার পরিবেশ ক্ষুন্ন হলে অনেকেই সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইসলাম তাই প্রত্যেক স্বাধীন, বুদ্ধিমান, সচেতন লোকের জন্য অবাধ বাক-স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) সবসময় জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাতেন। তাঁরা প্রায়ই বলতেন: "তোমাদের কল্যাণ নেই যদি তোমরা আমাদের সমালোচনা না করো এবং আমাদের কল্যাণ নেই, যদি আমরা তা না শুনি।[৫]

নির্বাচিত হওয়ার পর প্রচলিত ধারায় খলিফাগণকে তাদের ভাষণে জনগণকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হতো যে, তিনি কুর'আন-সুন্নাহর নির্দেশ মুতাবিক খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সেই নির্দেশ মেনে চলবেন এবং সে মর্মে তিনি আইন শাসনের নিশ্চয়তা দেবেন। ইসলামে খলিফার কর্মকাণ্ডের সমালোচনার বিস্তারিত স্বাধীনতা জনগণের রয়েছে।[৬]

ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিরোধে ন্যায় বিচারের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামের দেওয়ানী আইন সব মানুষের সাথে ন্যায়-নীতি ও হকের ভিত্তিতে আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ফৌজদারী আইনেও সকলের জন্য একই রকম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। যে অত্যাচার, সন্ত্রাস ও বাড়াবাড়ি করে তাকে শায়েস্তা করা হয়। হত্যাকারী জ্ঞানী বা মূর্খ, নিহত ব্যক্তি ধনী হোক বা গরীব হোক, মযলুম আরব হোক বা অনারব হোক, প্রাচ্যবাসী হোক বা পাশ্চাত্যবাসী হোস – সকলেই আইনের চোখে সমান।

ইসলাম জাতি, ধর্ম-বর্ণ তথা সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদকে স্বীকার করে না। তাই ইসলাম যেমন সর্বত্র আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনি বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাও প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশসমূহ লক্ষ্য করলেই বিষয়টি

---

[১] ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ হলেন যিম্মী। কারণ ইসলামি আদর্শ অনুসারে ইসলামি রাষ্ট্র এ শ্রেণীর নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালনের এবং তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা দেয়ার যিম্মাহ বা দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। (লিসানুল আরব, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৯)

[২] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩

[৩] Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol.IV, (Toleration), Oxford Press, 1993, p.987

[৪] সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩০

[৫] আহমদ মুল্লাজিউন, নুরুল আনওয়ার, তা.বি, ঢাকা, পৃ.৩১৬

[৬] মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, আত-তারীখুল ইসলামী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ.১৭৬-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ বিচারে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় অথবা তোমাদের মাতাপিতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক আল্লাহ তাদের উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। তাই তোমরা ন্যায়বিচারে তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে জেনে রেখ, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সকল খবর জানেন।[১]

ন্যায়নিষ্ঠ বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিই মূলত সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সন্ত্রাসমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে মহানবী (সা) ও তাঁর খলীফাগণ ছিলেন সদা তৎপর। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের মূর্ত প্রতীক। নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাইমা ইবনে উবাইরাক নামে একজন মুসলিম নারী[২] তিনি বর্ম চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চোরাই বর্মটি তাইমা এক ইহুদির বাড়িতে পুতে রাখেন। তদন্তকারী দল ইহুদির বাড়ি থেকে বর্ম উদ্ধার করে ও আটক করে। ইহুদি চুরির দায় অস্বীকার করেন এবং মূল ঘটনা সকলকে অবহিত করেন। কিন্তু মুসলিম হিসেবে তাইমা সকলের সহানুভূতি লাভ করেন। সকলে ইহুদির কথা অবিশ্বাস করে। মহানবী (সা) মামলাটি নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করে ইহুদিকে মুক্তি দান করেন। তাইমা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়।[৩]

বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নামের এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লেন। মহানবী (সা) ইসলামের বিধান অনুসারে তাঁর হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কুরাইশদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত বিব্রতকর ছিলো। এত সম্মানিত একটি গোষ্ঠীর একজনের হাত চুরির অপরাধে কাটা যাবে, বিষয়টি তারা কোনোভাবেই হজম করতে পারছিলেন না। এ কারণে তারা মহানবী (সা)এর স্নেহভাজন উসামা বিন যায়দকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। তাঁদের হয়ে যায়দ ফাতিমার শাস্তি হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করলেন। মহানবী (সা) তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সকলকে সমবেত করে একটি ভাষণ প্রদান করলেন। বললেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিলো এই যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিলো, তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণীভুক্ত কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে অভিযুক্ত এই ফাতিমা যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও হতো, আমি তাঁরও হাত না কেটে ছাড়তাম না।[৪]

একবার উবাই বিন কাব (রা) যায়িদ বিন সাবিতের আদালতে খলীফা উমর (রা)এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করলেন। উমর (রা) আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে হাজির হন। যায়িদ তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিচারকের আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং খলীফাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এতে খলীফা তাঁকে বলেন: "আদালতে আসামীর প্রতি এ সম্মান দেখানোই আপনার প্রথম অবিচার। কথাটি বলেই তিনি উবাইয়ের পাশে উপবেশন করলেন। উমর (রা) অভিযোগ অস্বীকার করলেন। উবাই (রা)এর হাতে কোনো প্রমাণ ছিলো না। তিনি তাই খলীফাকে আল্লাহর নামে শপথ করার আহ্বান জানান। খলীফার উচ্চ মর্যাদার কারণে যায়িদ উবাইকে শপথের দাবী প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। এতে খলীফা যায়িদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, "আপনার চোখে উমর ও অন্য লোক যদি সমান না হয়, তাহলে আপনি বিচারকের পদের জন্য উপযুক্ত নন।

অন্য একটি ঘটনায় কাজির বিচারে যথোপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায় উমর (রা) তাঁর নিজের ছেলেকে দ্বিতীয়বারের মত বেত্রাঘাত করলেন। ছেলেটি মারা গেল। মিসরের গভর্নর আমর বিন আসের পুত্র একজন আদি মিসরীয়কে কোনো বিচার ছাড়াই প্রহার করলে উমর (রা) পিতা-পুত্র উভয়কে ডেকে পাঠালেন এবং মিসরীয়কে আমরের উপস্থিতিতে তার পুত্রকে অনুরূপ প্রহার করার

---

[১] আল-কুর'আন, ৪: ১৩৫ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

[২] প্রকৃতপক্ষে তাইমা সত্যিকারের মুসলিম ছিলেন না। তিনি ছিলেন কপট মুসলিম। বিজয়ী শক্তির নিকট থেকে প্রাপ্য সম্ভাব্য সুবিধা পাওয়ার লোভে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মন থেকে ইসলাম বিরোধী আচরণ দূর করতে পারেননি।

[৩] অ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম, শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.১২২

[৪] মুত্তফা আস-সিবায়ী, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ফারুক, ইসলামী সভ্যতায় মানব প্রেম, মাসিক পৃথিবী, মার্চ ১৯৯৯, পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ দিলেন। আমরের পুত্রকে অনুরূপভাবে প্রহার করা হলো। মিসরীয় লোকটি আমরকে ক্ষমা করে দেয়ায় তিনি খলীফার বেত্রাঘাত থেকে রক্ষা পেলেন।

আরবের দাসওয়ানের রাজা যুবালা বিন আয়হাম ইসলাম গ্রহণ করার পর সদল বলে খলীফা উমর (রা)এর সাথে সাক্ষাত করেন। একদিন তিনি যখন কাবায় হজ করতে গেলেন তখন এক বেদুঈন তার পোশাকে অসতর্ক অবস্থায় ময়লা লাগিয়ে ফেলে। এতে তিনি বেদুঈনকে আঘাত করেন। বেদুঈন উমর (রা)এর নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। খলীফা রাজাকে বলেন: আপনি যদি সমপরিমাণ আঘাত আশা না করেন, তাহলে বেদুঈনকে ক্ষতিপূরণ দিন। যুবালা বললেন: "আপনি কি রাজা এবং সাধারণ মানুষকে পার্থক্য করে দেখেন না?" উমর (রা) জবাব দিলেন: না, দেখি না। কারণ ইসলামে সবাই সমান। যুবালা উমর (রা)এর নিকট থেকে ২৪ঘণ্টা সময় চেয়ে নিলেন এবং রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১]

হযরত আলী (রা) মিসরের গভর্নর মালিক ইবনে হারিসকে লেখা একটি চিঠিতে উপদেশ দিয়েছিলেন: "বিচার বিভাগকে অবশ্যই সকল প্রকার প্রশাসনিক চাপ থেকে প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে নির্ভয়ে ও কারো প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন না করে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।[২]

উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের পুত্র হিশামের বিরুদ্ধে এক খ্রিস্টান উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করলে খলীফা হিশামের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। আদালতে হাজির হওয়ার পর হিশামকে খ্রিস্টান ব্যক্তির সাথে একই পর্যায়ে দাঁড় করানো হয়।[৩]

ইসলামি আইনের চোখে খলীফা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্যের প্রশ্রয় দেয়া হতো না। হেরা অঞ্চলের এক মুসলিম একজন অমুসলিমকে খুন করে বসল। তিনি মুসলিম খুনীকে বন্দী করে বিচারের জন্য অমুসলিমের নিকট হস্তান্তর করলেন। ইসলামি আইন কিসাসের রীতি অনুযায়ী খুনীকে সমতার আইনে খুন করা হলো।[৪]

কয়েকজন উট মালিকের ঘটনায় মদীনার কাজির আহ্বানে আব্বাসীয় খলীফা মনসুর সশরীরে উপস্থিত হলেন এবং কাজির সামনে একজন সাধারণ বিবাদীর বেশে দাঁড়ালেন। কাজি খলিফাকে অভ্যর্থনা জানাতে এমনকি তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন না। বাদির পক্ষে রায় হলো। সঠিক ও উপযুক্ত বিচারের জন্য মনসুর পরবর্তীকালে কাজিকে উপঢৌকন দিয়ে তার স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বীকৃতি দিলেন।[৫]

ইবনে বতুতা তুঘলকের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। একদিন এক হিন্দু প্রজা আদালতে স্বয়ং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, সুলতান তার পুত্রকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছেন। বিচারক আসামী হিসেবে দিল্লীর সম্রাট মুহাম্মদ তুঘলককে আদালতে হাজির হতে তলব করেন। বিচারে সম্রাটের অপরাধ প্রমাণিত হয়। অতঃপর অভিযোগকারীকে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। সম্রাট অম্লানবদনে এ রায় মেনে নেন।[৬]

বস্তুত সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতা, জীবন, মূল্যবোধ ও শান্তি বিধ্বংসী দুষ্টক্ষত সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটনে ইসলাম যে কার্যকরী মূলনীতি নির্দেশ করেছে তা আপাত দৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও তা সময়োচিত, বাস্তবমুখী এবং অত্যন্ত কার্যকর।

---

[১] Ahmad Gamil Mazzara, Islam, Democracy and Socialism, Working England, Islamic Review, April 1962, p.8

[২] হযরত আলী (রা)এর প্রশাসনিক চিঠি, অনুবাদ: খুরশিদ আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ.৭

[৩] মওলানা এ. কে. আযাদ, আদর্শ খেলাফতের নমুনা, অনুবাদ: প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ঢাকা, তা.বি. পৃ.৩০২

[৪] মওলানা একে আযাদ, আদর্শ খেলাফতের নমুনা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০২

[৫] অ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪০

[৬] মওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সন্ত্রাসের বর্তমান পরিস্থিতি

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ব্যাপক হারে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। পত্রিকার পাতা উল্টালেই চোখে পড়ছে এসিড নিক্ষেপ, চাঁদাবাজি, অপহরণ, যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতন ও হত্যা, গৃহপরিচারিকা নির্যাতন ও হত্যা, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনা। যদিও প্রতিদিন যে হারে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে ঘটে থাকে তার খুব কম অংশই পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় তবুও এ স্বল্প সংখ্যক ঘটনাই মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। ২০০৮ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে তৈরি একটি পরিসংখ্যান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো। পরিসংখ্যানটি উক্ত বছরের প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সমকাল, যুগান্তর, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, সংবাদ ও নয়াদিগন্তে প্রকাশিত তথ্যের আলোকে তৈরি।[১]

২০০৮ সালের সন্ত্রাস চিত্র

ক্রমিক	অপরাধের ধরন	সংখ্যা
১	হত্যা	৫৩২
২	ডাকাতি	৪৫০
৩	চুরি	৮৪৭
৪	ধর্ষণ	৪৩৮
৫	এসিড নিক্ষেপ	১২২
৬	মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও বিক্রয়	৪৩৭
৭	অপহরণ	১২২
৮	ছিনতাই	১৭৭
৯	চাঁদাবাজি	২১২
১০	আত্মহত্যা	১৪৭
১১	নারী ও শিশু পাচার	২৩৮
১২	ভদ্রবেশি অপরাধ	৩৭০
১৩	অন্যান্য	৬৩০

বর্তমান বাংলাদেশে সন্ত্রাসের মাত্রা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, খুন, লুণ্ঠন, অপহরণ, রাহাজানি, কালোবাজারি, প্রতারণা, এসিড নিক্ষেপ, দুর্নীতিসহ আরো বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রতিনিয়ত লোমহর্ষক রূপ নিচ্ছে। পত্রিকায় প্রকাশিত অপরাধমূলক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশে হত্যা সবচেয়ে প্রচলিত অপরাধ। ২০০৮ সালে সমগ্র দেশে আরো অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ঘটলেও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ৫৩২টি ঘটনা। যৌতুক, পূর্বশত্রুতা, দলের মধ্যে অন্তর্কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, ধর্ষণ, ক্রস ফায়ার, পারিবারিক কলহের জন্যই এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে যা পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

আশুলিয়া রণক্ষেত্র। পুলিশের গুলিতে এক শ্রমিক নিহত : আহত দুই শতাধিক।[২] পোশাক কারখানায় শ্রমিকের আগুন। আশুলিয়ায় তৃতীয় দিনেও নৈরাজ্য, পুলিশসহ আহত ৫০০।[৩] রাজধানীতে চোর সন্দেহে পিটিয়ে যুবক হত্যা। দুর্ঘটনায় চালকের

---

[১] ফাতেমা রেজিনা, বাংলাদেশে অপরাধ সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের ধরন : প্রেক্ষাপট ২০০৮ সালের সংবাদপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৯, অক্টোবর ২০০৭/কার্তিক ১৪১৪, পৃ.১১০

[২] নয়া দিগন্ত, ২৯ জুন ২০০৯, পৃ.১

[৩] প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০০৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

সহকারীর মৃত্যু ।[১] সন্ত্রাসী ড্রাইভারদের বেপরোয়া গাড়ি চালনায় জনপথে পরিবহন সন্ত্রাস চলে। দেশে প্রতিবছর গড়ে চার হাজার লোক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে, আহত হচ্ছে আরও কয়েক হাজার ।[২]

রামগঞ্জে আ.লীগ সমর্থকদের হামলায় আহত ২০ ।[৩] সাংসদের গাড়ি ঢুকতে না পারায় অধ্যক্ষকে প্রকাশ্যে মারধর করেছেন যুবলীগের কর্মীরা ।[৪] দরপত্র দাখিল নিয়ে ঘটনা। সংসদ ভবনে যুবলীগের শতাধিক যুবকের মহড়া ।[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ছাত্রলীগের কর্মীরা দুইজন সাংবাদিককে পিটিয়েছেন ।[৬] ভাঙ্গায় আ.লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, লুটপাট-ভাঙচুর ।[৭] সীতাকুণ্ডে সাংসদপুত্রের দখল। পুলিশের সামনে চারটি শিপইয়ার্ড দখল করে কাঁটাতারের বেড়া ।[৮] ছাত্রলীগের সংঘর্ষ-কোন্দল এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ।[৯] না.গঞ্জে ব্যবসায়ী সমাবেশে নীরব চাঁদাবাজির অভিযোগ ।[১০] ছাত্রলীগের হামলায় ৭ জানুয়ারি নিহত হন রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সহ-সভাপতি রেজানুল ইসলাম সানি। গুরুতর আহত হন ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি কাজী মোতালেব জুয়েল ও অপর সহ-সভাপতি শেফারত আলী বুলবুল। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করে ।[১১]

ঈদ সামনে রেখে বেড়েছে অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা। দুই দিনে খপ্পরে পড়েছেন ১৪জন। এক সপ্তাহে শতাধিক ব্যক্তি অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে অসুস্থ হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। [১২] দিনে গুলি-ছিনতাই, রাতে চুরি। চট্টগ্রামে মাথায় গুলি করে ১০ লাখ টাকা ছিনতাই, নিরাপত্তার দাবিতে আছদগঞ্জে দোকানপাট বন্ধ ।[১৩] সুজনকে গুলি করে ৩ লাখ টাকা ছিনতাই ।[১৪] বোমা হামলায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন ঢাকা-১২ আসনের সাংসদ ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস। তিনি রক্ষা পেলেও ১৩জন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। [১৫]

কেরানীগঞ্জে দুই যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার ।[১৬] সওজের দপ্তরের সামনে তিনজনের মাথা, দেহ ২০ কিলোমিটার দূরে![১৭] কক্সবাজার সাগরে আট দিনে ১৫ ট্রলারে দস্যুতা, লুটপাট ।[১৮] নীলক্ষেত ইসলামিয়া ও বাবুপুরা মার্কেটে হামলা, তিনজন আহত ।[১৯] কিশোরীকে উত্ত্যক্ত করার জের। নাগেশ্বরীতে দুই দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে আহত ৮ ।[২০] দখল নিতে প্রশিকায় হামলা।

---

[১] প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১৫
[২] প্রথম আলো, ১১ আগস্ট ২০০৯, পৃ.২৪
[৩] প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০০৯, পৃ.৫
[৪] প্রথম আলো, ২ আগস্ট ২০০৯, পৃ.৪
[৫] প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.২৪
[৬] প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.১৯
[৭] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্ব ২০০৯, পৃ.৪
[৮] প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১
[৯] প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.২৩
[১০] প্রথম আলো, ৪ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১৩
[১১] সাপ্তাহিক ২০০০, ১৫ জানুয়ারি ২০১০, বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩৬, পৃ.১১
[১২] প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.২
[১৩] প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১
[১৪] প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.৩
[১৫] সাপ্তাহিক ২০০০, ৩০ অক্টোবর ২০০৯, বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৫, পৃ.১১
[১৬] প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১
[১৭] প্রথম আলো, ১১ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১
[১৮] প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.৪
[১৯] প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.৭
[২০] প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

সংঘর্ষে আহত অর্ধশত। বহিরাগত যুবকদের নিয়ে কাজী ফারুকের মিছিল।[১] সহকারী এটর্নি জেনারেলের বাসায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি।[২] যশোরে আট মাসে ৬৯ খুন। নেপথ্যে টেন্ডার-চাঁদাবাজি।[৩] রাজধানীসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হচ্ছে। গত ১০দিনে এক ডজনের বেশি ব্যক্তি খুন হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছে কমপক্ষে আরও দুই ডজন।[৪] খুনের আসামি যখন নেতা। কী টিকবে, আইন না রাজনীতি?[৫] টেন্ডারবাজদের দৌরাত্ম্য।[৬] পথে পথে চাঁদাবাজি। মন্ত্রীরা যখন জানেন, ব্যবস্থা নেন না কেনো?[৭] অপরাধ ও জননিরাপত্তা। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।[৮] দিবালোকে পুলিশের সামনে গুলি।[৯] টেন্ডারবাজি কমছে কই? স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে অনেকবার টেন্ডারবাজি দমনের নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে। কাজ হয়নি, কাজ হচ্ছে না।..... সরকার ও সরকারি দল যদি আইন প্রয়োগের পথে না এগোয়, তাহলে কোনো কিছুতেই টেন্ডারবাজি ও অন্যান্য অপরাধ বন্ধ হবে না। আর সে জন্য সরকারকে, সরকারি দলকে মূল্য দিতে হবে।[১০]

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রনেতা নামধারী ব্যক্তিরা যখন হলো দখল, টেন্ডারবাজিসহ নানা অন্যায় কাজে লিপ্ত হন, তখন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু আরো বেশি উদ্বিগ্ন হতে হয় যখন দেখি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীর এসব অসৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছেন। অথচ দেশের সেরা শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পান। তাঁরাই যদি এ রকম অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁদের কাছে আমরা কী আশা করতে পারি? পাঁচ বছর পর তাঁরা ডাক্তার হয়ে যে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত হবেন, সেখানে তাঁদের মনোভাবে 'সেবা' বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি? তাঁরা মানুষ বাঁচানোর আদর্শ বহন করতে পারবেন কি? রোগী বাঁচাবেন, না মারবেন?[১১] সাংবাদিক নির্যাতন। বাপ্পী থেকে মাসুম – র‍্যাবের হাতে কেউই নিরাপদ নয়।[১২] ক্রসফায়ারে মৃতের সংখ্যা কত? মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে সহস্রাধিক, র‍্যাবের দাবি ৫৫৮।[১৩] হাসপাতালের পরিচালকের ওপর হামলা।[১৪] শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বাংলাদেশে এক অসহনীয় অবস্থা তৈরি করেছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ৭০জন শিক্ষার্থী ও ৪জন শিক্ষক সন্ত্রাসের বলী হয়েছেন।[১৫] সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় রক্তাক্ত হয়েছে ১৮ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে। পত্রিকা সূত্রে জানা গেছে, 'ছয় ঘণ্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গতকাল সোমবার ভোর থেকে টানা ছয় ঘণ্টার সহিংসতায় প্রক্টর, ছাত্রদল সভাপতি, পুলিশ সদস্যসহ আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটলেও পরে ছাত্রলীগও এতে অংশ নেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।[১৬]

---

[১] প্রথম আলো, ২ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১

[২] সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৩] প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[৪] প্রথম আলো, ২০ জুন ২০০৯, পৃ.১২

[৫] প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০০৯, পৃ.১২

[৬] প্রথম আলো, ১ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১০

[৭] প্রথম আলো, ১৮ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১০

[৮] প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.৮

[৯] প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১২

[১০] প্রথম আলো, ২৫ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১২

[১১] প্রথম আলো, ২৬ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১২

[১২] প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.১২

[১৩] দীপক চৌধুরী, ক্রসফায়ারে মৃতের সংখ্যা কত, সাপ্তাহিক ২০০০, ২৯ মে ২০০৯, বর্ষ ১২ সংখ্যা ০৩, পৃ.৩৫

[১৪] প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০০৯, পৃ.১২

[১৫] আমাদের সময়, ৫ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

[১৬] কালের কণ্ঠ, ১৯ জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

৫০ হাজার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হবে কবে?[১] ঢাকায় প্রতিদিন পরিবহনে চাঁদাবাজি ৬০ লাখ।[২] সম্প্রতি দেশের মাটিতে একাধিক ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা ধরা পড়ায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির বাইরে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলো বাংলাদেশে তাদের ঘাঁটি বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[৩]

বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিকীতে বিগত পাঁচ বছরের অপরাধের আলোকে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ তালিকাতেও দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম বাংলাদেশের শান্তি ও সম্প্রীতির বিপক্ষে অন্যতম প্রধান হুমকি। যদিও পুলিশি পরিসংখ্যানে কেবল সেই সকল ঘটনাই রয়েছে যেগুলোতে সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন এবং পুলিশ যে সকল অভিযোগ তালিকাভুক্ত করেছে। যে কারণে পুলিশী এই পরিসংখ্যানে প্রকৃত চিত্র উপস্থাপিত না হলেও মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়।

Bangladesh Police[৪]

Yearly Crime Statistics

(Number of registered case from 2003 to 2007)

No	Crime	2003	2004	2005	2006	2007
1	Dacoity	949	885	796	795	1047
2	Robbery	1170	1207	898	843	1298
3	Murder	3471	3902	3592	4166	3863
4	Speedy trial Act	2179	2053	1814	1638	1980
5	Rioting	890	754	570	570	263
6	Cruelty to Women	20242	12815	11426	11068	14250
7	Child Abuse	475	503	555	662	967
8	Kidnapping	896	896	765	722	774
9	Police Assault	271	280	240	337	274
10	Burglary	3883	3356	3270	2991	4439
11	Theft	8234	8605	8101	8332	12015
12	Arms Act	2293	2370	1836	1552	1746
13	Explosive Act	499	477	695	308	232
14	Narcotics	9494	9505	14195	15479	15622
15	Smuggling	4499	4181	4334	4734	5202
16	Others	66194	67531	73180	76381	22802
	Total	125639	119320	126167	130578	157200

[১] তাওহীদুল ইসলাম, ৫০ হাজার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হবে কবে?, সাপ্তাহিক ২০০০, ২৩ অক্টোবর ২০০৯, বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৪, পৃ.১৭

[২] খোন্দকার তাজউদ্দিন ও মনজুর জিয়া, ঢাকায় প্রতিদিন পরিবহনে চাঁদাবাজি ৬০ লাখ, সাপ্তাহিক ২০০০, বর্ষ ১২ সংখ্যা ১৩, পৃ.১৯

[৩] সাপ্তাহিক ২০০০, ৩০ অক্টোবর ২০০৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১২

[৪] বাংলাদেশ পুলিশ ২০০৮, উদ্ধৃতি: ফাতেমা রেজিন্দা, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি বিধানের আলোকে বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমনের পদ্ধতি বা প্রতিকার

বাংলাদেশে যে সকল কারণে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় সে সকল কারণ দূর করলেই সন্ত্রাস দূর হবে। এ জন্য ইসলামি শিক্ষার আলোকে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ ও প্রবর্তন করা সম্ভব হলে দেশ সন্ত্রাস মুক্ত হবে।

নৈতিক শিক্ষা: একজন পরিপূর্ণ মানুষের জন্য যে গুণ সবচেয়ে জরুরী তা হলো নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়া। নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত মানুষই কেবল সন্ত্রাস করতে পারে। আর নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ কেবল কুর'আন-হাদীসের জ্ঞানের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষয়িক প্রতিষ্ঠাই যেখানে মুখ্য সেখানকার ফসল অর্থাৎ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী নৈতিকতা বিবর্জিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফলে সন্ত্রাস আজ কুরে কুরে খাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনকে। ছাত্র রাজনীতি আজ কলুষতার আবর্তে নিপতিত। "আমাদের ঘরটা আজ বড় এলোমেলো, বড়ই অশান্ত। এই অশান্তির অন্যতম কারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এটি কোনো পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সংবাদপত্র পড়লেই বোঝা যায়। খবর মানেই খুন, ধর্ষণ, মস্তানি, ডাকাতি, বোমাবাজি, ব্লাকমেইলিং, অপহরণ, শিশুপাচার, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, পরীক্ষার হলে গণটোকাটুকি, আত্মহত্যা, চোরাচালানি, মাদকাসক্তি, ছিনতাই, রাহাজানি, দুর্নীতি, সড়ক দুর্ঘটনা, ইত্যাদির কথা।[১]

নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একদল দক্ষ জনগোষ্ঠী পেতে হলে তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত তাওহীদভিত্তিক শিক্ষাই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এবং দিতে পারে উন্নত নৈতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ একদল দক্ষ জন সম্পদ। কেননা সৃষ্টিকর্তার চেয়ে সৃষ্টির কল্যাণ বেশি কেউ বোঝে না। তাই মহান আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)এর মাধ্যমে প্রথম যে বাণী প্রেরণ করলেন, তাতে বলা হলো: "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। .... যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[২] তাওহীদভিত্তিক শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্যবোধকে মূল হিসেবে গণ্য করা হয় - যা প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষায় অনুপস্থিত। প্রচলিত অর্থনীতিতে যা বিক্রয় করলে অর্থ উপার্জিত হয় তাই হিসেবে গণ্য, যেমন মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য হারাম দ্রব্য। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে মাদকদ্রব্য কোনো সম্পদ নয় এবং এর ব্যবসাও হালাল নয়। কেননা মাদকাসক্তি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে এবং অপরাধ ও সন্ত্রাস প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং ইসলামের নৈতিক শিক্ষায় এ মূল্যবোধ যদি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে দেয়া যায়, তাহলে সমাজ সন্ত্রাসের থাবা থেকে মুক্তি পেতে পারে। 'জঙ্গি নির্মূলে উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক' শিরোনামে একটি জাতীয় সাপ্তাহিকে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটির শেষার্ধে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে এ বিষয়টির উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়। বলা হয়, "শুধু অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে দেশ থেকে জঙ্গি নির্মূল করা সম্ভব নয়। কোনো ধর্মেই যে হানাহানি বা সহিংসতার কোনো সুযোগ নেই সেই বিষয়টি সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। হিযবুত তাহরীরের তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে সম্প্রতি আশ্চর্য সব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এই জঙ্গি সংগঠনের বেশিরভাগ কর্মীই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ধর্মান্ধতা তাদের মনের ভেতর এমনভাবে প্রোথিত করা হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষিত হয়েও তারা জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মনের ভেতর থেকে ধর্মান্ধতা দূর করা জঙ্গি দমনের কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে।[৩]

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি: আল্লাহর প্রতি অনুরাগ ও ভীতি মানুষের হৃদয়ে সবসময় জাগ্রত থাকলে মানুষ অপরাধ প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কেউ যদি মনে এ বিশ্বাস রাখে যে তার সীমালংঘনের প্রতিবাদ পৃথিবীর কোনো মানুষ করতে না পারলেও আল্লাহ তা'আলার কাছে একদিন তাকে ধরা দিতে হবে, তাহলে সে অপরাধ করতে পারে না এবং কোনো ধরনের

---

[১] ড. শমসের আলী, সমাবর্তন বক্তৃতা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২৮ মার্চ ২০০০, পৃ.১৩

[২] আল-কুর'আন, সূরা আলাক: ১, ৪, ৫

[৩] সাপ্তাহিক ২০০০, ৩০ অক্টোবর ২০০৯, পূর্বোক্ত, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও জড়িত হতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাঁর নির্দেশ মেনে চল) এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।[১] অন্যত্র তিনি ঘোষনা করেন: "হে রাসূল (সা)! আপনি বলুন: মন্দ ও ভালো সমান নয় যদিও মন্দের বেশি পরিমাণ তোমাদেরকে চমৎকৃত করে। তাই হে জ্ঞানীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।[২]

বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে যদি মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাকওয়া বা অনুরাগ ও ভয়ের এই ধারা সঠিকভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে সন্ত্রাস দমনে কোনো কর্মসূচী নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

আখিরাতে বিশ্বাস ও জবাবদিহিতার ভয়: আখিরাতে বিশ্বাস ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় কেবল সন্ত্রাসই নয় বরং সকল রকমের দৃশ্য-অদৃশ্য অনাচার, পাপাচার ও অন্যায় নির্মূলের এক অব্যর্থ মহাব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়ে মহানবী (সা) আইয়ামে জাহিলিয়া যুগের বর্বর আরবদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে উড়িয়েছিলেন মহাশান্তির শ্বেত পায়রা। শান্তি ও শৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষরাই পরিণত হয়েছিলেন শান্তি রক্ষার সবচেয়ে বড় কর্মীতে। এসবই সম্ভব হয়েছিলো আখিরাতে বিশ্বাসের কারণে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং ভয় করে যে, সেদিন আল্লাহর সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে। দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী। এ জীবনের সুখ কিংবা দুঃখের অবসান একদিন অবশ্যই হবে। আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। সে জীবনে সুখ যেমন চিরদিনে তেমনি দুঃখও চিরদিনের। আখিরাতে তারাই চিরসুখী হবে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে। তাঁর অবাধ্য হবে না। কোনো অনাচার বা পাপাচারে লিপ্ত হবে না। কারো হক নষ্ট করবে না। আখিরাতের প্রবল বিশ্বাস তাই মানুষকে মন্দ কাজ থেকে অবশ্যই দূরে রাখবে। সে সন্ত্রাসের মত খারাপ কাজে কোনোক্রমেই জড়িত হতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) পরকালীন বিশ্বাস তত্ত্বের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর নিশ্চয় যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না, তারা সঠিক-সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[৩] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: "দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের জীবনই উত্তম। তাহলে তোমরা কি বুঝতে পার না?"[৪]

বাংলাদেশের সকল মুসলিমই আখিরাতে বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁদের এই বোধ ও বিশ্বাসকে যদি ইসলামের শিক্ষার আলোকে আরো শানিত করা যায়, তাদের মধ্যে আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় যদি জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য স্বতন্ত্র কোনো কর্মসূচী নেয়ার প্রয়োজন হবে না। সন্ত্রাস এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন: বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার কারণে সন্ত্রাস জন্ম নেয়। একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা আমাদেরকে এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজ উপহার দিয়েছে। যার ফলে দেশ-দেশান্তরে সন্ত্রাসের বিস্তৃতি ঘটেছে। কারণ "দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের ফলে মানুষের মনে পাশবিকতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরাধ হচ্ছে তারই ফসল বা উপজাত।[৫]

রাসূল মুহাম্মদ (সা) ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ে এমন এক সুষম অর্থ ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে গেছেন, যার সফল প্রয়োগ বিশ্বকে সন্ত্রাসের অতল গহ্বর থেকে তুলে আনতে পারে। ইসলামের স্বর্ণযুগে গোটা আরব জুড়ে একজন যাকাত গ্রহণকারীও খুঁজে পাওয়া যায়নি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে।

---

[১] আল-কুর'আন, ৯:১১৯ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

[২] আল-কুর'আন, ৫: ১০০ (قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[৩] আল-কুর'আন, সূরা মুমিনূন: ৭৪ (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ)

[৪] আল-কুর'আন, সূরা আনআম: ৩২ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

[৫] প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ, সন্ত্রাসবাদ, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ এপ্রিল ২০০২, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল মুহাম্মদ (সা) আল-কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী ধনী-গরীবের মাঝে অর্থনৈতিক সুসমন্বয় স্থাপনের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করেন এবং তাদের মাঝে সদ্ভাবের জন্ম দেন যা সমাজকে শান্তিময় করে তুলেছিলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি নির্দেশনা হলো: "এবং তাদের অর্থ-সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।[১]

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: "অর্থ-সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।[২]

বাংলাদেশের মুসলিমদের বোধ ও বিশ্বাস ব্যবহার করে যদি এদেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থা চালু করা যায় তাহলে এদেশেও বৈষম্যহীন ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যা একান্তভাবে দেশের সন্ত্রাস নির্মূলে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ধৈর্যের আদর্শ: সন্ত্রাস প্রতিরোধে বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের ধৈর্যের আদর্শ অনুশীলন ধারা গড়ে তোলা সম্ভব হলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূল করা সম্ভব হবে।

ধৈর্য মানুষের এক অপরিহার্য ও অনিন্দ সুন্দর গুণ। বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের কষ্ট স্বীকারে ধৈর্য, নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কষ্ট স্বীকারে ধৈর্য এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনকে সুখী এবং উত্তেজনামুক্ত রাখতে ধৈর্য আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে ধৈর্যশীল ব্যক্তি। তায়েফের ময়দানে ইট-পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়েও আল্লাহর দরবারে তায়েফবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যাতে চূড়ান্ত বিজয় তাঁরই হয়েছে। তিনি সেদিন আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করলে বা তাদের ধ্বংস চাইলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো। কিন্তু তিনি তা না করে ধৈর্যের মহিমায় তাদেরকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর এই সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত তায়েফসহ গোটা আরববাসী বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মহান আল্লাহ ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।[৩]

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদসমূহের ক্ষতি, জীবন ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন।[৪]

ইসলামের এ আদর্শ এবং মহান আল্লাহর এই নির্দেশ মেনে বাংলাদেশের মুসলিমগণ যদি জীবনের সকল পর্যায়ে ধৈর্যধারণের এই নীতি অনুসরণ করেন তাহলে দেশ থেকে সহজেই সন্ত্রাস দূর হতে পারে।

ক্ষমার আদর্শ: ইসলামের আদর্শ অনুসারে বাংলাদেশের মুসলিমগণ যদি ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন তাহলেও সন্ত্রাস অনেকাংশে কমে যেতে বাধ্য। কারণ ছোট ছোট নানা ঘটনায় প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিহিংসাই বাংলাদেশে অনেক রকমের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটনের জন্য দায়ী। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ আরো প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের সুযোগ তৈরি করে। ক্ষমা অপরাধীকে পর্যন্ত মর্মবেদনায় জাগ্রত করে। রাসূলুল্লাহ (সা)এর গোটা জীবন ক্ষমার মহিমায় উদ্ভাসিত। যে মক্কাবাসী তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করেছে, তাঁর সাথীদের অনেককে হত্যা পর্যন্ত করেছে, মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এতে রক্তপাতের পরিবর্তে হৃদয়বৃত্তিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছিলো। যারা ইসলাম থেকে দূরে ছিলেন তারাও ইসলামের মধ্যে চলে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিশোধ নিলে এই অপরাধীদের ইসলাম গ্রহণের কোনো সুযোগই থাকত না। তারা হয়তো নিহত হতো বা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে আবারো হামলা করার জন্য পুনর্গঠিত হতো। মহানবী (সা)এর ক্ষমার জন্য তেমন ঘটনা ঘটল না। বরং সকলের সমন্বিত শক্তি শান্তি রক্ষার কাজে নিবেদিত হলো।

---

[১] আল-কুর'আন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, সূরা যারিয়াত: ১৯

[২] আল-কুর'আন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ, সূরা হাশর: ৭

[৩] আল-কুর'আন, ২: ১৫৩ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

[৪] আল-কুর'আন, ২: ১৫৫ (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)

Dhaka University Institutional Repository

দয়া ও পরস্পর সহযোগিতা: ইসলামের সুমহান আদর্শের একটি বিশেষ দিক হলো দয়া করা এবং একে অন্যকে সহযোগিতা করা। বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে ঈমানী চেতনা তৈরি করে যদি দয়া ও সহযোগিতার এই আদর্শটি অনুশীলন করানো সম্ভব হয় তাহলে দেশের শান্তি পরিস্থিতির অভাবনীয় উন্নতি হতে পারে। সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মানুষ তখন ভালোবাসা ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কারণ দয়া ও পারস্পারিক সহযোগিতামূলক মনোভাব মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। ফলে সমাজে সন্ত্রাসের বীজ রোপিত হতে পারে না। রাসূল (সা) তাঁর অনুসারীদের সবসময় পারস্পারিক সহযোগিতার উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো। আল্লাহ তা'আলাও তোমার প্রতি দয়া করবেন।"[১]
তিনি আরো বলেছেন, "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন না।"[২] রাসূলুল্লাহ (সা) মুমিনদের পারস্পারিক ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বলেন, "মু'মিনগণ পারস্পারিক ভালোবাসা, দয়া এবং সহযোগিতায় এক দেহের মত। দেহের কোনো একটি অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে সমগ্র শরীর তার ব্যথায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে।"[৩]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশের সন্ত্রাস দূর করার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে সামাজিক সুবিচার ও বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলামের সুমহান আদর্শ হলো, ব্যক্তি ধনী, গরীব, ক্ষমতাশালী, ক্ষমতাহীন, আত্মীয়, অনাত্মীয়, মুসলিম, বা অমুসলিম যাই হোক না কেনো, তার প্রতি সুবিচার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় অথবা তোমাদের মাতাপিতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক আল্লাহ তাদের উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। তাই তোমরা ন্যায়বিচারে তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে জেনে রেখ, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সকল খবর জানেন।"[৪]

কর্মসংস্থান তৈরি: বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ কারণ বেকারত্ব। ইসলামের আলোকে এই অবস্থা নিরসন করে সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব। দেশের যাকাতদাতাদের বিপুল অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে দান না করে যাকাতের অর্থে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেখানে কর্মহীনদের কর্মের সুযোগ হতে পারে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মোপযোগী নয় বলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই এ দেশে বেশি। যাকাতের অর্থে বিভিন্ন কর্মমুখী ট্রেড চালু করে জনগণকে দেশে-বিদেশে কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়া যায়। কাজের প্রতি উন্মাসিকতা বা কাজ করায় অনাগ্রহ কিংবা কাজকে ছোট করে দেখার কারণেও দেশের একটি বিশাল অংশ বেকার হয়ে সময় কাটায় এবং সন্ত্রাসের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত কর্মপ্রেরণা তৈরি করা সম্ভব হলে তারা যে কোনো কাজ করতেই আগ্রহী হতো। কারণ ইসলামে নামায আদায় করা যেমন ফরয তেমনি ফরয কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা। কোনো মুমিন তাই কাজ না করে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন- "এরপর যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) উপার্জন করবে এবং আল্লাহর বেশি বেশি যিকর (স্মরণ) করবে - তাহলে তোমরা সফল হবে।"[৫]

ইসলামি দণ্ডবিধান কার্যকর করা: সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষকে সোচ্চার করা, সন্ত্রাস না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, আখিরাতের শাস্তি ও শান্তির কথা মনে করিয়ে দেয়া ইত্যাদি নানা কাজের মাধ্যমে মানুষকে সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কেউ কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে। এমন লোকদের জন্য ইসলাম সর্বোচ্চ শাস্তির ঘোষণা দেয়। ন্যায়নীতির সাথে যদি এ শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশে সন্ত্রাস চিরদিনের জন্য নির্মূল হতে বাধ্য। আল্লাহ বলেন: "যারা আল্লাহ

---

[১] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[২] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, পূর্বোক্ত, কিতাবুয যুহদ

[৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল আদব

[৪] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا আল-কুর'আন, ৪: ১৩৫

[৫] فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল-কুর'আন, ৬২: ১০

Dhaka University Institutional Repository

ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো – তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১]

সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ড এবং এর প্রতিকার: সামাজিক সমস্যার আওতাভুক্ত হত্যাকাণ্ড বলতে অন্যায় হত্যাকাণ্ডকে বুঝানো হয়। কেননা আইনগত কারণে যে হত্যাকাণ্ড তা সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাকে হত্যাকাণ্ড বলা হয় না। তার নাম মৃত্যুদণ্ড। যেমন ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় সন্ত্রাসী এবং ক্ষেত্র বিশেষে জুয়াড়ি, চোর ও মদ্যপায়ীর বিরুদ্ধে হত্যার বিধান রয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ বিধান বাস্তবায়ন করা মানুষের শান্তি, সংহতি ও স্বস্তির জন্যে অনিবার্য। এগুলো সামাজিক সমস্যা নয়, বরং সমস্যা থেকে মানুষকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত রাখার ব্যবস্থা মাত্র। এমনিভাবে সে হত্যাকাণ্ডও সামাজিক সমস্যা নয় যা অনিচ্ছাকৃত এবং আত্মরক্ষামূলক। যেমন কাউকে সন্ত্রাসী আক্রমণ করলো বা ছিনতাইকারী ধরলো। এমন অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি এই আক্রমণ ও ছিনতাই প্রতিরোধের চেষ্টা করতে যেয়ে যদি আক্রমণকারী কাউকে মেরে ফেলে তাহলে তাকে অন্যায় বা সমস্যা বলা হবে না। সামাজিক সমস্যা হলো সেই হত্যাকাণ্ড যা আইনের বিরুদ্ধে করা হয়। যার উদ্দেশ্য থাকে যুলুম, ক্ষমতা দখল বা সম্পদের ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠা।

হত্যা প্রতিরোধের জন্যে ইসলাম হত্যাকে অত্যন্ত ভয়াবহ একটি সামাজিক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলো বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করলো সে যেনো সকল মানুষকে হত্যা করলো।[২]

অন্যত্র তিনি বলেন, "যে হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন তোমরা সে হত্যা করো না। অবশ্য ন্যায়সঙ্গত হত্যার কথা ভিন্ন।[৩]

আয়াতে ন্যায়সঙ্গত হত্যা বলতে অপরাধের কারণে সাব্যস্তকৃত মৃত্যুদণ্ড বুঝানো হয়েছে। এ মৃত্যুদণ্ডও ব্যক্তি নিজে কার্যকর করতে পারবে না। আইনসঙ্গতভাবে তা কার্যকর করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেছেন, "হে মানুষ! তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের সময় পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পরস্পরের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান তেমন হারাম যেমন হারাম আজকের দিন, এই শহর এবং এই মাস।[৪]

হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে ইসলাম মানুষকে আখিরাতের মহাবিপর্যয় সম্পর্কে সর্তক করেছে। ব্যক্তির আমল যাই থাক, কাউকে হত্যা করে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাই তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে বিরত না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাবে ধরবে ও হত্যা করবে। এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট অধিকার আমি তোমাদেরকে দিয়েছি।[৫] "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে তার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে এবং তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর অভিশম্পাত। আর তার জন্যে তিনি ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে তার জন্য জান্নাত হারাম।[৭]

অন্যায় হত্যাকাণ্ড হারাম ঘোষণা এবং তার জন্যে পরকালীন শাস্তির অঙ্গীকারের পরও কেউ যদি হত্যার কাজে লিপ্ত হয় ইসলাম তার প্রতিবিধানে বিস্তারিত বিধান দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "মুমিনগণ! হত্যার ব্যাপারে কিসাসের[১] বিধান তোমাদের

---

[১] إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল-কুর'আন, ৫: ৩৩

[২] مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا আল-কুর'আন, ৫: ৩২

[৩] وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ আল-কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৩

[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুল হজ

[৫] فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا কুর'আন, ৪: ৯১

[৬] وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا আল-কুর'আন, ৪: ৯৩

[৭] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, কিতাবুল জিহাদ

Dhaka University Institutional Repository

ওপর ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বিনিময়ে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী। এরপর তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ইহসানের সাথে তাকে তা প্রদান করবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। হে চক্ষুষ্মানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, তাতে তোমরা সাবধান হতে পার।[২]

এভাবে সকল স্তরে হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে ইসলাম হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। এ বিধান কার্যকর হলে অন্যায় হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে।

ইসলামি শিক্ষা প্রবর্তন: সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য ইসলামের চেতনা কার্যকর করা বা নৈতিকতা কাজে লাগানো অথবা আখিরাতের ভয়, জবাবদিহিতার প্রেরণা, তাকওয়া কিংবা অন্যান্য যে সকল বিষয় বাস্তবায়ন করার কথা এ নিবন্ধে এতক্ষণ ধরে বলা হয়েছে তার কোনো কিছুই সম্ভব বা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে না যদি এই দেশে ইসলামি শিক্ষা প্রবর্তন করা না যায়। কারণ ইসলামি শিক্ষা ছাড়া মুসলিমদেরকে আর কোনো শিক্ষাই ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। প্রকৃত ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারবে না এবং মুসলিম দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে তার করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণাও লাভ করতে পারবে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রাণের আবেগ এবং বিশ্বাসের চেতনা ধারণ করার জন্য যদি ইসলামি শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় তাহলে আলাদা কোনো কর্মসূচী নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। সন্ত্রাসের ক্ষতিকর কোনো দিক জানিয়ে জনসচেতনতা তৈরিরও দরকার হবে না। বরং মুসলিমগণ সক্রিয়ভাবে নিজস্ব প্রেরণাতেই সন্ত্রাসের প্রতিপক্ষ হয়ে যাবেন।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো, এ দেশের এ যাবতকাল পর্যন্ত বিদ্যমান কোনো সরকারই ইসলামি শিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন না। যে কারণে সাধারণভাবে ইসলামি শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব যদি নাও হয়, ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তন করেও সন্ত্রাস রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যায়। সাম্প্রতিক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন[৩] বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে একশ্রেণীর তথাকথিত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ইসলামের নামে বেশকিছু জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলেছে। এগুলোর মধ্যে হিযবুত তাহরীর, জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ বা হুজি, হিযবুত তাওহীদ, উলামা আঞ্জুমান আল-বাইয়্যিনাত, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি বা আইডিপি, ইসলামি সমাজ, তৌহিদ ট্রাস্ট, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ বা জেএমজেবি, শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, তাআমির উদ্দীন বা হিজাব আবু উমর, আল্লাহর দল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য[৪] দলগুলোর সাথে বাংলাদেশের কোনো প্রথিতযশা আলেমেদীন জড়িত নন। যারা এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক, অর্থসংস্থানকারী তারা কেউ-ই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নন। ইহুদি-খ্রিস্টান-হিন্দু চরমপন্থীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। চক্র তিনটি সম্মিলিতভাবে এমন পন্থায় সাধারণ মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ও ধর্মভীরু গরীব মুসলিমদেরকে বিশেষ করে মাদরাসার ইয়াতীম শিক্ষার্থীদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করছে যে, তারা বুঝতেও পারছে না, জিহাদের নামে তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

---

[১] কিসাস অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হত্যা নাযি করা। কেউ যদি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে এর শাস্তি হিসেবে ইসলাম তাকে হত্যা করার যে বিধান দিয়েছে তাকে কিসাস বলে। (প্রফেসর আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, তানভীরুল কুর'আন, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৭)

[২] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ আল-কুর'আন, ২: ১৭৮-৭৯

[৩] প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৩

[৪] সাপ্তাহিক ২০০০, ৩০ অক্টোবর ২০০৯, বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৫, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এ পর্যন্ত যে আলোচনা আমরা করেছি, তাতে দেখা গেছে ইসলামে জঙ্গীবাদের কোনো স্থান নেই। বিনাবিচারে, বিনা কারণে কারো উপর হামলা করার অনুমতি নেই। যুদ্ধে অংশ নেয়নি বা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনো ক্ষতিকর ভূমিকা রাখেনি এমন কোনো অমুসলিম পুরুষের বিরুদ্ধেও ইসলাম সন্ত্রাসী আচরণ পরিচালনার অনুমতি দেয়নি। কাউকে হত্যা করার তো প্রশ্নই আসে না। সেখানে ইসলামের নামে যারা সাধারণ মানুষ হত্যা করে, বোমা হামলা করে, দেশেদেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে – তারা যে ইসলামের পক্ষের লোক নয়– তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। মানুষ যেন কেবল দাড়ি-টুপি আর মাদরাসায় পড়া লোক দেখে তাদেরকে ইসলামের আদর্শ না ভাবে সে জন্যই বাংলাদেশে সাধারণভাবে ইসলামি শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। তাহলেই আর এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি তৈরি হবে না। কারণ সত্যি কথা হলো, ধর্মী শিক্ষা না থাকলে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ থাকে না। সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলে না। বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিফল হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষার কারণে দেশে জঙ্গি তৈরি হচ্ছে, এমন অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তথ্য-প্রমাণ ছাড়া ধর্মীয় ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করা উচিত নয়। রসায়ন শাস্ত্র শিখে মানুষ বোমা তৈরি করলেও রসায়ন শাস্ত্র পড়ানো বন্ধ হয়নি। প্রয়োজনে ধর্মীয় শিক্ষাকে আরো শক্তিশালী করে শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ব্রিটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেসব নীতির কোনো সম্পর্ক না থাকায় কোনোটিরই বাস্তবায়ন করা হয়নি, এবারও হবে না।[১]

বাংলাদেশ সন্ত্রাস পীড়িত একটি অনুন্নত জনপদ। এদেশের অনুন্নয়নের অনেক কারণের মধ্যে সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে একটি বড় কারণ। দেশের শিক্ষা, শিল্প, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল কার্যক্রম সন্ত্রাসের কারণে ব্যাপক পশ্চাদপদতার শিকার। নানাভাবে নিগ্রহের শিকার সাধারণ মানুষ। অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশের মানুষের মনে আছে ইসলামি চেতনা, বুকে আছে ঈমানী প্রেরণা। অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুর পরে আরেকটি স্থায়ী জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে। সে জীবনের সুখকে স্থায়ী সুখ হিসেবে জানে। সে জীবনের দুঃখকে চিরস্থায়ী সর্বনাশ হিসেবে ভয় পায়। তারপরও এদেশের মানুষ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর হাতে জীবন, সম্পদ ও সম্মান হারানোর ভয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। এর কারণ, এদেশের মানুষ মুসলিম ঠিকই কিন্তু তাদের বিশ্বাসের ভিতটি বড় দুর্বল। ইসলামকে জানার গণ্ডি এবং নিজেদের করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রটি ভীষণ সংকীর্ণ। ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানগত এই দীনতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলেই মানুষ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে। তখনই সার্থকরূপে ব্যক্তি পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। তখনই যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করা হয়েছিলো, সেই স্বপ্ন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে। মানুষ পাবে সুখী-সমৃদ্ধ মানব জনম।

[১] প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ও জাতীয় মূল্যবোধ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২০০৯ (প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৩)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বস্তুত বাংলাদেশ একটি সমস্যা সঙ্কুল দেশ। দারিদ্র্য এর অধিকাংশ সমস্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ। দরিদ্র বলেই এ দেশের মানুষকে শুধু পেটের ভাত আর পরনের কাপড় যোগানের জন্য নানা কলা-কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। নীতিহীন কাজ করতে হয়। ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে, আত্মসম্মান ও আত্মশ্লাঘার জলাঞ্জলি দিয়ে চরম ঘৃণার্হ ব্যক্তির পদলেহন করতে হয়। ক্রমাগত দরিদ্রতার জন্য সকলে মিলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস পায় না। কালাতক দারিদ্র্য শারীরিক শক্তি, আর্থিক সঙ্গতির সাথে সাথে বাংলাদেশের মানুষের মানসিক দৃঢ়তাও অনেক ক্ষেত্রে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত একেবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থা হয়নি। এখনও বাংলাদেশের মানুষের উপর বিশ্বাস রাখা যায়। এখনও সাহস নিয়ে বলা যায়, এ দেশের মানুষের মনের ভেতর ভালোবাসা আর ঔদার্যের যে মহান জগত তাকে সঠিকভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব হলে, যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হলে এবং সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা গেলে এই মানুষগুলোকে দিয়েই সমস্যামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশের মানুষ জন্মগতভাবে সংগ্রামী। অভ্যাসগতভাবে পরিশ্রমী। নানা কারণে বর্তমানে তাদের সেই সংগ্রামী চরিত্র আর পরিশ্রমী অভ্যাস হয়তো আড়াল হয়ে রয়েছে। ধর্মীয় চেতনায়, বিশ্বাসের আবেগে আড়াল হওয়া সেই মানসিকতা ও অভ্যাসকে যদি পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা সম্ভব হয় তাহলে আবারো একটি মুক্তিযুদ্ধ এই বাংলাদেশের মানুষই করে দিতে পারবে, যে যুদ্ধের মূলমন্ত্র হবে অশিক্ষা, অবিচার, আর্থিক অনাচার, জনসংখ্যা স্ফীতি, ধূমপান ও মাদকাসক্তি, দারিদ্র্য, নারী নির্যাতন, নৈতিক অবক্ষয়, বেকারত্ব ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। ত্রিশ লক্ষ শহীদের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে লোকেরা একটি দেশ নিয়ে আসতে পেরেছে, রক্তের বিনিময়ে মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, যুগ-যুগান্তরে প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ের সাথে, দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাবনার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পেরেছে – সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তাদের ব্যর্থ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রয়োজন শুধু এ দেশের মানুষের বিশ্বাস ও আবেগের জায়গাগুলো স্পর্শ করে সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সামষ্টিক প্রচেষ্টা চালানো। কারণ বাংলাদেশের মানুষের অনেক দুর্নাম আছে, বাংলাদেশের মানুষ না জেনে না বুঝে ধর্ম পালন করে তা ঠিক, বাংলাদেশের মানুষ হুজুগে পাগল তাও ঠিক – আবার এটাও ঠিক যে, বাংলাদেশের মানুষকে সঠিকভাবে নির্দেশনা দিলে, যথার্থ নেতৃত্ব দিলে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বাংলাদেশের মানুষ কখনো পিছু হটে না। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা,[১] হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন,[২] সিপাহী বিদ্রোহ[৩], ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ[৪] কৃষক বিদ্রোহ[৫] বারবার এ আশ্বাসই প্রদান করে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সমস্যাসমূহ সমাধানের যে যে পথ এ গবেষণায় উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো সঠিক কাজে লাগালে সমস্যামুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আর স্বপ্ন থাকবে না বরং বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে।

---

[১] মীর নিসার আলী তিতুমীর বৃটিশদের বিরুদ্ধে সাধারণ সামর্থ নিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বাঁশ দিয়ে কেল্লা তৈরি করেছিলেন। ইংয়েজরা পরে কামান দিয়ে তাঁর বাঁশের কেল্লা গুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি শহীদ হয়েছিলেন। (আবুল আসাদ, আমরা সেই সে জাতি, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ.২৩-২৭)

[২] হাজী শরীয়তুল্লাহ এ আন্দোলনের জনক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এ আন্দোলন শুরু হয়। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে এটি বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ফুলিয়া, মোমেনশাহী এলাকায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪০ সালে শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া এ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৮৬২ সালে দুদু মিয়ার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। (ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর ২০০৩ পৃ.১১-১৪)

[৩] পলাশীর পরাজয়ের ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নানা কারণে এ বিদ্রোহ সফল না হলেও এতে বৃটিশ সরকার তার সে সময়কার চরমপন্থা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। (ড. আবুল ফজল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪-১৮)

[৪] ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ১৭৬০ সালে ফকির বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৮৮৭ সালে কোম্পানির সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে মজনু শাহ নিহত হলে এ বিদ্রোহের অবসান ঘটে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী প্রমুখ। (ড. আবুল ফজল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৮-৯)

[৫] ১৭৭৩ সালে পাবনায়, ১৭৮৩ সালে রংপুরে এবং ১৮৫৯-৬১ সালে খুলনা, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, পাবনা প্রভৃতি এলাকায় কৃষক ও নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এর ফলে বিদ্রোহী কৃষক-চাষীদের উপর কোম্পানির লোক এবং জমিদারদের নিপীড়ন যেমন বাড়ে তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষকগণ তাদের অধিকারও লাভ করেন। (ড. আবুল ফজল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৯-১১)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

- আল-কুর'আন
- তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, আল-কুর'আনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২২তম মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৯
- প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, তানভীরুল কুর'আন, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৯
- মুফতী মুহাম্মদ শাফী, পবিত্র কোরআনুল করীম (মূলঃ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন) অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ঢাকা, ১৪১৩ হিজরি
- মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, তফসীরে নূরুল কুর'আন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা জুলাই ১৯৮৮
- ইসমাঈল ইবনে কাছির, তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম, দারুল মা'আরিফ বৈরুত, ১৯৮৩ খ্রি.
- আল-জাসসাস, আহকামুল কুর'আন, দারুল মা'আরিফা, কায়রো ১৪০১ হিজরি
- মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুর'আন, তাহকীকুত তুরাস, কায়রো ১৯৮৭ খ্রি
- মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বয়ান আত-তাবীলিল আ'ইল কুর'আন, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০৫ হি.
- রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারায়িব আল-কুর'আন, মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, কায়রো ১৩২৪ হি
- সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুর'আন, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮০
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪০৯ হিজরি
- আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪০৮ হিজরি
- আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ, সুনানে নাসাঈ, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪১০ হিজরি
- আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানে তিরযিমী, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪০৯ হিজরি
- আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনানে আবূ দাউদ, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪০৮ হিজরি
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪১১ হিজরি
- আবূ আব্দুল্লাহ মালিক ইবন আনাস, মুয়াত্তা, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
- আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, দারুল মা'আরিফ, বৈরুত, ১৪০৯ হিজরি
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, সুনানে দারেমী, দারুল মা'আরিফ, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি
- আবূ আব্দুল্লাহ হাকীম, আল-মুস্তাদরাক, আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
- আবূ জাফর আহমদ আত-তাহাবী, শারহু মা'আনিল আসার, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, বৈরুত ১৩৯৯ হিজরি
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী, মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রহ), অনু. মুহাম্মদ মূসা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা আগস্ট ১৯৮৮
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, তাজরীদুস্ সিহাহ্ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস) ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা জুন ১৯৯৭
- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, কুতুবখানা রশিদীয়া দিল্লী ১৩৮৭ হিজরি
- আব্দুল্লাহ যায়ল'ঈ, নাসবুর রায়াহ, দারুল হাদীস, কায়রো ১৩৫৭ হিজরি
- ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খায়াজ, দারুল কুর'আন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, লাহোর ১৯৮৬
- আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৯৮৫ খ্রি.
- আবুল হাসান আল-বালাযুরী, ফতুহুল বুলদান, দারু মাকতাবাতিল হিলাল, বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি

Dhaka University Institutional Repository

- আহমাদ শালাবী, আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া, দারুল আরব, কায়রো ১৯৯১ খ্রি.
- আবূ মুহাম্মদ বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী, মাকতাবাতে রশিদীয়া, দিল্লী ১৯৮১ খ্রি
- হাফিয ইবনে হাযম, আল-আহকাম, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, কায়রো ১৪১০ হিজরি
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, মাকতাবাতে রশিদীয়া, দেওবন্দ, ১৪১২ হি.
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, কুতুবখানা রশিদীয়া, দিল্লী ১৩৭৩ হিজরি
- সাইয়েদ কুতুব, আল-ইসলাম ওয়া সালামুল আলাম, দারুস সালাম, বৈরুত ১৯৯৩ হিজরি
- আশ-শাওকানী, নায়লুল আওতার ৫ম খণ্ড, দারুল হাদীস, কায়রো ১৯৯৩
- সাইয়েদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, দারুল ফাতহ লিল ইলমিল আরাবী, কায়রো ১৯৯০ খ্রি.
- ড. আবদেল রহীম উমরান, তানজীম আল-উসরাত ফীত তিরাসিল ইসলামী, জামেয়া আল-আযহার, কায়রো, ১৯৯৪
- ফতওয়ায়ে আলমগিরী, মাকতাবাত আল-মাজিদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৬ হিজরি
- ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, দারুল ফিকর, বৈরুত ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
- মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, দারুল মাআরিফাহ, বৈরুত, তারিখ বিহীন
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা পঞ্চম সংস্করণ মে ২০০৭
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা তৃতীয় সংস্করণ জুন ১৯৯৫
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইফাবা, ঢাকা ২০০৪
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা ২০০৯
- অ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম, সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ঢাকা, ১৯৯১
- আ.স.ম নুরুল ইসলাম ও মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচী, বইপত্র, ঢাকা ২০০২
- আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা-১৯৮০
- আব্দুল মতীন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, মাদল প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫
- আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, জুলাই ২০০২
- আব্দুল হাফিম সরকার ও মোঃ ফারুক হোসাইন, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা ঃ সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৬৫ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৯৯
- আব্দুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭
- আনু মুহাম্মদ, অর্থনীতি-৮৮ : প্লাবন ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য মন্দার বছর, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, বাংলাদেশ বর্ষ পত্র ১৯৮৯, ১৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৯
- আল-কাওসার, কাওসার পাবলিকেশান্স লি, ঢাকা রবিউল আউয়াল ১৪০০ হিজরি
- আশরাফুল ইসলাম, সরকারকে কম সুদে ঋণ দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনীহা, নয়া দিগন্ত, ৪ নভেম্বর ২০০৯
- আফরোজ হোসেন চৌধুরী, আন্তর্জাতিক নারী দিব ও বর্তমান চিত্র, আজকের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০০
- আখতারুল আলম, ইতিহাসের বাংলা ঃ বাংলার ইতিহাস, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯
- আজাদুর রহমান চন্দন, ধর্ষণ, খুন ও নারী নির্যাতন: প্রতিকারহীন না প্রতিকারযোগ্য বাস্তবতা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট, ৪র্থ-১১শ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮, ঢাকা
- ইউনিসেফ, বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার, ঢাকা ১৯৯৭
- ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, অনু: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫
- ইমাম গাযালী, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ভাষান্তর: মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা - সেপ্টেম্বর, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

- ❒ এ. কে. নাজিবুল হক, মন ও মনোবিজ্ঞান, সম্পাদনা: এ. খালেক ও এ. ইউ. আহমেদ, ঢাকা ১৯৮৯
- ❒ এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৫
- ❒ এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৯৯
- ❒ এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম, ইসলামে নেশা, মা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩
- ❒ কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৭৯
- ❒ গোলাম মোস্তফা কিরন, আজকের বিশ্ব, প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, ঢাকা ৩৬তম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৮
- ❒ গোলাম হোসায়ন সলিম, রিয়াযুস সালাতীন, বাংলা অনুবাদ: বাংলার ইতিহাস, আবদুর উদ্দীন অনূদিত, ঢাকা, ১৯৭৪
- ❒ জাতিসংঘ ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্র, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯১
- ❒ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন-বেইজিং, ঢাকা ১৯৯৫
- ❒ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড, বাংলাদেশ ঃ মাটি ও মানুষ, সাহিত্য কথা, ঢাকা ১৯৮৬
- ❒ ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৪
- ❒ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, আগস্ট ২০০৬
- ❒ ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর, জানুয়ারি ২০০৩
- ❒ ড. আহমদ আলী, ইসলামের শান্তি আইন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৯
- ❒ ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশের দারিদ্র্য ঃ কিছু সমস্যা ও কিছু সুপারিশ, ঢা.বি. পত্রিকা, ১৪শ সংখ্যা, ১৯৮১
- ❒ ড. মাহবুব হোসেন, বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা ১৯৮৬
- ❒ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, মার্চ ২০০৩
- ❒ ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ইফাবা ঢাকা ১৯৮০
- ❒ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩
- ❒ ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯০
- ❒ ড. রঙ্গলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, প্রায়ন্তিক সমাজবিজ্ঞান, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০৩
- ❒ ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, মেরিটফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা ২০০৭
- ❒ ড. শমসের আলী, সমাবর্তন বক্তৃতা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২৮ মার্চ ২০০০
- ❒ ড. কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য : স্বরূপ ও সমাধান, ভান্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৫
- ❒ ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ঃ কিছু ভাবনা, অগ্রপথিক, ঢাকা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯
- ❒ ড. খ. ম. রেজাউল করিম, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, নয়া দিগন্ত, ২৬ জুন ২০০৯
- ❒ ড. হাসান জামান, ইসলাম অর্থনীতি, ইফাবা, জুলাই ১৯৭৭
- ❒ ড. হাসান জামান, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ঢাকা-১৯৬৭
- ❒ তানজীমুল ফারায়েদ আরবী-বাংলা শরহে আকাইদ লিন্নাসাফী, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী, নোয়াখালী, ২০০৫ খ্রি.
- ❒ নূর কামরুল নাহার, নারী নির্যাতন : মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি, দৈনিক যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০০১
- ❒ নূরুল ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, মাসিক পৃথিবী, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০০০
- ❒ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৯৮
- ❒ প্রফেসর আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, আনোয়ারুল হাদীস, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা ২০০৯
- ❒ প্রফেসর আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

- প্রফেসর আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, ইসলামী আকায়েদ শাস্ত্র আল কালাম, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৯
- প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকর্ম, কোরআন মহল–ঢাকা, মে ২০০৭
- প্রফেসর এ.কে.এম আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ১৯৯০
- প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী খান, সালাহ উদ্দীন ও মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থনীতি, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা ২০০১
- প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ, সন্ত্রাসরি, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ এপ্রিল ২০০২
- প্রতিমা পাল মজুমদার, নগর দারিদ্র্য : সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা, অরনী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২
- পরিসংখ্যান পকেট বুক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৩
- পরিসংখ্যান পকেট বুক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা ২০০৫
- ফাতেমা রেজিনা, বাংলাদেশে অপরাধ সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের ধরন ঃ প্রেক্ষাপট ২০০৮ সালের সংবাদপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৯, অক্টোবর ২০০৭/কার্তিক ১৪১৪
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ পৌষ ১৪০৭, ৮ম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৩
- বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানায় ব্যয় নির্ধারণ জরিপ, ১৯৯৫–৯৬
- বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, নারী নির্যাতন লিফস সংখ্যা ১৯৯৮
- বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস), বিবিএস, ২০০৫–০৬
- বশিরা মান্নান, বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের দৈনন্দিন জীবন : একটি পর্যালোচনা, দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ১১ সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ১৯৯৬
- বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫
- বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢা.বি. ১৯৯৩
- মোস্তফা হাসান, মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৫৯, ৬০, ৬১ অক্টোবর ১৯৯৭, জুন ১৯৯৮
- মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন ও বুদ্ধদেব বিশ্বাস, যৌনকর্মীদের এইডস সচেতনতা : একটি সমাজবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮০, অক্টোবর ২০০৪
- মোঃ রেজাউল ইসলাম, বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে মাদকাসক্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬৮, অক্টোবর ২০০০
- মোঃ রেজাউল করিম, বাংলাদেশে আর্থ–সামাজিক অবস্থা, পরিবার কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৮৭
- মোঃ আজহার আলী, পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২
- মোঃ আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন ঃ নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি, কোরআন মহল, ঢাকা ২০০০
- মোঃ রুহুল আমিন, আমার বিশ্ব, ওয়িয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮
- মোঃ শামছুল আলম ও মোঃ জহিরুল ইসলাম, ইসলামের শিক্ষাদর্শন, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি–জুন ২০০৭
- মনসুর মুসা (সম্পাদনা), বাঙলাদেশ, এম.আই চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা–১৯৭৪
- এ. কে. আযাদ, আদর্শ খেলাফতের নমুনা, অনু. প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেন্টার, ঢাকা, তা.বি.
- মওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

- মানবাধিকার ও জেন্ডার বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার, ব্র্যাক সেন্টার ইন, ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০০৯
- মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, অনু. আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৮
- মীর আফরোজ জামান, মাদকের ভয়াল ধ্বংসের মুখে যুব সমাজ, সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা, ২১ সংখ্যা এপ্রিল ২০০০
- মুস্তফা আস-সিবায়ী, অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, ইসলামী সভ্যতায় মানব প্রেম, মাসিক পৃথিবী, মার্চ ১৯৯৯
- মুহাম্মদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ইফাবা, মে ২০০৭
- মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮
- মুহাম্মদ আবদুর রহীম, যাকাতের প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আল-কুর'আনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, ইফাবা ১৯৯০
- মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত (প্রবন্ধ), দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ইফাবা, এপ্রিল ২০০৯
- মুহাম্মদ সাম্মাদ, মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
- মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, আত-তারীখুল ইসলামী, ঢাকা ১৯৮৮
- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা এপ্রিল ১৯৯০
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ (ড. এম এ আজিজ ও ড. আহমদ আনিসুর রহমান, প্রাচীন বাংলাদেশ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
- সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অনুচ্ছেদ ১৭
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলাম পরিচিতি, অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা জুলাই ১৯৭৯
- সাঈদা গাফফার খালেজ ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের মাদকাসক্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৮১, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
- সম্মিলিত নারী সমাজ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ৮ মার্চ ১৯৯৭
- সিরাজ কাজী, শিশু, কিশোর, নারী অপহরণ, ধর্ষণ খুন ও তামাশা প্রবণ প্রাজ্ঞজন, সাপ্তাহিক উষা, ৪র্থ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ঢাকা ২০০২
- সুভ্যেনিয়ার ২০০২, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
- সুকুমার সাহা, মাদকদ্রব্য, সমাজ ও আইন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১
- সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদঃ মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ.১২৮
- সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৩
- হযরত আলী (রা)এর প্রশাসনিক চিঠি, অনুবাদঃ খুরশিদ আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬
- হযরত রাসূলে করীম (সা) ঃ জীবন ও শিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৩১৮
- হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, আগস্ট-২০০০
- হুমায়ূন আহমেদ, আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ২০০৬
- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি), গবেষণা প্রতিবেদন রিপোর্ট, ২০০৯
- দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা
- দৈনিক সংবাদ, ঢাকা
- দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা
- দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা
- দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা
- দৈনিক সমকাল, ঢাকা
- দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা
- দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা
- বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা
- ইনডিপেন্ডেন্ট, ঢাকা
- সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা
- সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা
- সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা
- সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ঢাকা
- Abdul Halim, The Enforcement of Human Rights, Dhaka 1995
- Abul Hashim, The Creed of Islam, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka 1987
- Advanced learner's Dictionary, Oxford University Press, 2002
- Ahmad Gamil Mazzara, Islam, Democracy and Socialism, Working England, Islamic Review, April 1962
- Ahmed, Employment in Bangladesh, in E.K.G. Robinson & K. Griffin (eds), The Economic Development of Bangladesh within a Socialist Framework, The Macmillan Ltd, London 1974.
- Anton Nemilov, Biological Tragedy of Woman, London 1932
- Arnold Green, The Middle Class Male Child and Neurosis, London, 1961
- B. Klienmuntj, Essentials of Abnormal Psychology, Harper and Row Publishers, New York 1974
- 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh, Government of The People's Republic of Bangladesh, 28th Edition, March 2009
- Barkat-e-Khuda, The Use of Time and Underemployment in Rural Bangladesh, University of Dhaka, 1982
- Barnes. H. F. and Ruedi O. M. The American Way of Life, New York, 1951
- Bengali-English Dictionary, Bangla Academy, Dhaka, October 2003
- Charles A. Bucher et. al. The Foundation of Health, Meredith Publishing Co, New York
- Charles Booth, Labour and Life of the People in London, London 1902
- Clearance Marsh Case, 'What is Social Problem' in 'Analyzing Social Problems' J. E. Nordskog et. al. (eds), The Dryden Press, New York, 1965
- Committee on Maternal Health, Baltimore, 1947
- D. Stanley Eitzen, Social Problem, Allyn and Bacon Inc, Boston, 1986
- Dale Yoder and Herbert G. Heneman, Labor Economics and Industrial Relations, Cincinnati, 1959
- David C. Kurten & Felipe B. Alfonso, Bureaucracy and Poor: Closing the Gap, McGraw-Hill International Book Co. New York, 1981

Dhaka University Institutional Repository

- David Dressler, Sociology : The Study of human interaction, New York, 1969
- David M. Levy, Maternal Over Protection, New York, 1943
- Dept. of Narcotics Control, Dhaka, Oct.-1990
- Desia, Rural Development of Rural Poor, Ahmadabad, 1991
- Dr. H. M. Sadek, Poverty Eradication: An Islamic Perspective, Thoughts on Islamic Economics, Vol.6
- Dr. Md. Nurul Islam, Socio-Economic Problems of The Urban Poor in Bangladesh : An Overview, The Dhaka University Studies, Part – A, Vol. 56, No. 2, December 1999
- Dr. Mohammad Abdur Rob and Mostaq Mohammad, Violence against city women, The Independent, 10 September 1999, Dhaka
- Dr. Rajendra K. Sharma, Social Problems and Welfare, New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors, 1998
- Dr. Ziauddin Ahmed, Islam, Poverty and Income Distribution, IFB, Dhaka 1991
- Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol.IV, (Toleration), Oxford Press, 1993
- ESCAP, Country Monograph, Series No.8, 'Population of Bangladesh, 1985
- Eurl Rabington & Martin S. Weinberge, The Study of Social Problems Fine Perspectives, 2nd Edition, Oxford University Press, New York 1977
- F M Giddings, Principles of Sociology, 3rd edition
- F. Harbison & C.A. Myers, Education, Manpower and Economic Growth, McGraw Hill Inc, New York 1964, p.189
- Gillin, etal, Social Problems, The Times of India Press, Bombay, 1969
- Golam Azam, Drug Addiction in Family Life: A Study of Rajshahi Presentation, The Journal of Social Development, ISWR, Dhaka University, Vol.10, No.1, 1995
- Government of Bangladesh, Planning Commission, 1998 Fifth Five Year Plan 1997-2002, Ministry of Planning
- Hamida Akter Begum, Who are the Addicted?, A study of the Socio-Economic Background of Drug Addicts in Dhaka City, in Understanding the drug addicts : Some Psychological Studies, Centre for Psycho-Social Research and Training, Dhaka 1991
- Harold A. Phelps, Contemporary Social Problems, Prentice Hall Inc, New York, 1947
- HIV in Bangladesh: Where is it going? Background Document for the Dissemination of the Third round of National HIV and Behavioral Surveillance, National AIDS/STD Program, Directorate General of Health Services, MOHFW, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, November 2001
- Hornell Hart, "What is Social Problem (1923)" in Analyzing Social Problems, J. E. Nordskong and others ods, (eds), The Dryden Press, New York, 1950
- Huxley, Aldous, Brave New World Revisited, 1959
- International Encyclopedia of the Social science, The Macmillan Company, USA, 1968
- Introduction of the family, London 1961
- J. L. Hanson, A Dictionary of Economics and Commerce, London 1975
- J.E. Nordskog, Analyzing Social Problem, The Dryden Press, New York, 1956

Dhaka University Institutional Repository

- J.J. Grant & W.G. Pirtle, Social Problems: as human concerned, Bowel & Fraser Publishing Co, San Francisco, 1976
- Jaeed Eiasin, Of Faith and Citizenship : My American Jihad, Graduation Ceremony Speech, Harvard University, U.S.A 6 June 2002
- Just Fairland & J. R. Perkins, Bangladesh – The Test Case of Development, University Press Ltd, Dhaka, 1983
- Jyoti Talukder, Violence Against Women in Nepal, Country Report CWCD, Nepal, 1997
- Key Note Paper, Workshop on CMS, 09 March 1998, Organized by DNC and UNDC
- Kimbal Young & W Mack Raymond, Sociology and Social Life, New York, 1962
- Landis Paul H. Social Problems, Chicago-1959, p.102
- M. A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Dhaka-1968
- M. Anamul Haque, A History of Sufism in Bengal, Dhaka, 1980
- Makee M. Robertson, Social Problem, New York, 1975
- Mathas, An Essay on Population and it effects, the future Improvement of the Society, London, 1798
- Md. Nurul Islam, Drug Abuse in Bangladesh: An Analytical Presentation, The Dhaka University Studies, Vol.55, No.2, 1998
- Montek Ahluwalia, Rural Poverty and Agricultural Performance in India, Journal of Development Studies, New Delhi 1996
- Mrs. Anny Basanta, Law of Population, 1879
- National Birth Rate Commission, London, 1977
- Nazrul Islam, The Urban Poor in Bangladesh, Centre for Urban Studies, Dhaka, 1996
- New Illustrated Columbia Encyclopedia, University Press, New York
- Norman Raymond Humphrey, "Social Problems" in "Principles of Sociology" A. M. Lee (ed); Barns and Noble Inc, New York, 1962
- North-South Institute, Rural Poverty in Bangladesh : A Report to the Like Minded Group, North-South Institute, Ottawa, 1985
- Ogburn & Nimcoff, A Handbook of Sociology, Routhedge & Kegan Paul Ltd, London 1960
- P. D. Ojha, Configuration of Indian Society, Adam Publisher's, Delhi 1995
- P. Gisbert, Fundamental of Sociology, 3rd edition, London
- P.B. Horton & G.R. Leslie, The Sociology of Social Problem, Appleton-Century-Crofts, Inc., New York, 1965
- Paul Burcan, Towards Moral Bankruptcy, London – 1925
- Population Census 2001 Preliminary Report, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, August 2001
- Population Census 2001, BBS, Planning Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, July 2003
- Prof. Dr. Md. Nazrul Islam, HIV/AIDS Situation in Bangladesh : A Situation of Low Prevalence and High Risk, A Paper Presented at Dialogue on HIV/AIDS : A Case of Low Prevalence and High Risk in Bangladesh, Organized by South-South Center, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

- R M McIver and Page, Society, Macmillan & Co. 1967
- Ruben K Merton and Robert Nisbet, Contemporary Social Problems, New York, 1971
- Robert Chambers, Poverty in India : Concepts, Research and Reality, Concept Publishing Co, Delhi 1996
- Robert L. Barker (editor), The Social Work Dictionary, Washington, NASW Press, 1995
- Rose Michael, The Relief of Poverty, Macmillan, London 1989
- S. M. Miller and Pamela Roby, Poverty Changing Social Stratification, New York 1969
- Samuel Koenig, Sociology: An Introduction to the Science of Society, Barns & Noble, Inc, New York, 1957
- Sayom Ratnawichit, The Removal of Poverty : Lessons from Asian Development in the past two Decades, in Asian Social Problems, IASSW, New York 1976
- Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, London 1941
- Shakkel A. I. Mohammad, Women and HIV/AIDS in Bangladesh : A Global Review, NIRMUL-Quarterly Health Journal of Bangladesh AIDS Prevention Society, Issue 4, Dhaka, March 2000
- Statistical Yearbook of Bangladesh, 28th Edition, March 2009, Government of The People's Republic of Bangladesh
- Susan H. Holcombe, Managing to Empower : The Grameen Bank's Experience of Poverty Alleviation, Dhaka & New Jersey; University Press Limited & Zed Books, 1995
- Syed Mehdi Momin, Violence against women and children : searching for causes, Weekend Independent, 12 February 1999, Dhaka
- Syedur Rahman, An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, Dacca 1963
- The Bangladesh Observer, 27 April 1995
- Thompson Warren S. Population Problem, New York, 1953
- UNFPA Report 1999
- United Nation, The Worlds Women Trends and Statistics, 1995
- United Nations Leaf-let Published on the Year of the Family 1993
- V. M. Dandekar & N. Path, Poverty in India, Cosmo Publishing Co, Delhi 1994
- W. A. Friedlander & R. Z. Apte, Introduction to Social Welfare, Pronto Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1974
- W. F. Ogburn, Social Change, Rev ed, Viking Press, New York, 1950
- WHO Expert Committee on Drug Dependence, World Health Organization Technical Report Series, No 407, Report, Geneva, 1969
- William W. Murdoch, The Poverty of Nations : The Political Economy of Hunger and Population, The Johns Hopkins University Press Ltd, London, 1980
- Women for Women, A Research and Study Group, 1997, Regional Overview on Violence Against Women: A Working Paper for Expert Group Meeting, Dhaka 1997
- World Book of Encyclopedia, New York 1984

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন

মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন
a	এ, আ	o	অ, ও	ز	য
ay	ে	p	প	س	ছ
b	ব	r	র, ড়, ঢ়	ش	শ
bh	ভ	s	স	ص	ছ
c	ক, স	sh	শ	ض	দ
ch	চ	t	ট	ط	ত
d	ড / দ	th	দ, থ, ছ	ظ	য
dh	ধ	u	উ	ع	'আ 'ই 'উ
dj	জ	v	ভ	غ	গ
f	ফ	w	ওয়া	ف	ফ
g	গ / জ	y	ে / আই	ق	ক
gh	ঘ	z	জ	ك	ক
h	হ	ا	অ, আ	ل	ল
i	ই / আই	ب	ব	م	ম
j	য	ت	ত	ن	ন
jh / zh	ঝ	ث	ছ	و	ওয়া
k / q	ক	ج	জ	ه	হ
kh	খ	ح	হ	لا	লা
l	ল	خ	খ	ء	আ
m	ম	د	দ	ي	য়্যা /ইয়া
n	ন	ذ	য		
o	ও অ	ر	র, ড়, ঢ়		

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

অপ্র : অপ্রকাশিত

আ : আলাইহিস সালাম

ইং : ইংরেজি

বাং : বাংলা

হি : হিজরি

খ্রি : খ্রিস্টাব্দ

খ্রি পূ : খ্রিস্ট পূর্ব

জ : জন্ম

মৃ : মৃত্যু

সা : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রা : রাদিআল্লাহু আনহু / রাদিআল্লাহু আনহুম / রাদিআল্লাহু আনহা / রাদিআল্লাহু আনহুমা

রহ : রহমাতুল্লাহু আলাইহি / রহমাতুল্লাহু আলায়হা

ড : ডক্টর

অনূ : অনূদিত

অনু : অনুবাদ

পৃ : পৃষ্ঠা

ইফাবা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রাগুক্ত : পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত (একই সূত্র পরপর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)

পূর্বোক্ত : পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত (একই সূত্র অন্য সূত্রের পরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)

টী. : টীকা

v. : Volume

p : page

pp. : pages

ibid : in the same book or same piece of writing as the one that has just been mentioned (from Latin 'ibidem).

op.cit : used in formal writing to refer to a book or an article that has already been mentioned.

USD : United State's Dollar